অপারেশন কক্সবাজার

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। তারই বয়েসী আরেকটা ছেলে এগিয়ে আসছে করিডর ধরে। হাতে সুতোয় বাঁধা আট-দশটা বেলুন। পাশ দিয়ে চলে গেল ছেলেটা। যাওয়ার আগে একবার মুখ তুলে তাকাল। ঢুকে পড়ল ১৫ নম্বর কেবিনে।

ফাঁক হয়ে রইল দরজাটা। চোখ পড়ল ভেতরে। কিশোর দেখল, বেডে একটা ছোট ছেলে শুয়ে আছে। বিছানা আর টেবিল বোঝাই নানা রকম খেলনা। ওগুলোর সঙ্গে যোগ হলো বেলুনগুলো। নিশ্চয় বড়লোকের ছেলে। আদর আহ্লাদের অন্ত নেই।

এটা চিলড্রেন্স ফ্লোর। শিশুদের চিকিৎসা হয়। চার তলায়। আজ থেকে তার ডিউটি এখানে। গত কয়েক দিন ছিল অর্থোপেডিক ফ্লোরে। হাড়ভাঙা মানুষের সেবাযত্ন করতে হয়েছে। ওর হাতে কয়েকটা এক্স-রে প্লেট। একজন ডাক্তারের কাছে দিয়ে আসতে পাঠানো হয়েছে তাকে।

চকচকে করিডর ধরে আরও কিছুদূর এগোল সে। কনস্ট্রাকশনের কাজের নানা রকম ঘড়ঘড়ে শব্দ আর ঠুকুস-ঠাকুস কানে আসছে সামনের দিক থেকে। হাসপাতালের আরেকটা নতুন উইং তৈরি হচ্ছে। ওটাও এটার মতই চার তলা। করিডরের শেষ মাথায় একটা ভারি দরজা। তাতে সাদা রঙে বড় বড় করে লেখা:

বিপদজনক!
বিল্ডিং তৈরির কাজ চলছে।
সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

কেন প্রবেশ নিষেধ অনুমান করতে পারল কিশোর। অসমাপ্ত ফ্লোর। কৌতূহলী হয়ে কেউ ওখানে ঢুকে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

বিদেশী অর্থে তৈরি হচ্ছে দেশের এই আধুনিকতম হাসপাতাল—কক্সবাজার ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। হাসপাতাল চালু হয়ে গেলেও এখনও বহু কাজ বাকি। সমুদ্র সৈকতের কাছে আবহাওয়া ভাল আর প্রচুর জায়গা আছে বলে এখানে হাসপাতালের স্থান নির্বাচন করেছে কর্তৃপক্ষ। ক্যান্সার সহ নানা রকম জটিল রোগের গবেষণা আর চিকিৎসা হবে। ঢাকা আর অন্যান্য বড় বড় শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন ভাল। দেশের যে কোন জায়গা থেকে রোগী আসায় তেমন কোন অসুবিধে নেই। তবে আপাতত কক্সবাজার আর আশপাশের এলাকার রোগীতেই হাসপাতাল ভরে গেছে। বেশির ভাগই মারাত্মক জখম হওয়া আর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। দিন কয়েক আগে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে উপকূল

জুড়ে। এ তারই জের।

এক্স-রে প্লেটগুলো পৌছে দিয়ে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। আবার তাকাল দরজাটার দিকে। মিস্ত্রীদের হাতুড়ি-বাটালের ঠুকুর-ঠাকুর, করাতের খড়াৎ খড়াৎ শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল হালকা কান্নার শব্দ। থমকে দাঁড়াল সে। কান পাতল আবার। আন্দাজ করল কোন ঘরটা থেকে আসছে। ১৭ নম্বর ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। শব্দটা আসছে ওই ফাঁক দিয়ে।

কৌতূহল হলো ওর। উঁকি দিল ১৭ নম্বর কেবিনে।

সাদা বিছানায় দরজার দিকে পেছন করে শুয়ে আছে একটা ছোট্ট ছেলে। একা। আর কেউ নেই ঘরে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল কিশোর। 'কি হয়েছে তোমার?'

ফিরল না ছেলেটা।

ঘরটায় চোখ বোলাল কিশোর। পনেরো নম্বরের মত খেলনা, ফুল আর ছবি দিয়ে বোঝাই করে রাখা হয়নি। অসুস্থ, ভীত বাচ্চাটাকে খুশি করার জন্যে কিছুই নেই এখানে।

'কাঁদছ কেন?'

কান্না থামিয়ে দিল ছেলেটা। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে, তাই গলা দিয়ে হুঁক, হুঁক করে হেঁচকির মত শব্দ বেরোতেই থাকল। ফিরল না। দরজার উল্টো দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

বিছানার পায়ের কাছে রেলিঙে ঝোলানো মেডিকেল চার্টটা পড়ল কিশোর। তাতে জানা গেল ছেলেটার নাম তরিকুল ইসলাম দিপু। বয়েস পাঁচ বছর তিন মাস। নিউমোনিয়া হয়েছিল। সেরে উঠেছে। কয়েকদিন ধরে আর জ্বর আসছে না। তারমানে বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে। তাহলে কাঁদছে কেন?

বিছানার পাশ ঘুরে ছেলেটা যেদিকে মুখ করে আছে সেদিকে এগোল কিশোর। সুন্দর চেহারা। রক্তশূন্য হয়ে যাওয়ায় ফর্সা মুখটাকে বেশি ফ্যাকাসে লাগছে। কোঁকড়া কালো চুল। গাল চেপে রেখেছে বালিশে।

কোমল গলায় আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার? আব্বু-আম্মু নিতে আসছে না, তাই?'

জবাবে 'হিক' করে শব্দ বেরোল ছেলেটার গলা থেকে। কথা বলল না।

পাশের টেবিলে রাখা বাক্স থেকে টিস্যু পেপার বের করে ওর গালের পানি মুছিয়ে দিতে গেল কিশোর। মুখ সরিয়ে নিল ছেলেটা। ওর ছোট্ট একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল কিশোর। 'আর কেঁদো না। তোমার অসুখ ভাল হয়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যেই বাড়ি নিয়ে যাবে।'

জবাবে জোরে একবার ফুঁপিয়ে উঠে চোখ বুজে ফেলল ছেলেটা।

বিছানায় ওর পাশে বসল কিশোর। 'কথা বলতে ইচ্ছে করছে না? ঠিক আছে, বোলো না। যতক্ষণ কেউ না আসে আমি তোমার কাছে বসছি। আর একা লাগবে না। গল্প শুনবে?'

ঝটকা দিয়ে হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা। গটমট করে ভেতরে ঢুকল এক

মাঝবয়েসী মহিলা। বুকের ট্যাগে নাম লেখা সাফিয়া বেগম। নার্স। ঝাঁঝাল কণ্ঠে ধমকে উঠল, 'তোমার এখানে কি?'

কয়েক ঘণ্টায়ই মহিলাকে চেনা হয়ে গেছে কিশোরের। ভয়ানক কড়া আর বদমেজাজী। সারাক্ষণ মুখ গোমড়া করে রাখে। কেউ নাকি কখনও হাসতে দেখেনি তাকে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'না, কিছু না···বাচ্চাটা কাঁদছিল, ওকে হাসানোর চেষ্টা করছি···'

'কাজ ফেলে এখানে কি? ওকে হাসানো তোমার ডিউটি নয়। ও কারও সঙ্গে কথা বলে না। হাসাতে তো পারবেই না, বরং বিরক্ত করছ ওকে। যাও, নিজের কাজে যাও।'

ভয়ানক কর্কশ গলা মহিলার। অনেক নার্স আর ডাক্তারই এ রকম খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়। এ জন্যে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না তাদের। সাংঘাতিক কাজের চাপ। দিন রাত খাটুনি। বিশ্রামের সময় কম। তা ছাড়া রোগীর সঙ্গে সারাক্ষণ ওঠাবসা করাটা এক ঝকমারির ব্যাপার। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে।

তর্ক করল না আর কিশোর। দরজা দিয়ে বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল। নার্স সাফিয়ার বিশাল শরীরের একপাশ দিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে দিপু। চোখে পানি।

ছেলেটার চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি। নীরবে কিছু বলার চেষ্টা করছে ওকে। আচরণটা স্বাভাবিক মনে হলো না কিশোরের।

দুই

দুপুরে লাঞ্চের সময় হাসপাতালের ক্যান্টিনে বসে ঘটনাটা রবিনকে জানাল কিশোর।

ভাতে মুরগীর ঝোল মাখাতে মাখাতে হাসল রবিন। 'এলে তো দুর্গতদের সাহায্য করতে। এর মধ্যেও রহস্য?'

'রহস্য আছে কিনা জানি না। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি।' রবিনের খাকি শার্টের হাতায় সেলাই করে লাগানো রেড ক্রসের চিহ্ন লাল ক্রসটায় একটা মাছি বসেছে। টোকা দিয়ে সেটা উড়িয়ে দিল। ওর নিজের পরনেও একই পোশাক। রেড ক্রস থেকে সাপ্লাই করা স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারের ইউনিফর্ম। 'তোমার কথা বলো। গুদাম সামলাতে কেমন লাগছে?'

'চেয়ার-টেবিলে বসে থাকা। কেউ মাল নিতে এলে রেজিস্টারে তার নাম-ঠিকানা আর মালের বিবরণ লিখে রেখে হাতে একটা নোট ধরিয়ে দেয়া। বোরিং। তোমার কাজটা তার চেয়ে অনেক বেশি ইনটারেস্টিং।'

'হুঁ, তা তো বটেই—নদীর এপার কহে···রোগীর আহা-উহু আর চেঁচানো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। বেশির ভাগ জখমী। কারও হাত নেই, কারও পা কাটা, কারও শরীরে সেলাই পড়েছে একশো তেতাল্লিশটা। বীভৎস দৃশ্য। রাতে

ঘুমের মধ্যেও চিৎকার শুনি।'

দুপুর বেলা। খাওয়ার সময়। পুরো ক্যান্টিনে একটা টেবিলও খালি নেই। হাসপাতালের লোক ছাড়া বাইরের কারও খাওয়ার নিয়ম নেই এখানে। তবে রেড ক্রসের ভলান্টিয়ারদের স্পেশাল পারমিশন দেয়া হয়েছে। সেজন্যেই ঢুকতে পেরেছে রবিন।

কিন্তু যাই বলো, তার মধ্যেও একটা লাইফ আছে। শুধু শুধু বসে থাকতে কারও ভাল লাগে? এরচেয়ে লটারির টিকিট বিক্রি করাও ভাল। নেহায়েত দুর্গতদের সাহায্য করতে এসেছি, তাই...' যেন ভাল না লাগাটা বোঝানোর জন্যেই মুরগীর রানে সজোরে কামড় বসাল রবিন। চিবাতে চিবাতে বলল: 'এখানকার রান্নাটা সত্যি ভাল...'

কিশোরের পেছনে তাকিয়ে থেমে গেল রবিন।

ফিরে তাকাল কিশোর।

ওদের চেয়ে দু'তিন বছরের বড় একটা ছেলে ট্রে হাতে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ। 'আমি বসি এখানে? তোমাদের অসুবিধে হবে? আর কোথাও জায়গা নেই।'

'চেয়ার কই?'

হাসল ছেলেটা, 'ব্যবস্থা করছি।' হাতের ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কাউন্টারের দিকে চলে গেল সে। একটা টুল তুলে নিয়ে এল। সেটাতে বসে বলল, 'ক্যান্টিন আরও বড় করা দরকার।' গায়ে একটা সাদাকালো ডোরাকাটা গেঞ্জি। বুকের কাছে বিশাল এক কুমিরের ছবি আঁকা। বাঁকা লেজের নিচে ইংরেজিতে লেখা কথাটার মানে: আমি পৃথিবীর শাসনকর্তা। কুমিরের ওপরে একপাশে সেফটিপিন দিয়ে ঝোলানো একটা ব্যাজ। তাতে তার নিজের নাম এবং চিটাগাঙের একটা কলেজের নাম লেখা। 'তোমাদের অসুবিধে করলাম, না?'

'না না, অসুবিধে নেই,' নিজের বাসনটা আরেকটু সরিয়ে ছেলেটাকে বাসন রাখার জায়গা করে দিল রবিন। 'খান আপনি।'

'আমাকে আপনি আপনি করার দরকার নেই,' বাটি কাত করে মাছের তরকারি পুরোটাই ভাতের ওপর ঢেলে নিল ছেলেটা। 'তোমাদের চেয়ে বয়েসে খুব একটা বড় হব না। আমার নাম অরুণ চন্দ্র মোদক।'

'আমি কিশোর...' নিজেদের পরিচয় দিতে যাচ্ছিল কিশোর।

থামিয়ে দিল ওকে অরুণ, 'জানি। তোমার নাম কিশোর পাশা। বেগম মেহের বানুর বোনপো। আমেরিকা থেকে এসেছ। ও রবিন মিলফোর্ড। তোমার বন্ধু।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। চোখে নীরব প্রশ্ন।

'কি করে জানলাম ভাবছ তো?' ঝোল দিয়ে মেখে ভাত মুখে পুরল অরুণ। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, 'তোমাদেরকে ওই বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছি। কাছেই আমাদের বাড়ি। আমি কক্সবাজারের ছেলে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'যখন দেখলাম একই হাসপাতালে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারের কাজ করছ, খোঁজ নিলাম। তোমাদের পরিচয় জানতে মোটেও অসুবিধে হয়নি আমার।'

ছেলেটা মিশুক। দ্রুত আলাপ জমিয়ে নিল দুই গোয়েন্দার সঙ্গে। জানাল তার বাবা নেই। জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে। চিটাগাঙে কলেজে পড়ে। এইচ এস সি দিয়েছে। রেজাল্ট বের হয়নি। তার বিশ্বাস, খুব ভাল করবে। মেডিকেলে ভর্তি হবে। মায়ের ইচ্ছে, ছেলেকে ডাক্তার বানাবেন। ক্যান্সার হাসপাতালে সেও স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছে। তবে রেড ক্রসের তরফ থেকে নয়।

'ভালই তো,' কিশোর বলল, 'আগে থেকেই হাসপাতালে কাজ করার হাতেখড়ি নিয়ে নিচ্ছ।'

'হ্যাঁ, মা খুব খুশি।'

'কেন, তুমি খুশি নও?'

প্রশ্নটা যেন শুনতে পেল না অরুণ। কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি আবার ভাত মুখে দিল। ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর।

লাঞ্চের সময় মাত্র আধঘন্টা। বেশি কথা বলার সময় নেই। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে কিশোর আর রবিনের। খাবারের বিল আগেই দিয়ে দেয়ার নিয়ম। দিয়ে দিয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল ক্যান্টিন থেকে।

রবিন চলে গেল হাসপাতালের কাছেই একটা প্রাইমারি স্কুলের দিকে। ওখানে আস্তানা গেড়েছে রেড ক্রস।

নিজের ফ্লোরে ফিরে এল কিশোর। কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করল ওয়ার্ডের বিছানাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। দেখল কোন রোগীর কোন সাহায্য দরকার হয় কিনা। কিন্তু তার মন পড়ে আছে ১৭ নম্বর ঘরে। শেষে আর থাকতে না পেরে পায়ে পায়ে চলে এল ওটার সামনে। দরজা ফাঁক। যেন তাকে দেখে কাকতালীয় ভাবে একঝলক বাতাস ঝাপটা দিয়ে আরও ফাঁক করে দিল পাল্লাটা। সরাসরি ভেতরটা দেখতে পেল কিশোর। দিপুর বিছানায় ঝুঁকে কি যেন করছে নার্স সাফিয়া। লাথি মেরে ওকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে ছেলেটা।

দ্রুত দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর।

বোধহয় ছায়া পড়তেই বা অন্য কোন কারণে টের পেয়ে গেল নার্স। ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে দেখে চোখ জ্বলে উঠল, 'আবার এসেছ?'

'ভাবলাম ছেলেটা কাঁদছে কিনা দেখে যাই। কি করছেন?'

সাফিয়ার হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। 'রক্ত নেবার চেষ্টা করছি। কিছুতেই দিচ্ছে না পাজি ছেলেটা। তুমি এখন যাও এখান থেকে।' আপনমনে গজগজ করতে লাগল, 'এই স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারগুলোকে নিয়ে হয়েছে যন্ত্রণা। কাজের কাজ কিচ্ছু করবে না, খালি ঝামেলা বাড়াবে।'

দিপুর দিকে তাকিয়ে একটা সহানুভূতির হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। তাড়াহুড়া করে হেঁটে চলল করিডর ধরে। এতটাই অন্যমনস্ক, ওষুধপত্র ঠেলে নিয়ে আসছিল একজন ওয়ার্ডবয়, মোড় নিতে গিয়ে তার ট্রলিতে ধাক্কা লাগিয়ে দিল।

নার্স স্টেশনের দিকে রওনা হলো সে। ওখানে আছে নার্স বিশাখা গোমেজ। সাফিয়ার মত অত বদমেজাজী নয়। তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো দিপুর সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর পাবে।

দেখল একজন মাঝবয়েসী মহিলার সঙ্গে কথা বলছে নার্স বিশাখা। বলছে, 'আর একটা দিন ধৈর্য ধরুন। সেরেই তো গেছে আপনার ছেলে। পুরোপুরি সারল কিনা শিওর হতে পারছে না ডাক্তাররা। হলেই রিলিজ করে দেয়া হবে।'

মুখিয়ে উঠল মহিলা, 'আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাব, তাতে ডাক্তার সাহেবদের কি? দায়-দায়িত্ব সব আমার…'

সাফিয়া হলে এতক্ষণে চটে উঠত। কিন্তু রাগ করল না বিশাখা। মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বলল, 'রাগ করবেন না মিসেস ইসলাম, অসুখ ভাল হলো কিনা শিওর না হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার নিয়ম নেই। অহেতুক চাপাচাপি করছেন।'

'আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাব তাতে হাসপাতালের কি?'

ও, এই মহিলা তাহলে দিপুর মা। কথা বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের। কিন্তু মেজাজ দেখে সাহস পেল না। নার্স সাফিয়া এসে ঢুকল।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। চট করে সাফিয়ার চোখের আড়ালে সরে গিয়ে আবার রওনা হলো দিপুর ঘরের দিকে।

এখন আর কাঁদছে না দিপু। শান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে।

'বাহ্, এই তো লক্ষ্মী হয়ে গেছ,' হেসে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'জানো কে এসেছিল?'

নড়ল না দিপু।

'নার্স বলেছে, কাল তোমাকে বাড়ি যেতে দেবে।'

কিশোরের দিকে ফিরল দিপু। গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

'ছিহ্, আবার কাঁদছ! শোনো, তোমার আম্মু এসেছেন। কাল বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

শুনে খুশি হওয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না দিপু। মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে যেন ওর। চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছে না। চোখ মুদল। বিছানার ধার ঘেঁষে এসে গায়ে হাত রাখল কিশোর।

আস্তে করে একটা হাত ওর হাতে তুলে দিল দিপু। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আঁকড়ে ধরল কিশোরের হাতটা।

তিন

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে জানালার কাছে বসে আছে কিশোর। রবিন পাশের ঘরে বই পড়ছে।

বাড়িটা পাহাড়ের ঢালে। সমুদ্র দেখা যায় এখান থেকে। মেঘলা আকাশ। চাঁদ নেই। সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে। দেখা যাচ্ছে না কিছু।

সাগর পাগল লোক আয়না খালার স্বামী, তাই সাগরের ধারে পাহাড়ের ঢালে শখ করে বানিয়েছেন এই বাড়ি।

কিশোরের মায়ের খালাত বোন বেগম মেহেরুন্নিসা বানু, ডাকনাম আয়না। স্বামী তাহের উদ্দিন হাজারি ফেণীর লোক। জাহাজের ক্যাপ্টেন। জাহাজ নিয়ে

বেরিয়ে গেলে বহুদিন আর বাড়ি ফিরতে পারেন না। একা একা থাকেন তখন আয়না খালা। বাড়িতে একজন কাজের বুয়া আর একজন দারোয়ান আছে—মোবারক আলি। বাড়িঘর পাহারা দেয়া থেকে বাজার করা, সব করে। ড্রাইভিংও জানে।

সময় কাটানোর জন্যে স্থানীয় একটা গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন আয়না খালা। সমাজসেবা করে বেড়ান। একটা মহিলা সংগঠনের তিনি সভানেত্রী।

সাগরের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবছে কিশোর। বাতাস বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ঢেউয়ের গর্জন। গুমগুম, গুমগুম। নেশা ধরানো শব্দ। রোমাঞ্চিত করে শরীর।

কয়েক দিন আগের কথা মনে পড়ল ওর। স্কুল ছুটি। কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ভাবছে। এই সময় টেলিভিশনে দেখল ঘূর্ণিঝড়ের প্রতিবেদন। প্রলয়ঙ্করী ঝড় বয়ে গেছে বাংলাদেশের উপকূল দিয়ে। তছনছ করে দিয়েছে বাড়িঘর, গাছপালা। খুন হয়েছে লক্ষাধিক প্রাণ। দ্বীপগুলোতে খাবার, পানি আর ওষুধের অভাব প্রকট। দুর্গত সেসব অসহায় মানুষের জন্যে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে প্রতিবেদক।

তক্ষুণি ঠিক করে ফেলেছে কিশোর, বাংলাদেশেই যাবে। দুর্গতদের সাহায্য করতে। দেশের মানুষের সেবা করার এই সুযোগ কোনমতেই ছাড়বে না সে।

মুসা আর রবিনও তার সঙ্গী হওয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া। পরদিনই প্লেনের টিকেট কেটেছে ওরা। আমেরিকা থেকে ঢাকা, সেখান থেকে কক্সবাজারে এসে আয়না খালার বাড়িতে উঠেছে। দেখে খুশি হয়েছেন খালা। তবে তাঁর নীতি বড় কড়া। সাফ বলে দিয়েছেন, 'সেবা করবে ভেবে যখন এসেছ, তাই করো। সেবার নাম করে এসে পিকনিক করা চলবে না, অনেকেই যা করে থাকে।'

কক্সবাজারে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর। হাসপাতালে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার হিসেবে কিশোরকে তিনিই ঢুকিয়েছেন। রবিনকে পাইয়ে দিয়েছেন রেড ক্রসের অস্থায়ী স্টোর কিপারের কাজ। আর মুসাকে বানিয়েছেন নিজের অ্যাসিসট্যান্ট। ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সংগঠনের হয়ে দ্বীপ আর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে থাকছে মুসা।

ত্রাণ নিয়ে বেরোলে কখন ফিরবেন তার কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। এই তো, গতকাল সেই যে বেরিয়েছেন, রাত গেছে, আজ দিন গিয়ে আবার রাত হয়েছে, এখনও ফেরেননি। রাতে ফিরবেন কিনা ঠিক নেই। মহেশখালি দ্বীপে যাওয়ার কথা। ওখান থেকে আবার অন্য কোন দ্বীপে চলে গেছেন হয়তো। তাই দেরি হচ্ছে। এমনও হতে পারে, সাগরের অবস্থা ভাল না দেখে বোট ছাড়তে রাজি হচ্ছে না সারেঙ।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকল কিশোর। তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। কত কথা ভাবল। পাশের ঘরে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে রবিন।

পরদিন খুব ভোরে উঠল দুজনে। হাঁটতে গেল সৈকতে। এ সৈকত তাদের কাছে নতুন নয়। বহুবার এসেছে। তারপরেও প্রতিদিনই যেন নতুন লাগে। অন্য রকম। সূর্য ওঠা দেখতে পারল না। কারণ পুবের আকাশ ঢেকে আছে মেঘে।

ঝোড়ো বাতাস বইছে। সাগরের ক্ষিপ্ততা বড় বেশি।
বাড়ি ফিরে গোসল সেরে নাস্তা করল। কাপড় পরে যখন বেরোল দুজনে আয়না খালা তখনও ফেরেননি।
যাই হোক, তাঁর ফেরা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না কিশোর। রিকশা নিয়ে রওনা হলো হাসপাতালের দিকে। রবিনকে স্কুলটার কাছে নামিয়ে দিয়ে একটা মার্কেটে যেতে বলল রিকশাওয়ালাকে।
ছোট মার্কেট। নতুন হয়েছে। সৈকত থেকে বেশি দূরে না। কয়েকটা হোটেল আছে আশপাশে। দেশী-বিদেশী প্রচুর জিনিস পাওয়া যায় দোকানগুলোতে। পত্রপত্রিকা, বই থেকে শুরু করে তাজা ফুল, খেলনা, কাপড়চোপড়, টুথব্রাশ-সাবান-পাউডার, এমনকি ফলও পাওয়া যায়।
দিপুর কথা ভেবেই দোকানে ঢুকেছে কিশোর। বড় দেখে একটা কাপড়ের পুতুল কিনল। বাদামী রঙের ভালুক। দাম দিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। রিকশাওয়ালা বাইরে অপেক্ষা করছে। তাকে ক্যান্সার সেন্টারে যেতে বলল।
হাসপাতালে ঢুকে এলিভেটরের সামনে চলে এল। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে হাসপাতালটা বহুতল করার কথা চিন্তা করে এখন থেকেই এলিভেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিলড্রেন্‌স ফ্লোরে যাওয়ার জন্যে অস্থির। ভাবছে পুতুলটা দেখলে নিশ্চয় খুব খুশি হবে দিপু।
চার তলায় উঠে এল। ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে নার্স আর ওয়ার্ডবয়রা। রোগীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আর কেবিনে ডিউটি দিচ্ছে। সকালের এ সময়টায় ওদের অনেক কাজ।
এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কিশোর, কোথাও নার্স সাফিয়াকে চোখে পড়ে কিনা। ও কেবিনে ঢুকছে দেখলেই বাগড়া দিতে আসবে।
কিন্তু দেখা গেল না ওকে। নিশ্চিন্ত মনে ১৭ নম্বর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। দরজা ভেজানো। কান্নার শব্দ নেই। তারমানে এখনও ঘুমোচ্ছে দিপু। পুতুলটা দেখিয়ে ওকে চমকে দেয়ার জন্যে আস্তে দরজায় ঠেলা দিল। কিন্তু দরজা খুলে সে নিজেই চমকে গেল।
বিছানা খালি। টেবিল ফাঁকা। ওষুধপত্র, ফ্লাস্ক আর অন্যান্য জিনিসপত্র যা ছিল, সাফ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেডের রেলিঙে মেডিক্যাল চার্টটাও নেই।
দুরুদুরু করতে লাগল কিশোরের বুক। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। এখনও রোগী রিলিজ করা শুরু হয়নি। এত সকালে বিছানায় ও না থাকার একটাই মানে, মারা গেছে দিপু! রাতে কোন এক সময়। কাল বিকেলেও তো ভাল দেখে গেছে ছেলেটাকে। হঠাৎ কি ঘটল?
কেবিন থেকে বেরিয়ে নার্স স্টেশনের দিকে ছুটল সে। দিপুর কি হয়েছে ওখানে খোঁজ পাওয়া যাবে।
পর্দা সরিয়ে হলে উঁকি দিয়েই স্থির হয়ে গেল কিশোর। ফুসফুসে আটকে রাখা বাতাস ছেড়ে দিল সশব্দে। স্বস্তির নিঃশ্বাস। হাসি ফুটল মুখে।
ওই তো দাঁড়িয়ে আছে দিপু। মারা যায়নি। শক্ত করে ওর একহাত ধরে

রেখেছে ওর মা। ওকে দেখে এতটাই খুশি লাগল কিশোরের, টুক করে গিয়ে ওর ফ্যাকাসে গালে একটা চুমু খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। লজ্জায় পারল না।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওকে রিলিজ দিল কিভাবে? স্টাফ ডাক্তার যিনি রিলিজ দেবেন তিনিই তো আসেননি। আসবেন এগারোটায়। জরুরী ভিত্তিতে অন্য কোন ডাক্তার দিতে পারেন অবশ্য, রোগীর অভিভাবক যদি বণ্ড সই দেয়। মনে হয় তাই দেয়া হয়েছে। ছেলেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন মা।

আরও একটা ব্যাপার অবাক করল ওকে। অরুণের সঙ্গে কথা বলছে দিপুর মা। বেশ কিছুটা দূরে নার্সের একটা ডেস্কের কাছে রয়েছে ওরা। কি বলছে এখান থেকে শোনা যাচ্ছে না। ওর অবাক হওয়ার কারণ, অরুণ এই তলায় কেন? ওর তো ডিউটি এখানে নয়। গতকালই ক্যান্টিনে খেতে বসে জানিয়েছে ওর ডিউটি থাকে সার্জিক্যাল ফ্লোরে। দিপুর মায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হলো কি করে? পাশাপাশি বাড়ি নাকি? কি কথা বলছে?

অরুণের সেদিনকার গেঞ্জিটায় লাল-কালো ডোরা। বুকে ইয়াবড় এক বাদুড়ের ছবি। আজব রুচি ওর।

আনমনে কথা বলতে বলতে ছেলের হাত ছেড়ে দিল মহিলা। দরজার দিকে ঘুরে তাকাল দিপু।

কয়েক পা এগোল কিশোর। হেসে ভালুকটা দেখিয়ে ভুরু নাচাল। উজ্জ্বল হলো দিপুর মুখ। চোখ দুটো নীরবে জিজ্ঞেস করল, 'আমার?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মায়ের দিকে ফিরল দিপু। অরুণের সঙ্গে জরুরী কথা বলছে মা। এই সুযোগে আস্তে করে সরে এল দিপু। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল কিশোরের কাছে।

'নাও,' ওর হাতে পুতুলটা ধরিয়ে দিল কিশোর।

পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরে ওটার নরম গায়ে গাল ঘষতে লাগল দিপু।

'পছন্দ হয়েছে?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল শুধু দিপু। কিছু বলল না।

'এটা তোমাকে প্রেজেন্ট করলাম। দেখে দেখে আমার কথা মনে কোরো।'

কিশোরের একটা হাত ধরল দিপু। ছাড়ার ইচ্ছে নেই।

'বাড়ি গেলেই ভাল লাগবে, দেখো। আর কান্না পাবে না। ওই যে, যাও, তোমার আম্মু ডাকছেন।'

মহিলার দিকে তাকাল দিপু। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। পানি টলমল করে উঠল চোখের কোণে। ফিসফিস করে বলল, 'ও আমার আম্মু না।'

চার

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। দিপুর দিকে চাইল, 'কি বলছ? নিশ্চয় উনি তোমার আম্মু।'

মাথা নাড়ল দিপু, 'না, আম্মু না।'

'দিপু, এদিকে এসো!' ডাক দিল মহিলা। এই সময় কি যেন বলে আবার তাকে অন্যমনস্ক করে দিল অরুণ।

'আম্মু না? তাহলে কে উনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। অসুখে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ছেলেটার? উল্টোপাল্টা বকছে?

'আমি কিছু বলব না। তাহলে রেগে যাবে। মারবে আমাকে।'

'কেন রেগে যাবেন? উনি কে?'

মাথাটা ঝুলে পড়ল দিপুর। 'আমি বাড়ি যাব!'

'অ্যাই দিপু, ডাকছি যে কথা কানে যায় না? জলদি এসো!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিসেস ইসলামের কণ্ঠ। সে আর অরুণ দুজনেই তাকিয়ে আছে কিশোর ও দিপুর দিকে।

যেন যেতে ইচ্ছে করছে না এমন ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে মহিলার দিকে এগিয়ে গেল দিপু।

তাকিয়ে আছে কিশোর।

ধমক দিয়ে দিপুকে কি যেন জিজ্ঞেস করছে মহিলা। অনুমান করতে পারল, ভালুকটার কথা কিছু বলছে। ওটাকে আরও শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল দিপু। আবার কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। তারপর দিপুর এক হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল এলিভেটরের দিকে।

ভেতরে ঢুকে যাওয়ার আগে ফিরে তাকাল দিপু। ওর চোখে আবারও অনুনয়ের দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর।

অরুণের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করল অরুণ।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এই ফ্লোরে?'

'ডাক্তার আকবর পাঠিয়েছেন। বাচ্চাদের তুমি খুব ভালবাস, না? ভালুকটা পেয়ে খুশি হয়েছে দিপু।'

'ওই মহিলা নিশ্চয় দিপুর মা?'

'তাই তো বলল।'

'তাই তো বলল মানে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল অরুণ।

'কি কথা বললে এত?'

'এই নানা রকম খোঁজখবর নিল। কক্সবাজারে নতুন এসেছে। লাইট হাউসটার অনেক পরে পাহাড়ের গোড়ায় বাসা নিয়েছে। ওখান থেকে সবচেয়ে কাছের ফার্মেসিটা কোথায় জিজ্ঞেস করল আমাকে। দিপুর জন্যে রাতবিরেতে ওষুধের দরকার হতে পারে।'

'ও।'

টেলিফোন বাজল। ঘুরে তাকাল কিশোর। এদিক ওদিক দেখল। কোন নার্সকে চোখে পড়ল না। ওরই ধরা উচিত। এগিয়ে গেল সেদিকে। রিসিভার তুলতে গিয়ে চোখ পড়ল ডেস্কের পাশে রাখা একটা তাকের দিকে। একটা বাক্সে

মখমলের তৈরি খাঁজে তিনটে লম্বা ছুরির ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। সার্জিক্যাল নাইফ। চকচক করছে স্টেনলেস স্টীলের তীক্ষ্ণধার ফলাগুলো। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, 'হালো।'

ওপাশ থেকে প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'কে? অরুণ?'

'না, দিচ্ছি ওকে। ধরুন।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অরুণ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি আসছি, স্যার। সরি। এক রোগীর মা আটকে দিয়েছিল।'

ডাক পড়েছে অরুণের। আর কথা বলা যাবে না। দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর। বেরোনোর আগে কি মনে হতে ফিরে তাকাল।

ছুরির বাক্সটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরছে অরুণ।

থমকে গেল কিশোর।

ওর দিকে তাকানোর আর সময় নেই অরুণের। তাড়াহুড়া করে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

নিজের অজান্তেই মুখের কাছে হাত উঠে গেল কিশোরের। চিমটি কাটতে আরম্ভ করল নিচের ঠোঁটে। যে ভাবে বাক্সটা পকেটে ভরল অরুণ, তাতে মনে হয়েছে ছুরিগুলো চুরি করেছে সে।

ভাবতে ভাবতে করিডরে বেরিয়ে এল কিশোর।

হই-চই করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল কয়েকজন শ্রমিক আর মিস্ত্রী। পাশের দ্বিতীয় উইংটাতে কাজ করতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এদিক দিয়ে ছাড়া যাওয়ার আর পথ নেই। নইলে এ ভাবে হাসপাতালে ঢুকতে দিত না ওদের।

শ্রমিকদের দিকে চোখ আর অন্যমনস্ক থাকায় নার্স বিশাখা গোমেজকে নার্স স্টেশনে ঢুকতে দেখল না সে। ফোনের শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখে ফোন তুলছে বিশাখা।

ছুরিগুলোর কথা বলা দরকার। এগিয়ে গেল কিশোর।

নাক কুঁচকে কথা বলছে বিশাখা, 'বলো কি? আরও? হায়রে পয়সা! কেউ ভাত পায় না, আর কেউ খেলনার পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে···ঠিক আছে, লোক পাঠাচ্ছি।···হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সামনেই একজন ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে আছে।'

রিসিভার রেখে দিল সে। আনমনে বিড়বিড় করে মাথা নাড়তে থাকল।

কিশোর বলতে গেল, 'সিসটার...'

কথা শেষ করতে দিল না বিশাখা। 'কিশোর, রিসিপশনে যাও তো। পনেরো নম্বর ঘরের জন্যে আরেকটা প্যাকেট রেখে গেছে। নিয়ে এসোগে। কাণ্ড! খেলনাগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যেই একটা ট্রাক লাগবে!'

বিরক্ত লাগল কিশোরের। হাসপাতালে এই হলো ভলান্টিয়ারের কাজ! ফাইফরমাশ খাটা। সারাদিন ধরে এটা-ওটা আনা নেয়া করা, রোগীদের আবদার শোনা, ডাক্তার-নার্সদের কাজ করে দেয়া, এই সব। ফালতু। তার চেয়ে আয়না খালার সঙ্গে থেকে মুসার মত ত্রাণ বিতরণ করে বেড়ানো অনেক ভাল ছিল।

দোষটা ওরই। ও ভেবেছিল হাসপাতালের কাজ, বৈচিত্র থাকবে, তাই এখানে ভলান্টিয়ার হওয়ার ওপর জোর দিয়েছিল। ওরা যে ওকে বয়ের মত খাটাবে, কল্পনাও করতে পারেনি।

কাজটা হয়তো সেদিন করেই ছেড়ে দিত কিশোর, কিন্তু দিপুর রহস্যটা হাসপাতাল ছাড়তে দিল না ওকে। তার ধারণা, বিপদের মধ্যে আছে ছেলেটা। ওর জন্যে কিছু করা দরকার। বিপদটা কেমন জানা থাকলে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু কি করে জানবে?

একটাই উপায়, ওর কাছে যেতে হবে। কথা বলতে হবে। ঠিকানা পাবে কোথায়? অরুণকে জিজ্ঞেস করে জানা যায়। কিন্তু ও যদি জিজ্ঞেস করে দিপুর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন কিশোরের? তা ছাড়া আরও একটা কারণে অরুণকে জিজ্ঞেস করার পক্ষপাতি নয় ও—ছুরি চুরি করার পর থেকে ওকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে সে। কোথায় যেন একটা খটকা আছে।

নার্স স্টেশনের পেছনে একটা ছোট অফিসে রোগীদের রেকর্ড রাখা হয়। ডাক্তার আর নার্স বাদে অন্য কারও ওখানে ঢোকা বারণ। কিশোর ঠিক করল, ও ঢুকবে। অফিসের ফাইলে পাওয়া যাবে ঠিকানা।

বিকেলে যখন নার্সদের শিফট বদল হয়, দ্বিতীয় উইঙের কাজ সেরে শ্রমিকেরা বেরিয়ে যেতে থাকে, একটা গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখনই ঢোকার উপযুক্ত সময়। কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।

সুযোগের অপেক্ষায় রইল কিশোর। পেয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। ঢুকে পড়ল।

ছোট ঘরটায় গাদাগাদি হয়ে আছে ফাইল, কাগজপত্র। ধুলো জমে আছে। বাতাস বদ্ধ। শব্দ শুনে যদি কেউ টের পেয়ে যায় এই ভয়ে ফ্যান ছাড়ারও সাহস পেল না। তবে দিপুর ফাইলটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না ওর।

ঠিকানা মুখস্থ করে নিয়ে আবার আগের জায়গা রেখে দিল ওটা। প্রশ্ন হলো, যাবে কি করে ওবাড়িতে? মিসেস ইসলামকে মোটেও মিশুক মনে হয়নি। সরাসরি বাড়িতে ঢুকে দিপুর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। বাইরের কারও সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেবে কিনা মহিলা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, টিকেট। রেড ক্রসের টিকেট বিক্রি করে চাঁদা তোলার ছুতোয় যেতে পারে। রবিনের কাছ থেকে একটা টিকেট বুক চেয়ে নিলেই হবে।

একা যাবে? যাওয়া যায়। রবিনের সময় থাকলে ওকে নিয়েও যাওয়া যায়। আর ইতিমধ্যে যদি মুসা ফিরে আসে তাহলে তিনজনে মিলেই যাবে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়েছে অফিসটাতে। শিফট বদল হয়ে গেছে নিশ্চয় ইতিমধ্যে। আলো নিভিয়ে আস্তে করে ভেজানো দরজাটা ঠেলে ফাঁক করতেই কানে এল হেড নার্স আনোয়ারা বেগমের কণ্ঠ। জোরে জোরে বলছে, 'সাফিয়া, এত দেরি করলে কেন? শিকদার স্যার তো চটেমটে অস্থির। তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। সতেরো নম্বরে নতুন রোগী এসেছে।'

নার্স সাফিয়াকে ডেস্কের দিকে এগোতে দেখল কিশোর। এদিকেই চোখ। তাড়াতাড়ি দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। আনোয়ারা বেগম খুব কড়া মহিলা। আর সাফিয়া হচ্ছে বদমেজাজী। অফিস থেকে চুরি করে বেরোনোর সময় কোনমতেই ওই দুজনের সামনে পড়তে চায় না সে। প্রশ্ন করলে কোন জবাব নেই।

পাঁচ

কান পেতে আছে কিশোর। কথা থামছে না হলরুমে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে ভাবল সে, দূর, কিসের এত ঘোড়ার ডিমের ভয়? ধরা পড়লে কাজ বাদ দিয়ে চলে যাবে। সে এখানে চাকরি করতে আসেনি। বিনে পয়সার ভলান্টিয়ারি। লাভটা ওদেরই। বিনে পয়সায় খাটানোর লোক পেয়ে গেছে। কিন্তু আয়না খালার টিটকারির কথা ভেবে দমে গেল আবার। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, হাসপাতালে দুদিনও টিকতে পারবে না কিশোর। চ্যালেঞ্জ করেছিল সে। এখন বেরিয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে হেরে যাওয়া। একটা জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে কিশোর—পরাজয়। অতএব এত তাড়াতাড়ি হার স্বীকার করতে চাইল না সে। দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু কতক্ষণ? ভীষণ গরম লাগছে। বার বার হাতের মুঠো খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল। নাহ্, আর সহ্য করতে পারছে না। দরজাটা ফাঁক করলে কিছুটা বাতাস আসবে। নার্সেরা কি করছে, তাও দেখতে পারবে। সুযোগ বুঝে ওদের অলক্ষে চট করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করতে পারবে।

আনোয়ারা বেগম বেরিয়ে গেছে। নার্স স্টেশনে একা নার্স সাফিয়া। একটা চার্ট দেখল। বাস্কেটে রাখা কয়েকটা কাগজ তুলে দেখার সময় একটা কাগজ হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তোলার জন্যে নিচু হয়ে মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে হলো ডেস্কের নিচে। দরজা খুলে বেরোলে এখন দেখতে পাবে না কিশোরকে।

এইই সুযোগ। একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না সে। বেরিয়ে এসে দৌড় দিল একটা ডেস্কের পাশ দিয়ে।

কিন্তু ফাঁকি দিতে পারল না। মাথা তুলে ফেলেছে সাফিয়া। দেখে ফেলল ওকে। চিৎকার করে ডাকল, 'অ্যাই, কে? কে তুমি?'

শুধু পেছনটা দেখে মনে হলো চিনতে পারেনি। তাই থামল না কিশোর।

'এই, দাঁড়াও!'

দাঁড়াল না কিশোর। নার্স স্টেশনে ঢুকছে একজন রোগীর আত্মীয়। আরেকটু হলে তার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে ফেলে দিয়েছিল তাকে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাফিয়া। জুতোর খটাখট শব্দ তুলে ছুটে আসতে শুরু করল পেছনে।

করিডর ধরে ছুটল কিশোর। বাঁক নিয়ে এগোল। সামনে দেয়াল। যাওয়ার জায়গা নেই। একপাশে একটা এলিভেটর। অনেক বড়। সর্বসাধারণের ব্যবহারের

জন্যে নয়। এমনকি ভলান্টিয়ারদেরও নয়। ভারি জিনিসপত্র যেমন স্ট্রেচার, রোগীর বেড এক তলা থেকে অন্য তলায় নেয়ার প্রয়োজন হলে ওটা দিয়ে ওঠানো-নামানো হয়। এইমাত্র একটা অপারেশন টেবিল ওঠানো হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা। সাফিয়াকে ফাঁকি দেয়ার আর কোন উপায় না দেখে হুড়মুড় করে তাতে ঢুকে পড়ল কিশোর।

ও ঢোকার আগেই বোতাম টিপে দিয়েছে অপারেটর। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পিছাতে গিয়ে টেবিলে ধাক্কা খেল কিশোর। এক মহিলাকে তাতে চিত করে শোয়ানো। চোখ বোজা। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য মুখ। পায়ের কাছে রাখা মনিটরিং মেশিন ঝিরঝির করে চলছে। থেকে থেকে বীপ বীপ করে উঠছে। অক্সিজেন বোতল থেকে পাইপ চলে গেছে নাকের ভেতর। দণ্ডে ঝোলানো স্যালাইনের বোতলের সরু নল ঢুকে গেছে মহিলার গায়ের চাদরের নিচে। জরুরী অপারেশন করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বোধহয়।

কিশোরের গায়ের ধাক্কা লেগে দুলে উঠল দণ্ডে ঝোলানো বোতল।

ধমকে উঠল অপারেটর, 'আরে করছ কি? ফেলবে তো! তুমি এতে ঢুকেছ কেন?'

'এটা দিয়ে নামা কি নিষেধ?'

'থামিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুণি নামো। চাকরিটা খাবে আমার,' গজগজ করতে করতে বোতাম টিপে দিয়ে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল অপারেটর।

মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল এলিভেটর। দরজা ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল কিশোর। চোখ পড়ল একটা দরজার দিকে। লেখা রয়েছে:

নিষিদ্ধ এলাকা

অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া ঢোকা নিষেধ

বাপরে! কি বাংলা! কেন যে এরা এ ভাবে ইংরেজির অনুবাদ করতে যায়। তার চেয়ে বক্তব্যটা সহজ বাংলায় লিখে দিলেই পারে।

পেছনে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। চারপাশে তাকাতে লাগল সে। কোন করিডর নয় এটা। বিশাল এক হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের একপাশের দেয়াল ঘেঁষে নেমেছে এলিভেটরের শ্যাফট। আলো খুব কম। প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে ঘরটা। নিঝুম, নির্জন।

এখানে কখনও আসেনি আর সে। আসবে কি? ভলান্টিয়ারি করার পর কি সময় পায় নাকি। বিশাল হাসপাতালের অনেক জায়গাই তার অদেখা এখনও।

সাধারণ মেডিকেল ওয়ার্ডের মত লাগছে না ঘরটাকে। এ কোথায় ঢুকল? বেরোবে কি করে?

দ্বিধায় পড়ে গেল সে। সরে যেতে শুরু করল এলিভেটরের দরজার কাছ থেকে। শ্যাফটের ভেতরে একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ হতে ফিরে তাকাল। দরজার ওপরের লাল বাতিগুলো এলিভেটরের অবস্থান নির্দেশ করছে। ওপরে উঠছে আবার ওটা। নিচে রোগিণীকে পৌঁছে দিয়ে আবার ওপরে যাচ্ছে। নিশ্চয় বোতাম টিপেছে কেউ। কয় তলায় থামে দেখার জন্যে দাঁড়াল কিশোর। চার তলায় থামল।

তারমানে নার্স সাফিয়া। এলিভেটরের দরজার ওপরের সিগন্যাল লাইট দেখে জেনে গেছে কোন ফ্লোরে নেমেছে কিশোর। তার পিছু নিতে আসছে এখন। ও নেমে আসার আগেই পালাতে হবে।

অন্ধকার হল ধরে ছুটল কিশোর। কোন্ দিক দিয়ে বেরোবে জানে না। প্রতিটি বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখতে লাগল খোলে কিনা। সবগুলোতে তালা লাগানো। সিঁড়িটা কোথায়? কিংবা আরেকটা এলিভেটর যেটা দিয়ে সবাই নামতে পারে?

একটা অন্ধকার কোণে এসে থমকে দাঁড়াল। কে যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে। নড়ছে না।

ভাল করে দেখতে গিয়ে আরেকটু হলেই হেসে ফেলেছিল। একটা বালতি। পাশে মেঝে মোছার জন্যে পাট দিয়ে তৈরি ঝাড়ন।

পানির বালতি আর ঝাড়ন ফেলে কোথায় গেল ঝাড়ুদার? ছুটি হয়ে গেছে? নাকি বাথরুমে?

মাথা ঘামাল না কিশোর। দৌড় দিল দেয়াল ঘেঁষে।

ঘরটা অনেকটা করিডরের মতই লম্বা। বাঁক আছে। দেয়ালের একটা মোড় ঘুরে অন্যপাশে আসতে একটা দরজা চোখে পড়ল। ওপাশে কেউ আছে কিনা জানে না। ওকে দেখলে চেঁচামেচি শুরু করতে পারে। করুক, কেয়ার করে না। বরং জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কোনদিক দিয়ে বেরোতে হয়। যা ঘটে ঘটুক, নার্স সাফিয়া ওকে দেখে চিনে না ফেললেই হলো।

দরজার নব ধরে মোচড় দিল সে। ঘুরল ওটা। ঠেলা দিতে খুলে গেল পাল্লা।

ঢুকে পড়ল কিশোর। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা ঘর। মুহূর্তে কাঁপ ধরে গেল ওর। রাসায়নিক পদার্থের তীব্র গন্ধ বাতাসে। দম আটকে আসে। আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসার অপেক্ষায় রইল সে।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে অস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠল কয়েকটা ধাতব উঁচু পায়াওয়ালা টেবিলের অবয়ব। সারি দিয়ে রাখা। মাঝখান দিয়ে গলিপথ। তার ভেতর দিয়ে এগোতে শুরু করল সে। ছুঁয়ে দেখতে গেল একটা টেবিলের ধার। ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল হাত। বরফের মত ঠাণ্ডা।

পা পড়ল মেঝেতে জমে থাকা পানিতে। অবাক কাণ্ড! ঘরের মধ্যে পানি জমল কিভাবে? পিছলে গেল পা। পড়ে যাচ্ছে। কিছু একটা ধরে বাঁচার জন্যে থাবা মারল।

হাতে ঠেকল টেবিলে রাখা একটা মসৃণ, শক্ত, বরফের মত শীতল জিনিস।

বুঝে ফেলল জিনিসটা কি। মরা মানুষ। লাশের কাঁধ খামচে ধরেছে সে।

ছয়

ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে আনল কিশোর। কোথায় আছে বুঝে ফেলেছে।

লাশকাটা ঘর!

সেজন্যেই এত ঠাণ্ডা। বাতাসে রাসায়নিকের কড়া গন্ধের মানেও এখন জানা। ফরমালডিহাইড। মৃতদেহ পচন থেকে রক্ষা করার জন্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে মানুষের দেহ কাটাছেঁড়া করা হয়। লাশ কেটে হাত পাকায় মেডিকেলের ছাত্ররা।

চোখে অন্ধকার পুরোপুরি সয়ে এসেছে এখন। চারদিকে তাকিয়ে অসংখ্য লাশ দেখতে পেল সে। টেবিলে শোয়ানো। কোনটা আস্ত, কোনটা কাটা।

ভয়াবহ এই জায়গায় আর একটা মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে হলো না ওর। ঘুরে রওনা দিল দরজার দিকে। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোতে পারে, বাঁচে।

বাইরে পদশব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। নার্স সাফিয়া কি পৌঁছে গেছে?

সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজার পাল্লা। চাবির গোছার ঝনঝন শব্দ। তালা লাগিয়ে দেয়া হলো বাইরে থেকে। পদশব্দ সরে যাচ্ছে।

জানোয়ারের মত একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে দৌড় দিল।

পা বাধল কিসে যেন। ওর গায়ের ওপর পড়ল ওটা। কঠিন একটা বাহু গলা পেঁচিয়ে ধরল।

চিৎকার করে গা ঝাড়া দিল সে। মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে খটাখট করে উঠল সাদা একটা জিনিস। কঙ্কাল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। ওর পা লেগে পড়েছে।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে আসতে গিয়ে হাতে লাগল ঠাণ্ডা কি যেন। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে টেবিলে শোয়ানো একটা লাশের হাত। শুধু ধড় আছে লাশটার, মাথাটা কাটা। খাড়া করে মাথাটা বসিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। চোখ বোজা। বিকট ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে দাঁতগুলো। কপাল থেকে পেছনের দিকে চুল অর্ধেক চাঁছা। সাদা হয়ে আছে রক্তহীন খুলির চামড়া।

বীভৎস এ সব দৃশ্য আর সওয়া যায় না। বেরোনো দরকার। জোরে জোরে থাবা মারতে শুরু করল দরজায়। বাইরে যেই আছে, থাক। নার্স সাফিয়া হলেও আর পরোয়া করে না। এতক্ষণে মনে হলো, দেখলে কি করবে ও? বড় জোর নালিশ করবে নার্স সুপারভাইজার কিংবা শিফট-ইন-চার্জের কাছে। ওরা ওকে ধরে খেয়ে ফেলবে না। ওই মহিলার ভয়ে পালাচ্ছিল বলে নিজের ওপরই রাগ হলো এখন। আসলে হাসপাতাল জায়গাটাই এমন, সবচেয়ে সাহসী মানুষকেও কেমন যেন করে ফেলে। স্নায়ুর জোর কমিয়ে দিয়ে ভীতু করে তোলে।

কিল মেরে, ধাক্কাধাক্কি করে অনেক চিৎকার করল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না দরজা খুলে দিতে। কারও কানে পৌঁছল না তার চিৎকার।

ঠাণ্ডা দরজার গায়ে কপাল ঠেকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পুরো পনেরো সেকেণ্ড।

এই সময় মনে হলো আরও কেউ আছে এই ঘরে। মনে হলো নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে।

ঝট করে ফিরে তাকাল।

কই? কিছুই তো নেই।

আবছা অন্ধকারে ভালমত দেখার জন্যে টান টান করতে গিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল। স্তব্ধ হয়ে আছে পুরো ঘর। কোন কিছুই তাকে ধরার জন্যে এগিয়ে আসছে না। ধাতব টেবিলগুলোতে স্থির হয়ে আছে লাশগুলো। নড়ছে না কোনটাই।

ভূতপ্রেতে একটুও বিশ্বাস নেই ওর। সত্যি যদি কেউ থাকে, তাহলে লাশ নয়, জীবন্ত কোন মানুষ। আর তা নাহলে সব ওর মনের ভুল। হঠাৎ করে লাশকাটা ঘরে ঢুকে পড়ার ভয়ে সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে মাথার মধ্যে।

যখন খেয়াল করল, নিঃশ্বাসের শব্দটা ওর নিজেরই—নাক দিয়ে বেরোনো বাতাস দরজার পাল্লায় বাড়ি খেয়েছিল বলে নীরবতার মধ্যে আরেক রকম লেগেছে, ধমক লাগাল মনকে। ভয় পেলে ভাবনা গুলিয়ে যায়। আর গুলোলে এখান থেকে বেরোনোর উপায় বের করতে পারবে না।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। দ্রুত শান্ত হয়ে আসছে অস্থির মন। ভাবল, কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে ওকে এখানে? দিনের বেলা কাজ করেছে এখানে ছাত্ররা। বিকেলে ও ঢোকার খানিক আগে বেরিয়েছে। আসতে আসতে আবার কমপক্ষে আগামীকাল সকাল দশটা। ততক্ষণ এই ভয়াবহ ঘরটার মধ্যে আটকে থাকতে হবে ওকে। নিশ্চয় বেরোনোর আর কোন পথ নেই। থাকলে বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়ে যেত না দারোয়ান।

বাইরে থেকে? পলকে ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়। নবের তালা আটকে দিলে বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলা যায় না বটে, কিন্তু ভেতর থেকে যায়। ইস্, এই সহজ কথাটা মনে ছিল না!

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল নবটা। এক মোচড় দিতেই কিট করে খুলে গেল লক। পাল্লা খুলতে দেরি হলো না। বাইরে বেরিয়ে এল সে। দরজাটা লাগানোরও প্রয়োজন বোধ করল না আর। হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। আহ্, কি আরাম! ফরমালডিহাইডের জঘন্য গন্ধ নেই।

লাশকাটা ঘর থেকে বেরিয়েও আবার সেই আগের সমস্যা—এই ফ্লোর থেকে বেরোবে কি করে? দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে আরম্ভ করল। ভালমত না দেখে আর কোন দরজা দিয়ে হুট করে ঢুকে পড়বে না। একবারেই শিক্ষা হয়েছে।

ঘরটা, 'এল' প্যাটার্নের। এল-এর এক প্রান্তে পৌঁছতেই একটা করিডর দেখতে পেল। সামনের দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে গেল যেন হোঁচট খেয়ে।

এলিভেটরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নার্স সাফিয়া। সঙ্গে লম্বা আরেকজন লোক। গায়ে সাদা ল্যাব কোট। সিকিউরিটি গার্ড নয়। ওরা ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরে। এই লোকটা ডাক্তার।

পেছন থেকে দেখে লোকটাকে চিনতে পারল না কিশোর। ওকে ধরার জন্যে একজন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে সাফিয়া? ডাকা উচিত ছিল সিকিউরিটিকে। নিদেন পক্ষে দারোয়ান, পিয়ন কিংবা কোন ওয়ার্ডবয়ের সাহায্য নিতে পারত।

চোর ধরার জন্যে ডাক্তার ডাকাটা মোটেও স্বাভাবিক নয়।

পিছিয়ে এল আবার কিশোর। ছায়ায় গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা কি করে দেখছে।

কথা বলছে দুজনে। কি বলছে দূর থেকে বোঝা গেল না।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। তাতে ওঠার সময় মুখটা এদিকে ঘোরালেন ডাক্তার। ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। ডাক্তার শিকদার হেমায়েত হোসেন। শিশু বিশেষজ্ঞ। এই হাসপাতালের শিফট-ইন-চার্জ। আশ্চর্য! পলাতক এক স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারকে ধরার জন্যে এত বড় একজন ডাক্তারকে ডেকে আনল সাফিয়া?

নাহ্, ব্যাপারটা আসলে তা নয়—নিজেই নিজেকে জবাব দিল কিশোর। ওকে খুঁজে না পেয়ে সাফিয়া এলিভেটরের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় ডাক্তার সাহেবও সেখানে এসেছেন এলিভেটর ব্যবহারের জন্যে। অপেক্ষা করার সময় দুজনে কথা বলাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। তিনি চাইল্ড স্পেশালিস্ট, সাফিয়া চিলড্রেন্স ফ্লোরে ডিউটি দেয়। তা ছাড়া তিনি শিফট-ইন-চার্জ। নার্সদের ডিউটি ভাগ করেন। তাঁর সঙ্গে একজন নার্স কথা বলতেই পারে।

অকারণ সন্দেহ। মনে মনে নিজেকে বকা দিল কিশোর।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সাফিয়া আর ডাক্তার দুজনেই চলে গেলেন।

এলিভেটরের অপেক্ষায় রইল না কিশোর। করিডর যখন পাওয়া গেছে, সিঁড়ি খুঁজে পেতেও আর অসুবিধে হবে না।

সাত

বাড়ি ফেরার আগে রবিনের সঙ্গে দেখা করল কিশোর। সব কথা জানাল ওকে। শুনে রবিনও একমত হলো—দিপুর ব্যাপারটা রহস্যময়। নিজের মা হলে দিপু তাকে মা বলবে না কেন? ওর বয়েসী একটা ছেলে চালাকি করে মিথ্যে বলেছে এটাও হতে পারে না।

রবিনও বলল, সত্যি কথাটা জানতে হলে দিপুদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। তারও ডিউটি শেষ। বেরিয়ে পড়ল কিশোরের সঙ্গে।

বাড়ি এল প্রথমে দুজনে। আয়না খালা আর মুসা ফেরেনি। আকাশের অবস্থা ভাল না। মেঘ করেছে। সাগরে ঢেউয়ের দাপাদাপি একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। বোধহয় সেজন্যেই আসতে পারছে না। কিংবা চলে গেছে বহুদূরে কোথাও। যাই হোক, ওদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না কিশোর।

বাগানে ফুলগাছের মরা ডাল কাটছে মোবারক। একবার তাকিয়ে নীরব একটা হাসি দিয়ে আবার কাজে মন দিল।

কাজের বুয়া ওদের চা-নাস্তা বানিয়ে দিল।

হাতমুখ ধুয়ে, নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার দুই গোয়েন্দা। দিপুদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে একটা রিকশা নিল।

কোথায় যাবে ওরা শুনেই আঁতকে উঠল রিকশাওয়ালা। ওদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে। কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় বলল, 'হেদিকে যে যাইবেন, জানেন কি আছে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। কি আছে?'

'কবর।'

'তাতে কি?'

'খিরিস্টানরার কবর।'

'তাতেই বা কি?'

'অনেক পুরান কবর কইলাম। হেই যে বিটিশ আমলে ডাকাইতরা আইত জাহাজে কইরা, হেরার কবরও আছে। পুরানা বাড়ি আছে। চাইর পাশে জঙ্গল। আগে বাঘ থাকত। অহন অবশ্য নাই। তয় ভূত আছে।'

হেসে ফেলল কিশোর। 'থাকলে থাক। মানুষ তো বাড়িঘর বানিয়ে থাকছে ওখানে। ভূতে ওদের কিছু না করলে আমাদের করবে কেন?'

জবাব দিতে না পেরে রেগে গেল রিকশাওয়ালা। চুপ করে গেল।

ছোকরাটাকে ওর ভাল লেগেছে। তাই জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমার নাম কি?'

'হিরণ মিয়া।'

'এ শহরে কদ্দিন আছো?'

'এক বছর। আগে ডাহা (ঢাকা) রিকশা চালাইতাম। পয়সা ওইহানে ভালই পাওয়া যায়। কিন্তু যে যানজট আর রাস্তার পানি। কাবু অইয়া ভাইগ্যা আইছি। পুলিশেও বেজান পিডান পিডায়। ইহানে পয়সা অত নাই, তবে যন্ত্রণাও অত নাই। কষ্ট কম।'

'তারমানে এই শহরের সব জায়গাই তুমি চেনো,' রবিন বলল।

'চিন্মু না ক্যান? ছুডু (ছোট) শহর, ডাহার তুলনায় এক্কিরে ছুডু। দুই দিনও লাগে না সব চিনতে।'

হিরণ মিয়া থাকাতে ঠিকানা খুঁজে বের করতে তেমন অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। একটা কথা ঠিক বলেছে রিকশাওয়ালা, রাস্তাটা দেখলে ভূতুড়েই মনে হয়। মেঘলা আকাশ। সন্ধ্যা লাগে লাগে। এ সময় জায়গাটাতে ঢুকেই গা ছমছম করতে লাগল ওদের। যদিও কোন কারণ নেই, ভূতুড়ে ঘটনা ঘটল না। এক পাশে পাহাড়। ঘন ঝোপঝাড়। মনে হয় কি যেন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। বাড়িঘরগুলোর অনেক পেছনে বন।

'রাস্তাটার নাম কি, হিরণ মিয়া?' জানতে চাইল রবিন।

'আফনে কিন্তুক খুব বালা বাংলা কন, সা'ব। দেকতে তো দেহা যায় বিদেশীরার লাহান।'

হাসল রবিন, 'ছোটবেলা থেকে বাঙ্গালীর সঙ্গে ওঠাবসা। কয়েকবার বাংলাদেশে এসে থেকে গেছি। বাংলা শেখা আর কঠিন কি। রাস্তাটার নাম কি?'

'এই রাস্তার কোন নাম নাই। আমি রাখছি ভূতের গলি।'

'বাহ, ভাল নাম। মানিয়েছে।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'ঢাকাতে একটা ভূতের গলি আছে না?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই হিরণ মিয়া বলল, 'হ, আছে। ওইডা ভূতের গলি না, অহন অইল মাইনষের গলি। বাপরে বাপ, যা ঘিঞ্জি। মাইনষের ঠেলায় মানুষই পলায়, আর ভূত থাকব কেমনে? এই যে দ্যাহেন না আমি পলাইয়া আইছি। ভূতের গলির কাছে বস্তিত থাকতাম।'

'ও, এইজন্যেই ভূতের গলি নামটা চট করে মাথায় এসে গেছে তোমার,' হেসে বলল কিশোর। আশপাশে তাকাতে তাকাতে বলল, 'সত্যি, নামটা মানানসই। তোমাকে তো খুব বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে হে। লেখাপড়া জানো নাকি?'

'হ। কেলাস ফাইভ পইর্যন্ত পড়ছি। পড়নের ইচ্ছা আছিল আরও। কইত্তে পড়মু? এগারোজন বাই-বইন। বাপে খাওয়াইব কইত্তে?'

'বাড়ি কোথায়? কুমিল্লার দিকে নাকি?'

হাসিতে দাঁত সব বেরিয়ে পড়ল হিরণ মিয়ার। 'আফনে জানলেন কেমনে?'

'তোমার ভাষা শুনে।'

মোড় নিল পথটা। দ্রুত কমে যাচ্ছে আলো। পাহাড়ের ঢালে এক জায়গায় ঘন ঘাসের মধ্যে দু'চারটা পুরানো পাথর বেরিয়ে থাকতে দেখা গেল। হিরণ মিয়া জানাল, ওটাই পুরানো গোরস্থান।

কয়েক মিনিট চুপচাপ রিকশা চালানোর পর একটা বহু পুরানো বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'আফনেরা মনে হয় অই বাড়িডারঅই খোঁজ করতাছেন?'

পাকা বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। ইংরেজ আমলে তৈরি করেছিল হয়তো কোনও বিদেশী। তারপর এ দেশীদের দখলে চলে গেছে। তবে বিশেষ যত্ন নেয় না। সামনে বড় বাগান ছিল এককালে। এখন তার চিহ্ন আছে কেবল।

'রাখো তো গেটের সামনে,' কিশোর বলল।

রঙচটা কাঠের গেটের সামনে রিকশা দাঁড় করাল হিরণ মিয়া। কোমর থেকে গামছা খুলে মুখের ঘাম মুছতে শুরু করল। 'আফনেরা কি কুনু কামে যাইবেন ওই বাড়িত? না বেড়াইতে আইছেন?'

'কাজেই এসেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'একজন পরিচিত মহিলা থাকেন ওবাড়িতে। তার সঙ্গে দেখা করব। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমরা আসছি।'

গেটের ভেতরে ঢুকে ঘাসে ঢাকা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'শহরে এত বাসাবাড়ি থাকতে এই জঙ্গলের ধারে থাকতে এল কেন মহিলা? তাও অসুস্থ একটা বাচ্চা নিয়ে?'

'ফিসফিস করছ কেন? ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'না, তা পাচ্ছি না। অস্বস্তি লাগছে।'

কান পাতল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল রবিন।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'শুনলে না? বাচ্চা ছেলের চিৎকারের মত লাগল।'

'আমার তো মনে হলো বেড়ালের চিৎকার।'
'উহুঁ! মানুষ।'
পুরানো আমলের বাড়ি। উঁচু বারান্দা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দুজনে বারান্দায়। দরজার পাশে কলিং বেলের বোতাম দেখতে পেল না। দরজায় টোকা দিল কিশোর।
সাড়া নেই।
জোরে থাবা দিয়ে ডাকল, 'কেউ আছেন?'
পায়ের শব্দ এগিয়ে এসে থামল দরজার সামনে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল একটা মহিলাকণ্ঠ, 'কে?'
'আমরা।'
'আমরা কে?'
'রেড ক্রস থেকে এসেছি। ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্যে টিকেট বিক্রি করতে।'
ছিটকানি খোলার শব্দ হলো। সামান্য ফাঁক হলো দরজা। সেই মহিলাই, মিসেস ইসলাম, চিনতে পারল কিশোর। কিন্তু ভলান্টিয়ারের পোশাক খুলে আসায় ওকে বোধহয় চিনতে পারল না মহিলা। ভুরু কুঁচকে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।
'আমরা স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার,' লেকচার শুরু করল কিশোর। 'এই যে এত এত লোক, অসহায় হয়ে পড়ে আছে কেউ হাসপাতালে, কেউ বাড়িতে, খেতে পাচ্ছে না, রোগেশোকে কাহিল...'
'হয়েছে হয়েছে, থামো!' হাত তুলল মহিলা, 'ওসব আমি জানি। আমি টাকা দিলেই বা আর কত দেব? ওতে কার কি উপকার হবে?'
'আপনার একটা টাকাও অনেক, ম্যাডাম। টাকা টাকা করে জমিয়েই তো শ হয়, শ থেকে হাজার...'
'বড় বেশি কথা বলো তুমি। দাঁড়াও।'
দরজাটা ফাঁক রেখেই ভেতরে চলে গেল মহিলা। উল্টোদিকের আরেকটা দরজা দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে গেল।
কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এই মহিলাই?'
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
দাঁড়িয়েই আছে ওরা। মহিলা আর আসে না। অন্ধকার প্রায় হয়ে গেছে। বড় বড় কালো মেঘের স্তর ভেসে যাচ্ছে আকাশে। যে কোন সময় বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করবে। বৃষ্টি নামবে। ঝড়ও হতে পারে।
পাহাড়ের দিকে তাকাল রবিন। পুরানো গোরস্থানটা চোখে পড়ে এখান থেকে। গায়ে কাঁটা দিল ওর। 'এত দেরি করছে কেন?'
কিশোর বলে উঠল, 'এবার শুনেছ? বেড়াল নয়!'
রবিনও শুনতে পেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কোন বাচ্চা ছেলে। 'হ্যাঁ।'
পাল্লাটা ঠেলে পুরো ফাঁক করে ফেলল কিশোর। ঘরে আসবাবপত্র প্রায় কিছুই নেই। গোটা কয়েক পুরানো চেয়ার বাদে। উল্টোদিকে তো দরজা আছেই,

মহিলা যেটা দিয়ে ঢুকেছে; এ ছাড়াও একপাশে আরও একটা দরজা। খোলা। কান্নার শব্দ আসছে ওটা দিয়ে।

ঢুকে দেখবে নাকি? দ্বিধা করতে লাগল কিশোর।

ঠিক এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল ছেলেটা। দিপু। খালি পা। পরনের পাজামাটা ওর মাপের চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। চোখ ডলে ডলে কাঁদছে। আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। অনেক বেশি বিধ্বস্ত লাগছে ওকে। কয়েক ঘন্টায় কি এমন ঘটেছে যে এত খারাপ অবস্থা হয়েছে ওর?

কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই প্রথমে একটা হাত সরিয়ে নিল ছেলেটা, তারপর আরেকটা। কান্না থামিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'দিপু, আমি। চিনতে পারছ?'

দাঁড়িয়েই রইল ছেলেটা। জবাব দিল না। মনে হলো চিনতে পারেনি।

'কি ব্যাপার, দিপু? আমি। তোমাকে ভালুকটা দিয়েছিলাম। চিনতে পারছ না?'

তাও কোন জবাব দিল না ছেলেটা। তাকিয়ে রইল। না চেনার ভঙ্গি।

ঘরে ঢুকল মিসেস ইসলাম। দিপুকে দরজায় দেখে জ্বলে উঠল তেলেবেগুনে। গটমট করে গিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি মেরে বলল, 'এই পাজি ছেলে, এখানে কি? কতবার না বলেছি ঘর থেকে বেরোবি না!'

এক ধাক্কায় দিপুকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজা টেনে দিল মিসেস ইসলাম। গজগজ করতে করতে এসে দাঁড়াল কিশোরের সামনে। দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও।'

একটা টিকেট ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'ছেলেটা কি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাকি?'

'তাতে তোমার কি?' প্রায় থাবা দিয়ে ওর হাত থেকে টিকেটটা কেড়ে নিয়ে মুখের ওপর দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল মহিলা।

বারান্দা থেকে নেমে এসে রবিন বলল, 'ঘটনাটা কি? এই আচরণ কেন মহিলার?'

'সেটাই তো রহস্যময়। ছেলেটার সঙ্গে মায়ের মত আচরণ করেনি, তাই না?'

'সৎমায়ের চেয়ে খারাপ।'

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। রবিনের মুখের দিকে তাকাল। তাই তো! এ কথাটা মনে পড়েনি কেন? দিপু বলেছে, ওর মা নয়। ঠিকই বলেছে। অসুস্থ ছেলের সঙ্গে এ রকম জঘন্য আচরণ করতে পারবে না কোন মা।

পাওয়া গেছে জবাব। মিসেস ইসলাম দিপুর সৎমা।

কিন্তু তাও কেন যেন মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকল কিশোরের। মেনে নিতে পারল না জবাবটা। কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা রয়ে গেছে।

আট

পরদিন সকালে হাসপাতালে ঢুকে অফিসে রিপোর্ট করতেই ক্লার্ক বলল, ওকে দেখা করতে বলেছেন নার্স সুপারভাইজার।

আঁচ করে ফেলল কিশোর, গণ্ডগোল হয়েছে। নিশ্চয় চিনে ফেলেছিল গতকাল। তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে সাফিয়া। নইলে নার্স সুপারভাইজার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন কেন?

অফিসেই আছেন নার্স সুপারভাইজার মিসেস রাহেলা মমতাজ। ফাইল দেখছেন। কিশোরকে দেখে হেসে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন, 'বসো।'

ফাইলটা দেখা শেষ করে একপাশে ঠেলে রেখে মুখ তুললেন আবার, 'তোমাকে চিলড্রেন্স ফ্লোর থেকে বদলি করে দিলাম। আজ থেকে এক্স-রে ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে। ওখানে কাজ করতে হয়তো ভাল লাগবে না তোমার, একঘেয়ে লাগতে পারে, তবু কিছু করার নেই। তোমার বিরুদ্ধে সিরিয়াস কমপ্লেন আছে।'

কে অভিযোগ করেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। নার্স সাফিয়া। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলতে গেল। কিন্তু হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে মিসেস মমতাজ বললেন, 'তোমার কাজের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই। গত কয়েকদিনের রেকর্ড খুব ভাল। কিন্তু রোগীদের ওপর গোপনে নজর রাখা, নিষিদ্ধ ফ্লোরে ঘোরাঘুরি করা হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী খুব বড় ধরনের অপরাধ। শুধু তাই না, চুরি করে নাকি রেকর্ড রুমে ঢুকে রোগীর ফাইলপত্রও ঘেঁটেছ তুমি।'

'প্লীজ, আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিন,' অনুনয় করল কিশোর। 'নার্স সাফিয়া বলেছে তো? কেন ঢুকেছিলাম...'

'কিশোর, তুমি এখানকার চাকুরে নও। তাহলে লিখিত কৈফিয়ত চাইতাম আমি। তুমি স্বেচ্ছাসেবী, বিনে পয়সায় আমাদের সাহায্য করছ, তাতে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাকে আসলে শাস্তি দেয়ার অধিকার আমাদের নেই। পছন্দ না হলে বড় জোর বলে দিতে পারি, তুমি ভাই আর এসো না এখানে। লাগবে না তোমার ভলান্টিয়ারি। কিন্তু বেগম মেহেরুন্নিসার অনুরোধে তোমাকে ঢোকানো হয়েছে। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস না করে...'

'দেখুন, নার্স সাফিয়া আপনাকে কি বলেছে জানি না...'

আরেকটা ফাইল টেনে নিলেন মিসেস ইসলাম। 'সাফিয়া সিনিয়ার নার্স, অভিজ্ঞ। এই হাসপাতালের তাকে প্রয়োজন। সে আমাকে অনুরোধ করেছে তোমাকে চিলড্রেন্স ফ্লোর থেকে সরিয়ে দিতে। তার অনুরোধ না শুনে পারব না আমি।'

'দেখুন, আমার সম্পর্কে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে। কোন রোগীর ওপর

গোপনে নজর আমি রাখিনি। সেটা যে অন্যায়, অভদ্রতা, এই সাধারণ জ্ঞানটুকু আমার আছে। একটা বাচ্চা ছেলে...'

'অহেতুক আমার সময় নষ্ট করছ। এক্স-রে রুমে কাজ পছন্দ না হলে যখন খুশি বেরিয়ে যেতে পারো। দুর্গতদের সেবা করার আরও কত উপায় আছে। ত্রাণ বিতরণ, টিকেট বিক্রি...'

রাগ হয়ে গেল কিশোরের। এই অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে সে ছাড়বে না। নার্স সাফিয়া কেন তার পেছনে লেগেছে, সেটা না জেনে আর স্বস্তি নেই। জানতে হলে এই হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া চলবে না। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, আমি এক্স-রে ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করছি।'

এক্স-রে ডিপার্টমেন্টেও তাকে দিয়ে পিয়নের কাজই করানো হলো। ভাল কিছু নয়। খামে প্লেট ঢোকানো, ডাক্তারদের নির্দেশে কাউকে সেটা দিয়ে আসা, এ সব। খিচড়ে গেল মেজাজ। এই যদি হয় ভলান্টিয়ারি, জানত, তাহলে কোন গাধায় আসে এখানে কাজ করতে! সুযোগ পেয়ে চাকরের মত খাটানো হচ্ছে ওকে। কিছু বলতেও পারছে না। নিজের ইচ্ছেয় এসেছে। প্রতিবাদ করতে গেলে বলবে, ভাল না লাগলে বিদেয় হও। রাহেলা মমতাজ তো একবার বলেই দিয়েছেন। মানবিকতা দেখিয়ে মানুষের সেবা করতে এলে যে এত লাঞ্ছনা পোহাতে হয়, জানা ছিল না ওর।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছে সময়। এমন এক জায়গায় ঢোকানো হয়েছে ওকে, এখান থেকে যে রহস্যের তদন্ত করবে তারও উপায় নেই।

কোনমতে কয়েকটা ঘণ্টা পার করে দিয়ে লাঞ্চের সময় ক্যান্টিনে ঢুকল। প্ল্যান একটা করে ফেলেছে। টেবিলে বসে রবিনের অপেক্ষা করতে লাগল।

রবিন এল। কি ঘটেছে জানাল কিশোর। তার পরিকল্পনার কথা বলল।

'তাই বলে ওর কাছে মাপ চাইতে যাবে?' ক্যান্টিনের কোলাহল ছাপিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন।

'আর কোন উপায় নেই। এই রহস্য ভেদ করতে হলে, অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইলে কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। সাফিয়াকে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বলব, "আমার ভুল হয়ে গেছে সিসটার, মস্ত অন্যায় করে ফেলেছি আপনার কথা না শুনে। দিপুর ব্যাপারে নাক গলানোটা আমার অপরাধ হয়ে গেছে। এবারটির মত মাপ করে দিন।" বলব, "এক্স-রে রুমে কাজ করলে মারা পড়ব আমি। বেগম মেহেরুন্নিসার ভয়ে ছেড়েও যেতে পারছি না, তাহলে তিনি আর আস্ত রাখবেন না। একমাত্র ভরসা এখন আপনি। আমাকে বাঁচান, সিসটার। নার্স সুপারভাইজারকে বলে আপনার অভিযোগ তুলে নিন। কোন পেশেন্ট ফ্লোরে আমাকে কাজ করতে দেবার সুপারিশ করুন।" এ ভাবে বললে আমার বিশ্বাস না শুনে পারবে না।'

'কি জানি বাপু, কিছু বুঝতে পারছি না। খালার ভয়ে ভলান্টিয়ারি ছাড়তে পারছ না, এ রকম হাস্যকর যুক্তি ও মানলে হয়। আমি হলে হয় এক্স-রে রুমেই পচে মরতাম, নয়তো হাসপাতাল ছেড়ে দিতাম। তবু ওই ডাইনির সামনে আর

যেতাম না।'

'আমিও যেতে চাই না। কিন্তু রহস্য ভেদ করতে হলে এ ছাড়া আর কোন পথও নেই। বুঝতে পারছ না?'

'যদি জিজ্ঞেস করে রেকর্ড রুমে কেন ঢুকেছিলে? কি জবাব দেবে?'

'জবাব নেই। তাই মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলব ও ঘরে কি আছে দেখার কৌতূহল হয়েছিল। বলব, আর এ রকম হবে না। আরেকবার চিলড্রেনস ফ্লোরে কাজ করতে দেয়ার জন্যে হাতেপায়ে ধরব। সাফিয়া বললে মানা করবেন না মিসেস মমতাজ।'

'যদি সে বলে।'

'বলবে। হাজার হোক, সাধারণ নার্স ছাড়া তো আর কিছু নয় সে। চাকরির ভয় আছে। জানে আমি বেগম মেহেরুন্নিসার লোক। বেশি তেড়িবেড়ি করলে ভাল হবে না। আমি যে তাকে অনুরোধ করতে যাব এটাই তো বেশি। নরম না হয়ে পারবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক। কবে কথা বলতে চাও?'

'আজই। ছুটির পর।'

'তারমানে তোমার বেরোতে দেরি হবে।'

'হতে পারে।'

'ঠিক আছে। আমি নিচে অপেক্ষা করব। একসঙ্গেই বাড়ি যাব।'

নয়

বিকেলে ডিউটি শেষে চিলড্রেনস ফ্লোরে উঠল কিশোর। দল বেঁধে সেকেণ্ড উইং থেকে বেরিয়ে আসছে তখন শ্রমিকেরা। হই-চই করতে করতে এগোচ্ছে সিঁড়ির দিকে। সেদিনের মত কাজ শেষ ওদের। হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সদের শিফট বদলের সময়।

ডেস্কে বসে আছে নার্স বিশাখা গোমেজ। কানে রিসিভার। কথা বলছে টেলিফোনে, নজর বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাওয়া শ্রমিকদের দিকে। চোখে রাজ্যের বিরক্তি।

তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর।

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে আনমনে বিড়বিড় করল বিশাখা, 'এই ওয়ার্কারগুলোকে দিয়েছে হাসপাতালের ভেতর দিয়ে যাওয়ার জায়গা! আর কাজ পেল না! একেবারে বাজার বানিয়ে ফেলল!' কিশোরের দিকে তাকাল। 'তোমার কি?'

'সাফিয়া সিস্টারকে খুঁজছি। উনি কোথায়?'

'আছে এখানেই কোথাও,' উঠে দাঁড়াল বিশাখা। কোণের একটা টেবিল থেকে একটা মেডিকেল ট্রে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওয়ার্ডে যাবে।

দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। সাফিয়াকে খুঁজতে যাবে, না ওখানে ওর অপেক্ষায়

দাঁড়িয়ে থাকবে, ভাবছে।

শেষে করিডরে বেরিয়ে এল। নার্স স্টেশনের উল্টোদিকে করিডরের মাথার কাছে দেখা গেল সাফিয়াকে। আশপাশে কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলেছে সোজা।

ধরার জন্যে ছুটল কিশোর। ডাক দেবে, ঠিক এই সময় এমন একটা কাজ করল সাফিয়া, ডাক দেয়া আর হলো না ওর। সেকেণ্ড উইঙে যাওয়ার প্রবেশ নিষেধ লেখা দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল নার্স। কোন রকম দ্বিধা না করে ঢুকে গেল ভেতরে। লাগিয়ে দিল দরজা।

হাঁ হয়ে গেছে কিশোর। এই অসময়ে ওখানে কি কাজ সাফিয়ার?

যাবে নাকি দেখতে? নাহ্‌, উচিত হবে না। ওকে উঁকি মারতে দেখলে সাফিয়া যাবে আরও খেপে। এমনিতেই ওর বিরুদ্ধে চুরি করে নজর রাখার অভিযোগ করে এসেছে। এখন আবার সেই একই কাজ করতে দেখলে হাজার অনুনয় করেও আর তাকে নরম করতে পারবে না। তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। বেরিয়ে আসুক। তখন কথা বলবে।

নার্স স্টেশনে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল সে। এই সময় করিডর ধরে হেঁটে যেতে দেখল অরুণকে। সাফিয়া যেদিকে গেছে সেদিকে। কৌতূহল হলো কিশোরের। আবার বেরোল করিডরে।

অরুণও একই কাণ্ড করল। গিয়ে দাঁড়াল সেকেণ্ড উইঙে ঢোকার দরজাটার সামনে। আস্তে ঠেলে খুলে উঁকি দিল ভেতরে। ভাবেভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ সতর্ক। সেও ঢুকল ভেতরে, তবে সাফিয়ার মত অত নির্দ্বিধায় নয়।

অবাক কাণ্ড! পর পর ওরা দুজন গিয়ে ওই নিষিদ্ধ জায়গায় ঢুকল কেন? কথা বলবে? এই ভর সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার অসমাপ্ত ফ্লোরে ছাড়া কথা বলার আর জায়গা পেল না?

নাকি সাফিয়াকে গোপনে অনুসরণ করে ঢুকল অরুণ?

দরজার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যে নজর সরাল না কিশোর। ওর অলক্ষ্যে যাতে সাফিয়া কিংবা অরুণ বেরিয়ে চলে যেতে না পারে। সাফিয়ার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে এখন ওরা ভেতরে কি করছে, জানতে বেশি আগ্রহী সে।

দশ মিনিট গেল। পনেরো মিনিট। বিশ। পঁচিশ। দুজনের কেউই বেরোল না সেকেণ্ড উইং থেকে।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। এতক্ষণ কি করছে ওরা?

নার্সদের শিফটিঙের অদল-বদল শেষ হয়েছে। যাদের ডিউটি শেষ, তারা চলে গেছে। নতুন ডিউটিওয়ালারা দায়িত্ব নিয়েছে।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখবে নাকি? পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা—না, থাক। গোপনে লোকের ওপর নজর রাখার অভিযোগ করবে হয়তো গিয়ে আবার সাফিয়া। আর তাকে সুযোগ দেবে না ও।

কিন্তু জনশূন্য ওই নিষিদ্ধ উইঙে এতক্ষণ করছে কি ওরা?

বেশিক্ষণ আর কৌতূহল দমন করতে পারল না কিশোর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। কেউ কি তার ওপর নজর রাখছে? মনে হয় না। আর রাখলে রাখুকগে।

সাবধানে হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে খুলল দরজাটা। উঁকি দিল ওপাশের অন্ধকারে।

লাশকাটা ঘরটার মতই যেন সব মৃত ওখানে। কোন শব্দ নেই। কোন নড়াচড়া নেই। বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। আলো এত কম, কোন জিনিসই পরিষ্কার দেখা যায় না। ঘরটা যে অনেক বড়, সেটা বোঝা যায়।

মেঝেতে পড়ে আছে কিম্ভূত সব জিনিস। বিল্ডিং বানাতে কাজে লাগে এ সব যন্ত্রপাতি আছে কয়েকটা। একপাশে সুড়কির স্তূপ। কোনখানেই কোন নড়াচড়া নেই।

'এই যে, শুনছেন?' ভয়ে ভয়ে ডাক দিল কিশোর।

কেউ জবাব দিল না।

গেল কোথায় অরুণ আর সাফিয়া? বেরোনোর মত আর কোন দরজাও চোখে পড়ল না। ফ্লোরগুলো থেকে নামার সিঁড়ির কাঠামোও তৈরি হয়নি এখনও যে ওটা বেয়ে নেমে যাবে। ওঠানামার আর কোন জায়গা নেই বলেই তো শ্রমিকরাও হাসপাতালের ফার্স্ট উইঙের সিঁড়ি ব্যবহার করে।

'কেউ আছেন?' আবার ডাকল সে। নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল স্বরটা। কেমন খসখসে।

পড়ে থাকা ওই যন্ত্রগুলোর আড়ালে কি ঘাপটি মেরে আছে কেউ? কোন কারণে লুকিয়ে পড়েছে দুজনে? তাই বা কেন করবে? কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না।

কি ঘটেছে না দেখে যেতে ইচ্ছে করল না। দরজার অন্যপাশে চলে এল ও। খোলা দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারে এ জন্যে পেছনে ভেজিয়ে দিল পাল্লাটা। সাবধানে পা বাড়াল সামনে। সুড়কি, বালি, যন্ত্রপাতির ফাঁকফোকর দিয়ে এগোল অন্য প্রান্তের দেয়ালের দিকে। চিৎকার করে ডাকল আবার, 'সিসটার সাফিয়া? অরুণ?'

তার চিৎকার দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে আবার ফিরে এল তার কানে। যাদের ডাকা হলো তাদের কেউই জবাব দিল না।

নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেল ওর।

ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল অন্য পাশের দেয়ালের কাছে।

দেখল না ওদের কাউকে।

আশ্চর্য! গেল কোথায় দুজন মানুষ? হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না।

অন্ধকারে কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে অবশ্য। মেঝেতে কালো জিনিসটা যে পড়ে আছে ওটা কি?

এগিয়ে গিয়ে দেখল সে।

দড়ি আর তারের বাণ্ডিল। দড়িতে হাত দিয়েই চমকে গেল। মনে হলো সাপ

নড়াচড়া করে উঠেছে।

নাহ্, নেই দুজনের কেউ। কোন দিক দিয়ে বেরিয়েছে ওরাই জানে! এখানে বেশিক্ষণ থাকলে সিকিউরিটি গার্ডের চোখে পড়ে যেতে পারে। তাহলে মুশকিল হবে। বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

ফিরে চলল আবার। কোন পথে এসেছিল, অন্ধকারে ঠিক রাখতে পারল না। দরজাটা খোলা রাখলে হত। ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যেত। ফিরে যেতে পারত সহজে।

অন্ধকারে দ্রুত পা চালাতে গিয়ে আরেকটু হলে মরতে বসেছিল। সামনে ফেলতে গিয়ে পায়ের নিচে মেঝে পেল না। খালি। শেষ মুহূর্তে ঝট করে সরিয়ে আনল পা'টা। আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে দেখল, সামনের দেয়ালে কালো ফোকর। মেঝেতেও ফোকর। এলিভেটর তৈরির জন্যে জায়গা রাখা হয়েছে। দেয়ালের ফোকরটাতে দরজা হবে, মেঝের ফোকরে শ্যাফট। চার তলা থেকে নিচে পড়লে কি হত ভেবে শিউরে উঠল সে।

কাঁপুনি শুরু হলো তার শরীরে। চিকণ ঘাম দেখা দিল। হাঁটতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করল না আর। অসমাপ্ত এই বিল্ডিঙে কোথায় কোন মৃত্যুফাঁদ লুকিয়ে আছে কে জানে! সাবধানে যতটা সম্ভব দেখে দেখে পা ফেলতে লাগল।

নরম কিসে যেন পা লাগল। মনে হলো নড়ে উঠল জিনিসটা। ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল সে।

কিসে পা লেগেছে দেখার জন্যে হাঁটু মুড়ে বসে ঝুঁকে তাকাল।

ছড়িয়ে থাকা একটা হাত।

ধক করে উঠল বুক। নজর সরাল আস্তে আস্তে।

বালির স্তূপের ধার ঘেঁষে পড়ে আছে একটা দেহ। অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে যতখানি দেখা গেল তাতেও চিনতে অসুবিধে হলো না।

চিত হয়ে পড়ে আছে নার্স সাফিয়া। চোখ দুটো খোলা। গলায় বিঁধে আছে লম্বা একটা সার্জিক্যাল নাইফ।

হাঁ করে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ওটা যে লাশই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে ভাবে ছুরিটা গলায় বিঁধে আছে, এরপর কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

তারপরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সাহস করে গলায় হাত দিল সে। কয়েক ফোঁটা রক্ত লাগল হাতে। এমনভাবে ঢোকানো হয়েছে ছুরিটা, ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরোতে পারেনি। মনে হয় এমন কেউ করেছে খুনটা, যার জানা আছে কোথায় ছুরি ঢোকালে রক্তে ভেসে যাবে না। দ্রুত মারা যাবে। দেখে মনে হয় পেশাদার খুনীর কাজ।

কিন্তু সাফিয়ার পেছনে ঢুকতে তো দেখল অরুণকে। তার যা বয়েস, পেশাদার খুনী হওয়ার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। এমন হতে পারে, ঘ্যাচ করে গলায় মেরে দিয়েছে। ঠিক জায়গায় লেগে গেছে। মারাটাই উদ্দেশ্য ছিল

তার। দ্রুত মরবে, রক্ত কম বেরোবে, এ সব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায়নি। কাকতালীয়ভাবেই যা ঘটার ঘটে গেছে।

আরও কয়েকটা সেকেণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বসে রইল কিশোর। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ছুটে চলল দরজাটার দিকে।

দৌড়ে এসে নার্স স্টেশনে ঢুকল। দেখে ডেস্কে বসে আছে নার্স বিশাখা। রবিন কথা বলছে। নিশ্চয় ওর কথাই জিজ্ঞেস করছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর।

ফিরে তাকাল রবিন, 'নিচে দাঁড়িয়ে আছি সেই কখন থেকে। কোথায় গিয়েছিলে?'

হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, 'এদিকে এসো। কথা আছে।' বিশাখার কাছ থেকে সরিয়ে এনে দরজার দিকে হাত তুলে বলল, 'নার্স সাফিয়া মরে পড়ে আছে ওর ভেতরে। গলায় ছুরি বেঁধা।'

'বলো কি? কে মারল?'

'জানি না!'

'তুমি গিয়েছিলে কেন ওখানে?'

'সে অনেক কথা। পরে বলব। ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার। তারপর পুলিশ...'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

দুজনেই বিশাখার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের উত্তেজিত মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল নার্স, 'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?'

সাফিয়াকে কোথায়, কি অবস্থায় দেখে এসেছে জানাল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে নার্স। বিশ্বাস করতে পারছে না। আচমকা নড়ে উঠল সে। থাবা মেরে তুলে নিল রিসিভার। দ্রুত কয়েকটা নম্বর টিপল। রিসিভারে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'ডাক্তার হারুণ আছেন?...দাও! জলদি!...কে? স্যার বলছেন? নয় তলায়। বিশাখা। স্যার, এখুনি একবার আসতে হবে আপনাকে। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে!'

লাইন কেটে দিয়ে আরেকটা নম্বরে রিঙ করল সে। 'সিকিউরিটি? জলদি! চার তলায়। খুন!'

চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাখা। 'রেসিডেন্ট ডক্টরকে খবর দিয়েছি। আসছেন। সিকিউরিটিও আসছে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'চলো।' ডেস্কের অন্যপাশ থেকে বেরিয়ে এল সে। দুই গোয়েন্দাকে তার সঙ্গে আসার ইশারা করে হাঁটতে শুরু করল।

আগে আগে চলল কিশোর। তাড়াহুড়ো করে করিডরে বেরোতে গিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল আরেকটু হলে একটা বেডের সঙ্গে। সার্জিক্যাল মাস্ক পরা একজন অর্ডারলি বেডটা ঠেলে নিয়ে চলেছে এলিভেটরের দিকে। তাতে রোগী। চাদর দিয়ে ঢাকা। অপারেশনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে বোধহয়।

বেডের পাশ কাটিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সেকেণ্ড উইঙে ঢোকার দরজাটার

সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল।

এই সময় এলিভেটর থেকে নেমে এলেন ডাক্তার হারুণ। সঙ্গে ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরা দুজন সিকিউরিটি গার্ড।

সবাই ঢুকল অন্ধকার ঘরটাতে।

বড় টর্চ জ্বালল একজন সিকিউরিটি। দুজনের মধ্যে সে লম্বা। নানা রকম জিনিস আর আবর্জনায় বোঝাই ঘরটার মধ্যে আলোটা ঘুরিয়ে আনল একবার।

কেউ নেই।

কিশোর যা যা বলেছে ডাক্তারকে বলছে বিশাখা।

'লাশটা কোথায় পড়ে থাকতে দেখেছ?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল গার্ড।

এলিভেটরের গর্তের কাছে বালির স্তূপটা দেখাল কিশোর।

আরেক সিকিউরিটির টর্চটা চেয়ে নিয়ে দৌড় দিলেন ডাক্তার হারুণ। স্তূপটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পেছন পেছন গেল দুই গার্ড আর বিশাখা। টর্চের আলো ফেলে দেখছে।

কিশোর আর রবিন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

অবাক লাগছে কিশোরের। কেউ কিছু করছে না কেন? ডাক্তার সাহেব লাশটা পরীক্ষা করে দেখছেন না কেন! কোন প্রতিক্রিয়া নেই কারও মধ্যে।

এগিয়ে গেল কিশোর।

বালির স্তূপের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

দশ

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল যেন কিশোর। কয়েক পা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল তার কাছে। ফিসফিস করে বিমূঢ় কণ্ঠে বলল, 'লাশটা নেই!'

'তা কি করে হয়? এইমাত্র না দেখে গেলে তুমি?'

'শুধু দেখিনি, হাত দিয়ে দেখেছি। আঙুলে রক্তও লেগেছিল।'

'পড়লে আরও ঝামেলায়। তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'বুঝতে পারছি।'

সিকিউরিটির লম্বা লোকটা গিয়ে উঁকি দিচ্ছে এলিভেটর শ্যাফটের ভেতরে। আলো ফেলে দেখল। ফিরে তাকিয়ে তার সঙ্গীকে বলল, 'কিছুই নেই।'

দ্বিতীয় লোকটাও গিয়ে শ্যাফটের গর্তে আলো ফেলল। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার হারুণ আর বিশাখা।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'আস্ত একটা মানুষ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। লাশ হোক আর যাই হোক।'

'সেকথাই তো ভাবছি। দশ মিনিট আগেও ছিল ওখানে সাফিয়ার লাশ। আমি বেরোনোর পর সরিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি সরাল কি করে!'

'কাকে সন্দেহ হয় তোমার?'

'সাফিয়ার পেছন পেছন অরুণকে এখানে ঢুকতে দেখেছিলাম।'
'অরুণ!' নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করল রবিন। 'ও খুন করেছে?'
'সার্জিক্যাল নাইফ চুরি করতে দেখেছি আমি ওকে। ওরকম একটা ছুরিই গলায় বেঁধা ছিল সাফিয়ার,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে দুবার চিমটি কাটল কিশোর।
ঘুরে দাঁড়াল দুই সিকিউরিটি, ডাক্তার আর বিশাখা।
রবিন বলল, 'আসছে। ধমক খাওয়ার জন্যে তৈরি হও।'
কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল বিশাখা। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'কই, লাশ কোথায়? কি দেখেছ তুমি?'
'লাশই দেখেছি আমি!' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'কোন সন্দেহ নেই আমার!'
'তাহলে গেল কোথায় ওটা?'
'বুঝতে পারছি না!'
বিশাখার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। আলো ফেললেন কিশোরের মুখে। বুঝতে পারলেন মিথ্যে বলছে না কিশোর। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেসে ফেললেন, 'বুঝেছি কি হয়েছে। ওই গাধা, হান্নানটা করেছে এই কাজ। সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে রসিকতা করে। ওর এই ইস্কুলের স্বভাব আর গেল না। নিশ্চয় মর্গ থেকে এনে বেওয়ারিশ কোন মহিলার লাশ নার্সের পোশাক পরিয়ে ফেলে রেখেছিল এখানে। জানে, নাইটগার্ড টহল দিতে এলে দেখতে পাবে। যেহেতু ডিউটিতে রয়েছি আমি, ডাক পড়বে আমার। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসব। বোকা বনব। কারণ, আমরা আসার আগেই লাশ সরিয়ে ফেলবে সে। তার প্ল্যান মতই সব হয়েছে। কেবল নাইট গার্ডের জায়গায় তুমি ঢুকেছিলে এখানে।'
কিশোর কেন ঢুকেছে, এ প্রশ্নটা মাথায় এল না হারুণের। জবাব দেয়া থেকে বেঁচে গেল কিশোর।
অবাক কণ্ঠে বিশাখা বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, স্যার, আজও আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছেন ডাক্তার হান্নান?'
'তা ছাড়া আর কে?'
'কিন্তু লাশটা সরাল কিভাবে?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'এত তাড়াতাড়ি?'
কনুইয়ের গুঁতো মারল রবিন। মনের ভাব, ঝামেলাটা যখন কেটে যাচ্ছে, যাক না। আবার সেটাকে খুঁচিয়ে ঝামেলা বাড়ানো কেন!
'আরে হান্নানকে তোমরা চেনো না। ওর অসাধ্য কোন কাজ নেই।'
অসাধ্যটা কিভাবে সাধন করেছে, সেটা জানার প্রবল ইচ্ছেটা আপাতত চাপা দিল কিশোর। রবিনের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে চুপ হয়ে গেল। ঝামেলাটা আপাতত কেটেই যাক।
সেকেণ্ড উইং থেকে বেরিয়ে এল সবাই।
বিশাখা চলে গেল তার ডেস্কের দিকে।
দুই গার্ড এবং ডাক্তার হারুণের সঙ্গে এলিভেটরে করে নিচে নেমে এল কিশোর আর রবিন। গার্ডরা চলে গেল ওদের অফিসের দিকে।

নিজের অফিসে যাওয়ার আগে দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন হারুণ। 'ছেলেরা, শোনো, একটা অনুরোধ করব তোমাদের। এ কথাটা ডাক্তার হান্নানকে বোলো না। আমি ওর সামনে এমন ভান করব যেন কিছু জানিই না। তার রসিকতার ফাঁদে পা দিইনি বুঝলে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে সে। ওটাই হবে তার ওপর আমার প্রতিশোধ।'

বড় বড় মানুষেরাও কেমন ছেলেমানুষের মত কাণ্ড করে, দেখে অবাক হয়ে গেল রবিন। চুপ করে রইল।

কিন্তু কিশোর এত সহজে মেনে নিতে পারল না। 'আপনার কি ধারণা এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে? এধরনের রসিকতা করার বয়েস কি আছে ডাক্তার হান্নানের?'

আবার ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে ভেবে প্রমাদ গুনল রবিন। তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমরা কাউকে কিচ্ছু বলব না। কিশোরই ভুল করেছে। অন্ধকারে অন্য লাশকে সাফিয়া ভেবেছে। এছাড়া আর কি হবে? এসো, কিশোর, প্লাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

হাত ধরে টেনে ওকে সরিয়ে আনল রবিন।

ডাক্তার হারুণ চলে গেলেন।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। রবিনকে বলল, 'তুমি বাড়ি যাও। আয়না খালা যদি ফেরেন, আমার কথা জিজ্ঞেস করেন, বলবে হাসপাতালে কাজ আছে। আমার ফিরতে দেরি হবে।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'এ রহস্যের শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না।'

'করবেটা কি তুমি?'

'ওপরে যাচ্ছি। চিলড্রেন্স ওয়ার্ডে। তুমি বাড়ি চলে যাও।'

রবিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এলিভেটরের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

আবার ওকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল নার্স বিশাখা। 'তুমি?'

'নার্স সাফিয়ার সঙ্গে দেখা না করে যান না।'

'ওকে না খানিক আগে মৃত দেখে এসেছ বললে?'

'এখন তো জানি ভুল দেখেছি। ডাক্তার হান্নান রসিকতা করেছেন ডাক্তার হারুণের সঙ্গে।'

'তুমি ওসব কথা বিশ্বাস করেছ?'

'করব না কেন? আপনাদের কথা শুনে তো বুঝলাম, এরকম রসিকতার ঘটনা আরও ঘটেছে এই হাসপাতালে।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল বিশাখা। আর কিছু না বলে ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

'আমি এখানে বসি?' অনুমতি চাইল কিশোর।

'বসো,' মুখ না তুলেই বলল বিশাখা।

কয়েক মিনিট পর জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা, সিসটার, সাফিয়া খাতুন কোথায় গেছে কিছু অনুমান করতে পারেন? আসছে না কেন এখনও?'

'ডিউটি শেষ। ফিরে আসার তো কোন কারণ দেখি না আমি। শুধু শুধু বসে আছ। কাল সকালে কথা বোলো।'

'দেখি, থাকি না আরেকটু। আসতেও তো পারে।'

'তোমার ইচ্ছে,' আবার ম্যাগাজিনে মন দিল বিশাখা।

এখানে বসে এখন নার্স সাফিয়ার অপেক্ষা করছে না কিশোর। বিশাখাকে মিথ্যে কথা বলেছে সে। ওর উদ্দেশ্য, আবার ঢুকবে ছোট অফিসটায়। রেকর্ড রুমে। কখন সুযোগ পাবে, কতক্ষণ দেরি হবে, কিছুই জানে না। তাই দাঁড় করিয়ে না রেখে বিদেয় করে দিয়ে এসেছে রবিনকে।

বসে বসে ভাবতে লাগল সে। সাফিয়া খুন হয়েছে কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু ওর লাশটা সরানো হলো কিভাবে? প্রশ্নটার জবাব জানা গেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত। খুনী কে, হয়তো সেটাও অনুমান করা যেত।

অরুণ খুন করেছে, কিছুতে মেনে নিতে পারছে না এ কথা। কিন্তু নিজের চোখে যে দুটো ঘটনা ঘটতে দেখল—ছুরি চুরি, আর সাফিয়াকে অনুসরণ করে গিয়ে সেকেণ্ড উইঙে ঢোকা—এর কি ব্যাখ্যা?

সব রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওই ছোট্ট ছেলেটার অদ্ভুত আচরণের মধ্যে। দিপু!

দিপু···নার্স সাফিয়া···অরুণ···কোথাও না কোথাও, কোন না কোনভাবে একটা যোগাযোগ আছেই তিনজনের মধ্যে। সেটা কি জানা গেলে সমাধান করে ফেলা যাবে রহস্যের।

আবার যেতে হবে হিরণ মিয়ার ভূতের গলিতে। দিপুদের বাড়িতে। তবে তার আগে ওর মেডিকেল ফাইলটা দেখতে হবে আরেকবার ভাল করে। গতকাল তাড়াহুড়োয় সবটা পড়তে পারেনি।

কখন আসবে রেকর্ড রুমে ঢোকার সুযোগ? নার্স বিশাখা ওঠে না কেন? বসে আছে তো আছেই। এ সময়টায় তেমন ডিউটি দিতে হয় না রোগীদের কেবিনে। কাজ তাই কম।

অবশেষে ট্রলিতে করে খাবার নিয়ে উঠে আসতে লাগল বয় আর আয়ারা। রোগীদের রাতের খাবার সরবরাহের সময় হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল বিশাখা। ঠিকমত খাবার দেয়া হচ্ছে কিনা তদারক করতে হবে ওকে। চলে গেল একজন আয়ার পেছন পেছন।

কারও নজর আছে কিনা ওর দিকে দেখল কিশোর। নেই। আস্তে করে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছোট অফিসটার দরজার দিকে। আরেকবার দেখল, কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

দরজা লাগিয়ে আলো জ্বেলে দিল সে। জানা আছে কোন তাকে রয়েছে দিপুর ফাইল। সোজা এগোল সেদিকে।

কিন্তু নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে থেমে গেল। ফাইলটা নেই আগের

জায়গায়।

খুঁজতে শুরু করল সে। যে তাকে রেখেছিল, সেখানে পেল না। পরিষ্কার মনে আছে, গতকাল দেখার পর এখানেই রেখে গিয়েছিল। হয়তো এরপর কেউ সরিয়ে অন্য কোনখানে রেখেছে।

নিচের তাকে দেখল। তার নিচের তাকে। তন্ন তন্ন করে খুঁজল সবগুলো তাক।

কোথাও নেই। আশ্চর্য! গেল কোথায় ফাইলটা?

নতুন ফাইলের তাক, পুরানো ফাইলের তাক, সমস্ত জায়গায় ঘাঁটাঘাঁটি করল। কিন্তু নেই তো নেইই। পেল না ফাইলটা। দিপুর নামে কোন চার্টও চোখে পড়ল না। যেন দিপু নামের কোন ছেলে কোনকালে ভর্তিই হয়নি এই হাসপাতালে।

বড়ই তাজ্জব ব্যাপার!

এগারো

'নার্স সাফিয়ার দেখা পেলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

পরদিন দুপুরে ক্যান্টিনে খেতে বসেছে দুজনে। মুখ তুলল কিশোর। 'তোমার কি এখনও ধারণা কাল রাতে আমি ভুল দেখেছি?'

'না না, তা নয়,' কিশোরের দৃষ্টি এড়াতে রূপচাঁদার কাঁটা বাছায় মন দিল রবিন। 'এমনি জিজ্ঞেস করেছি। কোন খোঁজ আছে কিনা···খুব টেস্টি মাছ।'

'দু'তিন দিনের আগে খোঁজ পড়বে বলে মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ভাত মুখে দিল কিশোর।

'কেন?'

'হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অনুপস্থিত থাকতে পারে যে কেউ। দু'তিন দিন যাওয়ার পরও যদি কোন খবর না পাঠায় অফিসে, তখন হয়তো খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা করবেন শিফট-ইন-চার্জ। নাও করতে পারেন। এত বড় হাসপাতাল। কত নার্স। একজন নার্সের অনুপস্থিতি খুব একটা নজরে আসবে না কারও।'

'বিশাখা আসবে। আর ডাক্তার হারুণের। টনক নড়বে। হয়তো শিফট-ইন-চার্জকে জানাবে কালকের ঘটনাটার কথা।'

'হয়তো। তবে ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি।'

'কি করবে?'

'সাফিয়ার বাড়িতে যাব। বাড়ির লোককে ওর কথা জিজ্ঞেস করব। দেখি, ওরা কি বলে? তবে আমার বিশ্বাস, যাওয়া লাগবে না। আজই খোঁজ করতে আসবে ওরা। হাসপাতালে দু'তিনদিন অনুপস্থিত থাকলে এখানকার কেউ হয়তো খোঁজ নেবে না, কিন্তু বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলেই বাড়ির লোকে অস্থির হয়ে পড়বে।'

'তা ঠিক।'

খাওয়া শেষ করে রবিন চলে গেল তার ডিউটিতে। কিশোর উঠে এল এক্স-রে রুমে। গড়িয়ে গড়িয়ে কাটল আরেকটা একঘেয়ে দিন।

বিকেলের শিফট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিলড্রেন্স ফ্লোরে উঠে এল সে। সাফিয়ার ঠিকানা জানা দরকার। নার্স বিশাখা এসেছে। কিশোরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কাল সাফিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'না।'

'আজকে?'

'আজ তো আসেইনি। সেজন্যেই এলাম আপনার কাছে। ওর ঠিকানা দরকার।'

'কি এমন কাজ তোমার ওর কাছে?'

যেন খুব অসহায় বোধ করছে, এমন ভঙ্গি করে বলল কিশোর, 'এক্স-রে রুমে কাজ করতে আমার ভাল লাগে না। সিসটার সাফিয়া নার্স সুপারভাইজারের কাছে কমপ্লেন করেছে। তাই তাকে ধরেই আবার এখানে ফেরার ইচ্ছে। সুপারভাইজারকে বলে যদি আবার আমাকে এখানে নিয়ে আসে, বেঁচে যাই।'

মৃদু হাসল বিশাখা। 'ও, এই সমস্যা। আমাকে আগে বললেই পারতে। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে দেখা হলে সাফিয়াকে বলে দেব।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল কিশোরের মুখে। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সিসটার। কোথায় দেখা হবে? থাকে কোথায়?'

'কেন, হাসপাতালের নার্স কোয়ার্টারে।'

'ও, আমি ভেবেছি বাড়িতে থাকে। পরিবারের সঙ্গে।'

'না, থাকে না। স্বামীটা একটা শয়তান। কাজকর্ম কিছু করে না। ভাত দিতে পারত না। উল্টে মাতাল হয়ে এসে ভাত চেয়ে না পেয়ে বৌকে পেটাত। একটা মেয়ে আছে। সহ্য করতে না পেরে শেষে মেয়েকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল একদিন সাফিয়া। পেটের দায়ে নার্সের চাকরি নিল।'

'মেয়েটা এখন কোথায়?'

'চিটাগাঙে। হোস্টেলে রেখে পড়ায় ওকে সাফিয়া। ডাক্তার বানাবে।'

নার্স সাফিয়ার বদমেজাজের একটা বড় কারণ খুঁজে পেল কিশোর। তার এতিম মেয়েটার কথা ভেবে দুঃখ হলো। কে দেখবে এখন ওকে? বাপের কাহিনী তো যা শুনল, ও থাকা না থাকা সমান কথা।

ঘড়ি দেখল বিশাখা। 'এখনও আসছে না কেন?' আনমনে বলল, 'হয়তো আজ আর আসবেই না। মাঝে মাঝে এ রকম চলে যায়।'

'কোথায়? মেয়ের কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল বিশাখা।

'স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক?'

'আছে, নামকা ওয়াস্তে। স্বামীটাই রেখেছে। টাকার জন্যে। নিয়মিত টাকা নিতে আসে সাফিয়ার কাছে। না দিলে ভয় দেখায় আদালতে নালিশ করে মেয়েকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবে। কিছুদিন আগে এসে হুমকি দিয়ে গেছে, ওর টাকার

বড় প্রয়োজন। বিশ হাজার টাকা দিতে হবে। খুবই মুষড়ে পড়েছে বেচারি সাফিয়া। এত টাকা একসঙ্গে ও কোথেকে দেবে?'

ব্ল্যাকমেলের গন্ধ পাচ্ছে কিশোর। আগ্রহী হয়ে উঠল। সাফিয়ার স্বামীর সঙ্গে কথা বললে হয়তো মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। কানিবকের মত সামনে গলা বাড়িয়ে দিল সে, 'নাম কি লোকটার? কোথায় থাকে?'

'নাম বারেক। কোথায় থাকে জানি না। তবে কক্সবাজারে থাকে না, এটুক জানি।'

ঠোকর দেয়ার পর মাছ ফসকে যাওয়া বকের মতই আবার গলাটা ফিরিয়ে আনল কিশোর। 'ও!'

আগের দিন লাশ দেখার কথা নিয়ে কোন কথা তুলল না আর বিশাখা। কিশোরও সে সম্পর্কে কিছু বলল না। যা জানতে এসেছিল, তার চেয়ে বেশিই জেনেছে। সন্তুষ্ট হয়ে, বিশাখাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে নার্স স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল।

বাড়ি ফেরার পথে প্রাইমারি স্কুলে ঢুকে দেখল রবিন আছে কিনা। আছে। ও বলল, ফিরতে তার আরও কিছুটা দেরি হবে। কাজের চাপ পড়ে গেছে। রাতেই কর্মীদের মধ্যে বিলি-বন্টন শেষ করে রাখতে হবে। খুব ভোরে যাতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে ওরা।

বাড়ি এসে দেখল, খালা ফেরেননি।

কাজের বুয়া চা-নাস্তা দিয়ে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিল সে। ভূতের গলিতে যাওয়ার কথা ভাবল। রবিন কখন ফেরে ঠিক নেই। ওর জন্যে বসে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। হয়তো আজ আর যাওয়াই হবে না, ভেবে উঠে পড়ল। কাপড় বদলে নিল। জিনসের প্যান্ট পরল। খয়েরী রঙের গেঞ্জি। যাতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকা সহজ হয়। বাড়িটার ওপর চুরি করে নজর রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা নিল। ভূতের গলির মুখের কাছে যখন পৌছল, শেষ বিকেলের লম্বা ছায়া পড়েছে।

গোরস্থানের কাছে এসে রিকশা ছেড়ে দিল।

রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রিকশাওয়ালা। বাঁক নিয়ে ওটা অদৃশ্য হয়ে যেতে কয়েক মিনিট লাগল। একেবারে নীরব হয়ে আছে এলাকাটা। রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় নেই। মনে হতে লাগল ভূতের গলির স্তব্ধ আবহাওয়া যেন গিলে নিল ওকে। মোটেও ভাল লাগল না পরিবেশটা।

পাহাড়ী অঞ্চলে বিকেল শেষ হতে না হতেই অন্ধকার নামল। গোধূলির সময় বড় কম। একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠতে লাগল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়িগুলোর জানালায়। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ফাঁকে এখানে সাধারণ আলোকেও অপার্থিব লাগছে।

দিপুদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

গেটের কাছে এসে সামনে দিয়ে না ঢুকে ঘুরে পেছন দিকে চলে এল। ঘন

ঝোপঝাড় জন্মে আছে। সেগুলোর ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে চলে এল রান্নাঘরের জানালার কাছে। আলো জ্বলছে। আস্তে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল ভেতরে।

একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে আছে দিপু। চেনাই যাচ্ছে না। চেহারাটা অন্য রকম লাগছে। অসুস্থতা কতটা বদলে দেয় মানুষের চেহারা—ভেবে অবাক লাগল ওর। দিপুর চোখ বোজা। তবে ঘুমাচ্ছে না। তার সামনে বসে থাকা একজন মহিলার কথায় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খুব আস্তে মাথা নাড়ছে মাঝেমধ্যে।

মহিলাকে আগে কখনও দেখেনি কিশোর। জানালার একটা পাল্লা ফাঁক হয়ে আছে। কিন্তু মহিলা এতই নিচু স্বরে কথা বলছে, বুঝতে পারল না সে। দিপুর পরনের পোশাক দেখে অনুমান করল, ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। একটা ছোট সুটকেস রাখা আছে দরজার কাছে। খেলনা ভালুকটা দেখতে পেল না।

মিসেস ইসলামের চেয়ে এই মহিলার বয়েস কম। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অধৈর্য। দিপুকে কোনমতে বোঝাতে না পেরেই বোধহয় রেগে যাচ্ছে সে।

কি বলছে ও? কোথায় নিয়ে যেতে চায় ছেলেটাকে?

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটা লোক। সঙ্গে মিসেস ইসলাম। টেবিলের সামনে বসে থাকা মহিলাকে কিছু জিজ্ঞেস করল লোকটা। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মহিলা।

হাত ধরে দিপুকে চেয়ার থেকে টেনে নামাল ওর মা।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল দিপু। পারল না। কেঁদে ফেলল। টানতে টানতে ওকে দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল মিসেস ইসলাম।

সুটকেস তুলে নিয়ে ওদের পেছন পেছন গেল লোকটা। ওদের পেছনে দ্বিতীয় মহিলা।

ছেলেটাকে নিয়ে বাইরে বেরোল তিনজনে। বারান্দার নিচে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

অসহায় বোধ করল কিশোর। ওর গাড়ি নেই। ওদেরকে অনুসরণ করতে পারবে না। গাড়িটার নম্বর লিখে রাখা দরকার। কাগজ কলমের জন্যে পকেটে হাত দিল। নেই। মরিয়া হয়ে হাতড়াতে শুরু করল অন্য পকেটগুলো। কোনটাতেই নেই। বাসায় ফিরে কাপড় বদলেছে। তারপর নোটবুক এবং কলম নেয়ার কথা আর মনে ছিল না।

নিলেও লাভ হত না। কি লিখত? এতই অন্ধকার, গাড়ির নম্বর প্লেট পড়তে পারছে না। বাড়ির সামনে কোন আলো জ্বালা হয়নি।

ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে দেখল, দিপুকে নিয়ে গাড়ির পেছনের সীটে উঠল দ্বিতীয় মহিলা। লোকটা উঠল ড্রাইভিং সীটে। বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস ইসলাম। ছেলের কান্নায় তার বিন্দুমাত্র মন ভেজেনি।

হেডলাইট জ্বলল গাড়িটার। দড়াম করে দরজা লাগাল লোকটা। এঞ্জিন স্টার্ট নিল। চলতে আরম্ভ করল গেটের দিকে। পেছনের সীটে নেতিয়ে পড়েছে দিপু।

বেরিয়ে গেল গাড়ি। ভারি হয়ে উঠল নীরবতা। ঘরে ঢুকে সামনের দরজা বন্ধ করে দিল মিসেস ইসলাম।

যেখানে ছিল সেখানেই রইল কিশোর। শূন্য রান্নাঘরে ফিরে আসতে দেখল মহিলাকে।

আর কিছু দেখার নেই এখানে। সরে আসতে যাবে, ঠিক এই সময় কানে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার। বাড়ির ভেতরের কোন একটা ঘর থেকে। শব্দটা যেন ফুঁড়ে দিল রাতের নীরবতাকে।

পাগলের মত চিৎকার করছে একটা বাচ্চা ছেলে। তারপর ফোঁপাতে শুরু করল। মারছে মনে হলো ওকে কেউ।

বারো

স্তব্ধ হয়ে গেছে কিশোর।

থেমে গেছে কান্নার শব্দ। আবার নীরব হয়ে গেল ভূতের গলি। বাড়ির ভেতর থেকে আর কোন শব্দ আসছে না।

দিপুকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওর চোখের সামনে। এতক্ষণে নিশ্চয় অনেক দূরে চলে গেছে গাড়িটা। চিৎকার করেছে অন্য একটা ছেলে। কে সে?

জটিল হয়ে উঠেছে আরও রহস্য। অনেক প্যাচ।

এই বাড়ির সঙ্গে হাসপাতালে নার্স খুনের সত্যি কি কোন সম্পর্ক আছে? ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে মনে আগাগোড়া খতিয়ে দেখতে লাগল সে। একই সঙ্গে রান্নাঘরের দিকেও চোখ রাখল।

ঘটনার সূত্রপাত ক্যান্সার হাসপাতালে। চার তলায়। চিলড্রেন্স ফ্লোরে। ছোট ছেলের কান্না শুনে দেখতে গিয়েছিল সে। ছেলেটার আচরণ অস্বাভাবিক লেগেছে। নার্স সাফিয়ার আচরণ অস্বাভাবিক ছিল। দিপুর মায়ের আচরণ অস্বাভাবিক। অরুণের আচরণ অস্বাভাবিক। এদেরকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে রহস্য।

ভাবতে গিয়ে তার মনে হলো, হাসপাতালের কারও সাহায্য পেলে ভাল হত। কার? যার মোটামুটি ক্ষমতা আছে। প্রথমেই মনে এল হারুণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল তাকে। যে লোক লাশ গায়েব হয়ে যাওয়ার মত সিরিয়াস ব্যাপারকে গুরুত্ব না দিয়ে রসিকতা বলে উড়িয়ে দেয়, তাকে কিছু বিশ্বাস করানো সহজ হবে না। আর করাতে পারলেও তাকে দিয়ে কোন কাজ যে হবে, সে নিশ্চয়তা নেই।

তাহলে কাকে ধরবে?

ডা. হেমায়েত হোসেন? হ্যাঁ, হতে পারে। যেহেতু শিফট-ইন-চার্জ, ডাক্তার আর নার্সদের ব্যাপারে খবরা-খবর তাঁর ভালই থাকার কথা। সাফিয়া অনুপস্থিত থাকার কথা তাঁকে জানালে খোঁজ নিতে পারবেন।

ইস্, আম্মা খালাটা এখন থাকলেও হত! এখানকার অনেক মানুষের সঙ্গেই তার খাতির, ভাল যোগাযোগ। ডাক্তার হেমায়েত হোসেনের সঙ্গে সরাসরি যদি নাও থাকে, অন্য কারও মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে কথা বলার একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে

দিতে পারত।

কিন্তু খালাটা সেই যে গেল তো গেলই। মনে হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের কোন দ্বীপ আর রাখবে না। সব চষেটষে তবেই ফিরবে।

আধঘন্টা কেটে গেল। নতুন কিছু ঘটল না। মিসেস ইসলাম রান্নাঘর থেকে চলে গেছে। আর বসে থেকে লাভ নেই। ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাড়ির পাশ ঘুরে রাস্তায় এসে নামল কিশোর। আনমনা হয়ে হেঁটে চলল অন্ধকার রাস্তা ধরে।

আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলো মেঘে ঢাকা। অন্ধকার খুব বেশি। কবরস্থানটার কাছে এসে অকারণেই গা ছমছম করতে লাগল। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই তার। ওসবের ভয় করে না। কিন্তু তবু অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতেই থাকল। মনে হলো, কেউ তার ওপর নজর রাখছে। পিছু নিয়েছে।

ফিরে তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না।

গোরস্থানটার দিকে তাকাল। এতই অন্ধকার, পাহাড়ের ঢালটাকে কালো একটা দেয়াল ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না।

ছিনতাইকারী না তো? ইদানীং ওদের অত্যাচার বড় বেড়েছে। সৈকত ও নির্জন এলাকাগুলোতে একা হাঁটা নিরাপদ নয়। কোথা থেকে যে ছায়ার মত এসে উদয় হবে, ঘিরে ধরবে, পেটে ছুরি ঠেকিয়ে পকেটগুলো সব খালি করে নিয়ে চলে যাবে, ঠিকঠিকানা নেই। বাধা দিলেই বিপদ। দেবে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে।

পকেটে টাকাপয়সা অবশ্য তেমন নেই। সঙ্গে দামী জিনিস বলতে কেবল হাতঘড়িটা আছে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। একটা রিকশা পেলে হত।

হঠাৎ পেছনে মোটর সাইকেলের এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো।

ফিরে তাকাল সে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাইকেলটা। হেডলাইট জ্বলল। লাফ দিয়ে রাস্তায় উঠে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে শুরু করল।

ও, ঠিকই জানান দিয়েছে তাহলে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ছিনতাইকারীই। ওরা মোটর সাইকেলে করেই বেশি আসে।

তৈরি হয়ে গেল কিশোর। একজন হলে কেয়ারও করে না। দুজন হলেই বা কি? সঙ্গে যদি ওদের ছুরি কিংবা পিস্তল না থাকে, পিটিয়ে হাড্ডি ভাঙবে আজ ব্যাটাদের। ভালমত কারাত আর জুজুৎসুর প্র্যাকটিস করে নেবে ওদের ওপর।

তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে মোটর সাইকেল। আলো পড়ল কিশোরের মুখে। অন্ধ করে দিল চোখ। গায়ের ওপর এসে পড়বে নাকি? ভাল কায়দা তো! ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে অসহায় করে তারপর হাতিয়ে নেবে যা নেবার।

লাফিয়ে সরে গেল সে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, মোটর সাইকেলের আলো ছাড়া।

ঘ্যাচ করে পাশে এসে ব্রেক করল মোটর সাইকেল। আরোহী মাত্র একজন। হাতে ছুরি বা পিস্তল দেখা গেল না। হেলমেটে ঢাকা থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না।

'কিশোর, তুমি এত রাতে এখানে?' বলে উঠল পরিচিত কণ্ঠ।

অবাক হয়ে গেল কিশোর। অরুণ।

ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল সে। কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না।

মিনমিন করে শেষে বলল, 'হ্যাঁ, হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। এদিকটা অপরিচিত ছিল। ভাবলাম, যাই, দেখে আসিগে।'

'কিন্তু রাত দুপুরে কি দেখবে? রাস্তায় আলোও তো নেই যে কিছু দেখা যাবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আসার সময় অবশ্য এটা ভাবিনি। তুমি কেন এসেছিলে?'

'কাজ ছিল।'

'কি কাজ?'

'জরুরী কিছু না। এখন বাড়ি যাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওঠো।'

'কেন?'

'বাড়ি পৌঁছে দেব।'

কোন দুরভিসন্ধি নেই তো অরুণের? এত রাতে ও এদিকে কেন এসেছিল, প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গেল। দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। 'থাক না। আমি নাহয় রিকশায় করেই চলে যাব।'

'আরে ওঠো তো! রিকশা পেতে হলে অনেকখানি হাঁটতে হবে। কি করবে এই অন্ধকারে হেঁটে? দেখতে চাইলে দিনের বেলা বেরিয়ো। ছুটির দিনে আমার সঙ্গেও ঘুরতে পারো। কক্সবাজার দেখিয়ে দেব।'

আর কিছু বলল না কিশোর। উঠে বসল অরুণের পেছনে।

তেরো

ঘরে যখন ফিরল, পিটির পিটির করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ঢুকেই দেখে আয়না খালা। কয়েক মিনিট আগে ফিরেছেন। ব্যাগ সুটকেসগুলো মেঝেতে রাখা। সরানো হয়নি তখনও। মুসা গেছে বাথরুমে। রবিন ডিউটি থেকে ফেরেনি।

দেখেই বলে উঠলেন খালা, 'চেহারাটা অমন ভূতের মত করে রেখেছিস কেন? কোথায় গিয়েছিলি?'

হেসে ফেলল কিশোর। 'কোনটার জবাব দেব? প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতেই অনেক কথা বলা লাগবে।'

'বলা লাগলে বল। কি ঘটিয়েছিস? দুর্গতদের মধ্যে নিশ্চয় রহস্য নেই।'

'রহস্য নেই, পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা আছে নাকি?'

'তার মানে তদন্ত করতে গিয়েছিলি?'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মুসা। মুখচোখ শুকনো। পেটে হাত। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তদন্ত? পেয়ে গেছ নাকি একখান কেস?'

'তোমার কি হয়েছে? পেটে হাত দিয়ে রেখেছ কেন?'

'বোধহয় আমাশায় ধরেছে। চিনচিন ব্যথা।'

'তারমানে সহ্য করতে পারেনি দ্বীপের পানি। বোঝো তাহলে, ওসব খেয়েই কি করে বেঁচে আছে ওখানকার মানুষগুলো। বড় বেশি সহ্য ক্ষমতা।' খালার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'এত দেরি করলে কেন? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?'

'বঙ্গোপসাগরের কোন দ্বীপ আর বাকি রাখেননি খালা,' একটা চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। 'উফ্, ঘোরাতে ঘোরাতে মেরে ফেলেছেন। আর যা পচা গরম। বাপরে বাপ! দ্বীপ না, নরক!'

হাসলেন খালা, 'জনসেবা অত সহজ না।'

'অন্তত বাংলাদেশে,' কিশোর বলল। 'আমিও সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।'

'কেন, হাসপাতালে কাজ করতে ভাল্লাগছে না?'

'লাগবে কি? চাকরের কাজ করায়।'

'তাই নাকি?' গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন খালা, 'তাওয়ালির মা? চা দিতে কতক্ষণ লাগবে?'

'হইয়ে গেসে, আম্মা।'

মিনিটখানেক পরই চা-নাস্তার ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল বুয়া। টেবিলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

খাবারের দিকে নির্বিকার চোখে তাকিয়ে রইল মুসা। হাত বাড়াল না।

খালা শুধু চা নিলেন। নাস্তা খেলে আর রাতে ভাত খেতে পারবেন না। মুসাকে বললেন, 'একটা কিছু অন্তত মুখে দাও।'

'আমার পেট ব্যথা করছে,' বলে এক গেলাস পানি ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল মুসা।

'বেশি খারাপ নাকি? ট্যাবলেট লাগবে?'

'রাতটা দেখি। সকালে না সারলে তখন খেয়ে ফেলব।'

কিশোরের দিকে তাকালেন খালা, 'তুই এখন কোত্থেকে এলি?'

'ভূতের গলি থেকে।'

আঁতকে উঠল মুসা। 'খাইছে! ভূত?'

খালাও অবাক। 'এখানে ভূতের গলি পেলি কোথায়?'

'আমি না, হিরণ মিয়া পেয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল খালার। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বোনপোর মুখের দিকে। 'তুই কি সব সময়ই এমন করে কথা বলিস নাকি?'

জোরে হাসতে গিয়ে পেটে টান পড়ায় আঁউ করে উঠল মুসা। 'আপনি ওর দেখেছেন কি, খালা। নাটকীয়তা, হেঁয়ালি করে বলা, এসব বদভ্যাস ওর এত বেশি, বিরক্ত করে ফেলে। নিজে খুব মজা পায়। আমাদের এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'হিরণ মিয়াটা কে?'

'রিকশাওয়ালা।' কোন রাস্তাটার নাম ভূতের গলি রেখেছে হিরণ মিয়া, বুঝিয়ে বলল কিশোর।

'ওখানে গিয়েছিলি কেন?' খালার প্রশ্ন।

খারাপ থাকে বঙ্গোপসাগরের। এই ভাল তো এই খারাপ। যখন তখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। বুক কাঁপে দ্বীপবাসী আর সাগরপাড়ের মানুষের।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ওর। থেকে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। শরীরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে।

আয়না খালা ডাক দিলেন দরজায় থেকে, 'অ্যাই, কিশোর, ওঠ। অনেক বেলা হলো।'

গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে উঠে বসল কিশোর। নামল বিছানা থেকে। আজ আর হাসপাতালে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। এক্স-রে রুমে কাজ করে ভলান্টিয়ারির সাধ মিটেছে। ভাবছে খালার সঙ্গে ত্রাণ বিতরণ করতেই চলে যাবে। যেতও তাই। কিন্তু রহস্যটার কিনারা করতে হলে এখন কক্সবাজার থেকে নড়া উচিত হবে না ওর। হাসপাতালের কাজ ছাড়াটা তো আরও অনুচিত।

বাথরুম সেরে রান্নাঘরে ঢুকল সে। ওখানে টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়েছে। রবিন ওর আগেই উঠেছে। মুসা বিছানায়। ওর অসুখ বেড়েছে।

রুটিতে মাখন মাখাচ্ছেন আয়না খালা। কিশোরকে দেখে মুখ তুললেন, 'আয়, বোস। মুখ অমন ফোলা কেন? ঘুম হয়নি?'

'হবে কি?' হেসে বলল রবিন, 'যতক্ষণ ওই রহস্যের কিনারা না হবে, ওর আর স্বস্তি নেই।'

খালা বললেন, 'তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারিস, কিনারা করে ফেল। মাথায় রহস্যের জট নিয়ে দুর্গত মানুষের সেবা করতে পারবি না। আমি ফোন করে বলে দিয়েছি ডাক্তার শিকদারকে। তোকে যেতে বলেছেন।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর, 'কখন?'

'নাস্তা খেয়েই চলে যা। তোর সঙ্গে দেখা করে তারপর হাসপাতালে যাবেন।'

নাকেমুখে খাবার গুঁজতে আরম্ভ করল কিশোর।

'আরে আস্তে খা। গলায় আটকাবে তো।'

রবিন জানতে চাইল, 'আমি আসব তোমার সঙ্গে?'

খালা মানা করলেন, 'নাহ্, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি শুধু কিশোরের কথা বলেছি।'

খালাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তুমি ডাক্তার সাহেবকে সব বলেছ নাকি?'

'না। আমি শুধু বলেছি, আমার বোনপো কিশোর পাশা হাসপাতালে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারি করতে গিয়ে কি নাকি গণ্ডগোল হতে দেখেছে। আপনাকে জানানো দরকার মনে করছে। আপনি একটু দয়া করে তার কথা শুনবেন।'

'তিনি কি বললেন?'

'শুনবেন। আবার কি।'

খাওয়ার পর দেরি করল না কিশোর। রওনা হয়ে গেল। ঠিকানা জেনে নিয়েছে খালার কাছে। রিকশায় যেতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।

বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করছেন ডাক্তার শিকদার। কিশোরকে রিকশা

'পরিচয় আছে?'

মুচকি হাসলেন খালা। 'একটা কথা তুই জানিস না। ওই হাসপাতালের জায়গা সবটা কিনে নেয়নি কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে দান-খয়রাতের ব্যাপারও আছে। ওখানে তোর খালুর জায়গা ছিল অনেকখানি। কিনে নিতে চেয়েছিল ওরা, কিন্তু টাকা নিতে রাজি হননি তিনি। দান করে দিয়েছেন। সেই কারণে হাসপাতালের বোর্ড অভ ট্রাস্টির একজন সদস্য করে নেয়া হয়েছে আমাকে। কাল সন্ধ্যায় একটা মীটিং আছে ওখানে। আমাকেও যেতে হবে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। 'তাহলে তো আর কথাই নেই। তুমি তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগটা করিয়ে দাও। তাঁকে সব খুলে বলব। তিনি যদি মনে করেন, পুলিশকে খবর দেয়া দরকার, তাহলে দেবেন।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন খালা। 'তা অবশ্য মন্দ বলিসনি। হাসপাতালের ঘটনা। পুলিশকে জানালে ওখানকার লোকেই জানাক। রাত হয়ে গেছে। আজ আর ডাক্তারকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। কাল সকালে ফোন করব। তোর আর যাওয়ার কি দরকার? আমিই তাঁকে বলে দেব সব।'

'না, তোমার বলাটা ঠিক হবে না,' কেসের তদন্ত এখনও অনেক বাকি। সে মজা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না কিশোর। 'খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে পারবে না। বলতে হবে আমাকেই।'

কিশোরের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন খালা। 'তা বটে। ঠিক আছে, তুইই বলিস।'

'কাল আর ত্রাণ বিতরণে বেরোচ্ছ না?'

'এখনও জানি না। সকালে সমিতির স্টোর কিপারের সঙ্গে কথা বললে জানা যাবে চাঁদা আর জিনিসপত্র কতটা জমেছে। খালি হাতে বেরোনোর কোন মানে হয় না। সব না খেয়ে আছে ভুখা মানুষের দল। ইস্, কি যে কষ্ট ওদের না দেখলে বুঝবি না। পেটে খাবার নেই। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে মাথায় কলাপাতা দিয়ে বসে থাকে। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়। ছোট ছোট দুধের বাচ্চাগুলো ভিজে চুপচুপে হয়ে কুঁকড়ে গিয়ে লেপ্টে থাকে মায়ের বুকের সঙ্গে। কঙ্কালসার দেহ। পড়ে পড়ে কাতরায় জখমী মানুষ। এ দৃশ্য কি সওয়া যায়!'

'থাক, আর বোলো না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'ভাল্লাগে না শুনতে।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে খোলা জানালা দিয়ে ঝোড়ো বাতাস এসে ঝাপটা দিয়ে ঘুম ভাঙাল কিশোরের। প্রথমে একটা চোখ মেলল, তারপর আরেকটা। তাকাল বাইরের দিকে। মুখ গোমড়া করে রেখেছে মেঘলা আকাশ। দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। এই আবহাওয়া মোটেও ভাল লাগে না। কেমন বিষণ্ণ ধূসর আলো। এরচেয়ে বৃষ্টি হওয়া অনেক ভাল।

সাগরের গর্জন কানে আসছে। ফুঁসছে সাগর। বছরের এ সময়টায় মেজাজ খুব

খারাপ থাকে বঙ্গোপসাগরের। এই ভাল তো এই খারাপ। যখন তখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। বুক কাঁপে দ্বীপবাসী আর সাগরপাড়ের মানুষের।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ওর। থেকে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। শরীরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে।

আয়না খালা ডাক দিলেন দরজায় থেকে, 'অ্যাই, কিশোর, ওঠ। অনেক বেলা হলো।'

গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে উঠে বসল কিশোর। নামল বিছানা থেকে। আজ আর হাসপাতালে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। এগ্র-রে ক্রমে কাজ করে ভলান্টিয়ারির সাধ মিটেছে। ভাবছে খালার সঙ্গে ত্রাণ বিতরণ করতেই চলে যাবে। যেতও তাই। কিন্তু রহস্যটার কিনারা করতে হলে এখন কক্সবাজার থেকে নড়া উচিত হবে না ওর। হাসপাতালের কাজ ছাড়াটা তো আরও অনুচিত।

বাথরুম সেরে রান্নাঘরে ঢুকল সে। ওখানে টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়েছে। রবিন ওর আগেই উঠেছে। মুসা বিছানায়। ওর অসুখ বেড়েছে।

রুটিতে মাখন মাখাচ্ছেন আয়না খালা। কিশোরকে দেখে মুখ তুললেন, 'আয়, বোস। মুখ অমন ফোলা কেন? ঘুম হয়নি?'

'হবে কি?' হেসে বলল রবিন, 'যতক্ষণ ওই রহস্যের কিনারা না হবে, ওর আর স্বস্তি নেই।'

খালা বললেন, 'তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারিস, কিনারা করে ফেল। মাথায় রহস্যের জট নিয়ে দুর্গত মানুষের সেবা করতে পারবি না। আমি ফোন করে বলে দিয়েছি ডাক্তার শিকদারকে। তোকে যেতে বলেছেন।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর, 'কখন?'

'নাস্তা খেয়েই চলে যা। তোর সঙ্গে দেখা করে তারপর হাসপাতালে যাবেন।'

নাকেমুখে খাবার গুঁজতে আরম্ভ করল কিশোর।

'আরে আস্তে খা। গলায় আটকাবে তো।'

রবিন জানতে চাইল, 'আমি আসব তোমার সঙ্গে?'

খালা মানা করলেন, 'নাহ্, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি শুধু কিশোরের কথা বলেছি।'

খালাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তুমি ডাক্তার সাহেবকে সব বলেছ নাকি?'

'না। আমি শুধু বলেছি, আমার বোনপো কিশোর পাশা হাসপাতালে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারি করতে গিয়ে কি নাকি গণ্ডগোল হতে দেখেছে। আপনাকে জানানো দরকার মনে করছে। আপনি একটু ভালমত তার কথা শুনবেন।'

'তিনি কি বললেন?'

'শুনবেন। আবার কি।'

খাওয়ার পর দেরি করল না কিশোর। রওনা হয়ে গেল। ঠিকানা জেনে নিয়েছে খালার কাছে। রিকশায় যেতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।

বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করছেন ডাক্তার শিকদার। কিশোরকে রিকশা

থেকে নেমে গেট খুলতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কাছে যেতে বললেন, 'তুমিই কিশোর পাশা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এখানেই কথা বলতে চাও? না বসবে?'

'বসলেই ভাল হয়। অনেক কথা।'

ফুলগাছে পানি দেয়ার ঝাঁঝরিটা নামিয়ে রেখে ডাক্তার বললেন, 'এসো।'

চমৎকার সাজানো-গোছানো হলঘরে এনে কিশোরকে বসালেন ডাক্তার। বিয়ে-থা করেননি। চাকর-দারোয়ান-ড্রাইভার নিয়ে থাকেন। চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। কিশোর বলল, খাবে না। এইমাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে। ডাক্তার তখন বললেন, 'ঠিক আছে, বলো তাহলে, কি গোলমাল হতে দেখেছ হাসপাতালে?'

ভূমিকার মধ্যে গেল না কিশোর। সরাসরি বলল, 'সাফিয়া নামে একজন নার্স খুন হয়েছে। সেকেণ্ড উইঙে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। ফিরে এসে নার্স বিশাখাকে বললাম। সে ডাক্তার হারুণ আর দুজন সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে আনাল। সবাই মিলে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি লাশটা নেই। কেউ ততক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে। আমার কথা আর বিশ্বাস করছে না এখন।'

পিঠ সোজা করে ফেলেছেন ডাক্তার শিকদার। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন কিশোরের মুখের দিকে। 'খুনীকে দেখেছ?'

'না। শুধু লাশটা দেখেছি। সেকেণ্ড উইঙের মেঝেতে পড়ে ছিল। গলায় একটা সার্জিক্যাল নাইফ গাঁথা। মরা, কোন সন্দেহ ছিল না আমার। তাই দৌড়ে গিয়ে নার্স বিশাখাকে খবর দিয়েছিলাম।'

রেগে গেলেন ডাক্তার শিকদার, 'এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, আর আমাকে কেউ কিছু বলল না!'

'লাশটা পরে আর পাওয়া যায়নি বলে হয়তো বলেনি। ডাক্তার হারুণ বললেন, তাঁর এক কলিগ ডাক্তার হান্নান নাকি রসিকতা করে মর্গের বেওয়ারিশ লাশ ফেলে গিয়েছিলেন। আমি দেখে আসার পর আবার তুলে নিয়ে গেছেন। সেজন্যে পরে গিয়ে আর পাওয়া যায়নি।'

গম্ভীর হয়ে বললেন ডাক্তার শিকদার। 'কি নাম বললে নার্সের?'

'সাফিয়া খাতুন। চিলড্রেন্‌স ফ্লোরে ডিউটি দিত।'

'চিনেছি। তুমি বলছ সে খুন হয়েছে?'

'তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। সেদিন সন্ধ্যার পর আর তাকে হাসপাতালে দেখিনি। নার্স বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলাম, সাফিয়া হাসপাতালে আসে না কেন? বলতে পারল না। ও কিছু জানে না। সাফিয়ার সঙ্গে এরপরে আর দেখাও হয়নি তার।'

'এতবড় একটা ঘটনা…কেউ জানাল না আমাকে…' আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে ফোনের দিকে সরে বসলেন তিনি। 'দাঁড়াও দেখছি।' পাশের টিপয়ে রাখা রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন। 'হালো, মিসেস রাহেলা?…আমি

ডাক্তার হেমায়েত। শুনুন, নার্স সাফিয়ার একটা খোঁজ নিন তো। হাসপাতালে নাকি আসছে না। কোথায় গেছে ও দেখুন।...আছি, আমি লাইনেই আছি।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রিসিভারের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে ডাক্তার শিকদার বললেন, 'নার্স সুপারভাইজার।'

কিশোর বলল, 'চিনি। আমাকে চিলড্রেন্স ফ্লোর থেকে তিনিই এক্স-রে রুমে বদলি করেছেন।'

কথাটা যেন শুনতে পেলেন না ডাক্তার। অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। চোখ বুজে হেলান দিলেন সোফায়। মিনিটখানেক পর সজাগ হয়ে উঠলেন আবার, চোখ মেলে বললেন, 'হালো।...হ্যাঁ, আছি। বলুন।' আধ মিনিট চুপচাপ ওপাশের কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'ভালমত দেখেছেন? দরখাস্ত আছে? ও, তাহলে তো মিটেই গেল। ঠিক আছে। রাখলাম। থ্যাংক ইউ।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে তাকালেন ডাক্তার শিকদার। 'নার্স সাফিয়া ছুটিতে গেছে। রেজিস্টারে এনট্রি আছে। তার দরখাস্তও আছে। তুমি কবে যেন তার লাশ দেখেছ বললে?'

'পরশুদিন সন্ধ্যায়।'

'হ্যাঁ, পরশুদিনই ছুটির দরখাস্ত করেছে ও। কাল থেকে অনুপস্থিত।' দ্বিধা করতে লাগলেন ডাক্তার শিকদার। কিশোরকে বলতে যেন বাধছে এরকম ভঙ্গিতে বললেন, 'আমারও ধারণা তোমার দেখায় ভুল হয়েছে। নার্স সাফিয়ার লাশ তুমি দেখোনি। হারুণের কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে আমার। হান্নান ওর সঙ্গে রসিকতা করেছে। ওরকম সে মাঝে মাঝে করে। ওর আরও একজন কলিগের সঙ্গে করেছে। এমনকি নাইটগার্ডকেও রেহাই দেয়নি। রাত দুপুরে একদিন লাশকাটা ঘরে শব্দ শুনে দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েছিল গার্ড। দেখে সাদা পোশাক পরা লম্বা একটা ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা কাটা লাশের চারপাশে। দারোয়ান তো ভয়ে অজ্ঞান। সেবাযত্ন করে হান্নানই তখন তার হুঁশ ফিরিয়েছে। হাহ্ হাহ্! নিশ্চয় বুঝতে পারছ ভূতটা কে ছিল?'

উসখুস করতে লাগল কিশোর। ডাক্তার শিকদারকেও বিশ্বাস করাতে পারল না। এখন কি করবে? কি করে খুঁজে বের করবে সাফিয়ার লাশ?

'কি ভাবছ?' জানতে চাইলেন ডাক্তার শিকদার।

'আরও একটা ঘটনা ঘটেছে, স্যার। একটা বাচ্চা ছেলে এসেছিল চিকিৎসা নিতে। চিলড্রেন্স ফ্লোরে সতেরো নম্বর কেবিনে ছিল। এখন চলে গেছে। ওর মা ওর সঙ্গে ঠিক মায়ের আচরণ করে না। ওদের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে দেখে এসেছি আমি। অন্য আরেকজন মহিলা আর একটা লোককে দেখেছি জোর করে ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে। আমার বিশ্বাস, এর সঙ্গে সাফিয়ার কোন সম্পর্ক আছে।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল ডাক্তারের। 'কি সম্পর্ক?'

'বুঝতে পারছি না। খোঁজ করলেই বেরিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলেও

এক কথা ছিল। কিন্তু বাড়িতে কোন মা তার ছেলেকে কার হাতে তুলে দিল, সেটা আমার জানার বিষয় নয়। তবু, যাই হোক, ছেলেটার নাম কি? কি অসুখ হয়েছিল?'

'তরিকুল ইসলাম দিপু। নিউমোনিয়া হয়েছিল। ভূতের গলি...ইয়ে, ওই যে পাহাড়ের গায়ে পুরানো কবরস্থানটা আছে না খ্রীষ্টানদের, তার নিচে রাস্তার ধারে বাসা। বয়েস পাঁচ বছর কয়েক মাস। বিপদের মধ্যে আছে ছেলেটা। হাসপাতালে থাকতে সারাক্ষণ কেঁদেছে। বাড়িতেও একই অবস্থা। আমার মনে হয়, মহিলা খুব মারে ওকে।'

'কান্নাটাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। বাচ্চারা কাঁদেই। রোগ হলে তো আরও বেশি। তবে ওর ব্যাপারে...কি নাম যেন বললে?'

'দিপু।'

'হ্যাঁ, দিপু। ওর ব্যাপারে খোঁজ একটা নেয়া যাবে। আমাদের হাসপাতালে রিলিজ করে দেয়ার পরেও রোগীকে একবার অন্তত চেকআপ করাতে নিয়ে আসার নিয়ম। কোন্‌দিন আনতে হবে রিলিজ কার্ডে ডেট দিয়ে দেয়া হয়। সেটা রেজিস্টারেও লেখা থাকে। নার্স সুপারভাইজারকে আমি বলে দেব, ছেলেটাকে চেকআপ করাতে আনলে যেন আমাকে খবর দেয়া হয়। কোন্‌দিন আনবে ওকে রেকর্ড দেখলেই জানা যাবে...'

'রেকর্ড পাওয়া যাবে না,' বলে ফেলল কিশোর। 'রেকর্ড রুমে আমি নিজে খুঁজে দেখেছি। ফাইলটা নেই।'

'সব কিছুকেই কি গায়েবীতে ধরল নাকি? লাশ, মানুষ, ফাইল...' ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ডাক্তার শিকদার। ধীরে ধীরে সহানুভূতির হাসি ফুটল মুখে। 'কিছু মনে কোরো না, কিশোর, তোমাকে একটা কথা বলি। ওই ভলান্টিয়ারির কাজ তুমি ছেড়ে দাও। এসব আজেবাজে খাটুনির কাজ তোমার জন্যে নয়। ভীষণ মানসিক চাপ পড়েছে তোমার ওপর। অভ্যাস নেই তো, স্নায়ুগুলো সইতে পারছে না। তুমি বরং বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নাও।'

'আপনি কি আমাকে হাসপাতালে যেতে নিষেধ করছেন?'

'যেতে যদি ইচ্ছে করে অবশ্যই যাবে। তবে অন্যের সেবা করতে গিয়ে তোমার নিজের ক্ষতি করার পক্ষে মত দিতে পারব না আমি।'

'হাসপাতালে কাজ করতে খারাপ লাগছে না আমার। তবে ওই এক্স-রে রুমটা থেকে মুক্তি চাই। ও জায়গাটা আমার পছন্দ নয়। তারচেয়ে যদি আবার চিলড্রেন্‌স ফ্লোরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারতেন, ভাল হত। নার্স সুপারভাইজারকে কি আপনি একটু বলে দেবেন?'

ঠোঁট কামড়ালেন ডাক্তার শিকদার। 'ঠিক আছে, বলব। কিন্তু আজ তো হবে না, বিষ্যুৎবার, ঝামেলা। ওর সঙ্গে দেখাই হবে না আমার। কাল শুক্রবার, হাসপাতালের অফিস ছুটি। তবে পরশু থেকে চিলড্রেন্‌স ফ্লোরে ডিউটি করতে পারবে। কথা দিলাম, যাও।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার, আপনাকে।'

হাসলেন ডাক্তার। 'আমাকে সব কথা জানিয়ে ভাল করেছ। ওই ছেলেটার

ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা আমি জরুরী ভিত্তিতে করব। ওর ফাইলটা রেক
রুম থেকে কোথায় গেল, তাও দেখব। আজ তো আর হাসপাতালে যাচ্ছ ন
নাকি?'

'না, যাব।'

'এক্স-রে রুমে নাকি কাজ করতে ভাল লাগে না?'

'তাও করব,' হাসল কিশোর। 'একটা দিনই তো মাত্র। কাটিয়ে দিত
পারব। শনিবার থেকেই তো মুক্তি।'

'তোমাকে অসুস্থ বলায় রাগ হয়েছে, না? জেদ করে যেতে চাইছ?'

'না না, কি যে বলেন, স্যার। রাগ করব কেন? স্নায়ুর ওপর চাপ তো সত্যি
পড়ছে। আমি ভেবেছি আহত, অসুস্থ মানুষের সেবা করব। আমাকে দিয়ে করানো
হয় পিয়ন আর বয়ের কাজ। এটা কেন ভাল লাগবে আমার, বলুন?'

'লাগার কোন কারণ নেই। তুমি তো তাও লেগে আছ, আমি হলে কা
দু'এক ব্যাটাকে চড়-থাপ্পড় মেরে চলে যেতাম। আসলে ওরা মানুষের কদর করতে
জানে না। ওদের মত অমানুষের জন্যেই দেশটার আজ এই অধঃপতন। দুরবস্থা।'
উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। এগিয়ে এসে হাত রাখলেন কিশোরের কাঁধে
'হাসপাতালে যে কোন সমস্যা হোক, চলে আসবে আমার কাছে। একটুও দ্বিধা
নয়। আমার দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা।'

'সে তো বুঝতেই পারছি, স্যার। আয়না খালারও আপনার সম্পর্কে খুব উঁচু
ধারণা।'

'ওসব বাড়িয়ে বলা। উনি একটু বেশি পছন্দ করেন আমাকে।' ঘড়ি দেখলে
ডাক্তার শিকদার।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। থ্যাঙ্ক
ইউ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

পনেরো

ডাক্তার শিকদারের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে, বাড়ি ফিরে দুই সহকারী গোয়েন্দা
আর আয়না খালাকে সব জানাল কিশোর। ইউনিফর্ম পরে হাসপাতালে যাওয়ার
জন্যে তৈরি হলো সে আর রবিন। মুসার অবস্থা কাহিল। আমাশয় খুব বেড়েছে
মোবারক আলিকে পাঠিয়ে দোকান থেকে অ্যামোডিস ট্যাবলেট আনিয়ে দিয়েছে
খালা।

মুসার যা অবস্থা, তাতে ওকে বুয়া আর মোবারক আলির জিম্মায় রে
বেরোনোটা উচিত মনে করলেন না তিনি। বেশি ঘোরাঘুরি করে তাঁর শরীরটা
তেমন ভাল নেই। জ্বরটর উঠে গেলে শেষে মুশকিলে পড়ে যাবেন। সমিতি
অফিসে ত্রাণ যা জমা পড়েছিল, সব প্রায় শেষ। আবার জমা পড়ার অপেক্ষা
করতেই হবে। শুধু শুধু খালি হাতে দুর্গত অঞ্চলে ঘোরার কোন মানে হয় না

তাছাড়া বিকেলে হাসপাতালের মীটিং তো আছেই। তেমন জরুরী কোন কাজ না পড়লে ওটাতে অনুপস্থিত থাকতে চান না। অতএব সেদিনটা বাড়িতে কাটানোই মনস্থ করলেন।

রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। হাসপাতালে যাবার পথে অন্য দিনের মতই স্কুলের সামনে রিকশা থেকে ওকে নামিয়ে দিল।

সেদিনটাও একঘেয়ে সময় কাটল এক্স-রে রুমে। কোন পরিবর্তন নেই। বিকেলে শিফটিঙের সময় হলে বেরিয়ে পড়ল। রবিনের স্কুলে গেল ওকে নেয়ার জন্যে। সেদিনও কাজের চাপ বেশি ওর। কিশোরকে বলল, বেরোতে পারবে না। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

কি আর করে। বাড়ি ফিরে কাপড় বদলে চা খেয়ে নিল কিশোর। ট্যাবলেট খেয়েও মুসার পেটের উন্নতি হয়নি। ভালমত ধরেছে। মনে হচ্ছে শুধু অ্যামোডিসে কাজ হবে না, কড়া অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। বিছানায় নেতিয়ে পড়ে আছে ও। অতিমাত্রায় কাহিল। বেরোনোর প্রশ্নই ওঠে না।

আয়না খালা সমিতির অফিসে গেছেন। ওখান থেকে যাবেন হাসপাতালে।

বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগল না। একা একাই সৈকতে বেড়াতে চলল কিশোর।

দোকানপাটগুলোর কাছটায় ভিড় বেশি। ওখানে ভাল লাগল না। সৈকতের বালি মাড়িয়ে হেঁটে চলল পর্যটনের মোটেলটার দিকে। ঝাউগাছের পাশ দিয়ে এগোল ধীরে ধীরে।

একটা বালির ঢিবির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ধড়াস্ করে লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল, পর্যটনের রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ানো একটা গাড়ির দরজার তালা খুলছে মিসেস ইসলাম। ওর পাশে দাঁড়ানো দিপু। কিশোরের দেয়া ভালুকটা একহাতে পেঁচিয়ে চেপে ধরে রেখেছে বুকের সঙ্গে। আগের চেয়ে অনেক সুস্থ লাগছে ওকে।

ঘটনাটা কি? এই ভাল, এই খারাপ। ক্ষণে ক্ষণে চেহারার পরিবর্তন হয় নাকি ওর!

দৌড় দিল কিশোর। ডাকল, 'দিপু!'

ফিরে তাকাল ছেলেটা। চিনতে পারল কিশোরকে। হাসল।

মিসেস ইসলামও ফিরে তাকাল। কিশোরকে দেখে কঠোর হয়ে গেল চেহারা। দিপুর হাত ধরে একটানে ওকে গাড়ির ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে ঘুরে চলে গেল ড্রাইভিং সীটের দরজার কাছে। উঠে বসল তাড়াহুড়ো করে। স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। আর এগিয়ে লাভ নেই। দিপুর সঙ্গে কথা বলতে দেবে না ওকে মিসেস ইসলাম। দাঁড়াবেই না।

চলতে আরম্ভ করল গাড়িটা।

তাকিয়ে আছে কিশোর। রাতে কি সেদিন মিসেস ইসলামের বাড়িতে এই গাড়িটাই দেখেছিল? ঠিক চিনতে পারল না। অন্ধকারে দেখেছিল। তবে মনে হলো

এটা সেই গাড়িটাই।
আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দকে ছাপিয়ে ভারি গুড়গুড় শোনা গেল দূরে। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। আকাশের অবস্থা ভাল না। ঘন কালো মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। দিগন্তে কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। ঝড় আসছে। তাড়াতাড়ি দোকানগুলোর দিকে রওনা হলো সে। ওখানে গেলে রিকশা পাওয়া যাবে।
নির্জন হয়ে এসেছে এলাকাটা। আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে বেশির ভাগ মানুষই চলে গেছে। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে রিকশা পেতে অসুবিধে হলো না।
বাড়ি ফিরে দেখে অন্ধকার। বিদ্যুৎ চলে গেছে। বারান্দায় বসে আছে মোবারক আলি। একটা মোম জ্বেলে ধরিয়ে দিল কিশোরের হাতে। ওর কাছে জানতে পারল রবিন ফেরেনি তখনও।
মুসার ঘরে মোম জ্বলছে। বিছানায় তেমনি নেতিয়ে আছে সে। কিশোরের সাড়া পেয়ে চোখ মেলল। জানতে চাইল কি খবর।
দিপুকে ওর মায়ের সঙ্গে দেখার খবর বলল ওকে কিশোর।
ঝিলিক দিয়ে উঠল বিদ্যুতের নীল আলো। ক্ষণিকের জন্যে আলোকিত করে দিয়ে গেল ঘরটা।
কয়েক মিনিট পর বাতি জ্বলল। ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে।
বেশিক্ষণ কথা বলতে পারল না মুসা। কাহিল লাগে। ওকে ঘুমানোর চেষ্টা করতে বলে বসার ঘরে চলে এল কিশোর। টেলিভিশনটা অন করে দিল।
আয়না খালাও ফেরেননি। একা একা টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। খিদে পেয়েছে। বুয়াকে ডেকে হালকা কিছু খাবার দিতে বলল। রাতে আয়না খালা আর রবিন ফিরলে একসঙ্গে বসে ভাত খাবে।
টেলিভিশনের দিকে তাকিয়েই থাকল কেবল কিশোর, মন বসাতে পারল না। দিপুর কথা ভাবছে। জোর করে ছেলেটাকে বিদায় করল মিসেস ইসলাম। সঙ্গে সুটকেসও দিয়ে দিল। তারমানে বেশ কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা। তাহলে অত তাড়াতাড়ি আবার নিয়েই বা এল কেন?
দিপু যে বিপদের মধ্যে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর। ডাক্তার শিকদারের অপেক্ষায় থাকলে অনেক সময় নষ্ট হবে। এখনই কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবে?
দিপুর অবস্থা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সে। শেষে আর থাকতে না পেরে লাফিয়ে উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিল টেলিভিশন। ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর টিপতে আরম্ভ করল। হাসপাতালে দিপুর চার্টে দেখেছিল নম্বরটা। মুখস্থ করে রেখেছে।
অনেকক্ষণ রিং হবার পর ওপাশ থেকে একটা খসখসে গলা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে সাড়া দিল, 'হ্যালো?'
'কে? মিসেস ইসলাম? আমি কিশোর বলছি। কিশোর পাশা। সেদিন

আপনার কাছে রেড ক্রসের একটা টিকিট বিক্রি করে এসেছি। টাকা নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু টিকিটটা দিয়েছি কিনা মনে করতে পারছি না। না দিয়ে থাকলে ভীষণ অন্যায় হয়ে যাবে।'

'জাহান্নামে যাক তোমার টিকিট!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস ইসলাম। 'জ্বালাতন করে মারল! আমার পেছনে লেগেছ কেন বলো তো? আমি এখন ব্যস্ত। কথা বলতে পারব না...'

'প্লীজ, মিসেস ইসলাম, রাখবেন না! দিপুর সঙ্গে একটু কথা বলতে দেবেন?'

'না! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের পেছনে লাগলে ভাল হবে না...এই হারামজাদা, এখানে কি?' চিৎকার করে উঠল মিসেস ইসলাম। 'সর!' ঠাস করে চড় মারার শব্দ হলো। লাইন কেটে যাওয়ার আগে বাচ্চা ছেলের চিৎকার কানে এল কিশোরের।

এত জোরে একটা শিশুকে চড় মারল! আর সহ্য করতে পারল না ও। এর একটা বিহিত আজ রাতেই করবে। বুয়াকে ডেকে বলল, 'বুয়া, মুসাকে দেখো। আমি বাইরে যাচ্ছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরব।'

ষোলো

মোবারক আলির সাইকেলটা চেয়ে নিয়ে ভূতের গলিতে রওনা হলো কিশোর। গাড়ি আছে আয়না খালার। এখন গ্যারেজে। ওভারহোলিঙের জন্যে দিয়েছেন। তবে ওটা থাকলেও নিত না সে। ভূতের গলির মত নীরব, অন্ধকার জায়গায় গাড়ির শব্দ, আলো, দুটোই খুব সহজে চোখে পড়বে। বাড়ির কাছাকাছি থামতে দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে মিসেস ইসলাম।

মেইন শহরেই আলো কম। পাহাড়ী রাস্তায় তো কালিগোলা অন্ধকার। তবে তাতে খুব একটা অসুবিধে হলো না কিশোরের। কারণ ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবছে সে। কি করবে? বাড়িতে ঢুকবে? বের করে আনবে দিপুকে? যদি সে আসতে না চায়?

আকাশের এমাথা ওমাথা চিরে দিল বিদ্যুতের শিখা। বিকট শব্দে বাজ পড়ল কাছে কোথাও। কানে তালা লেগে গেল। ঝড়ের আর দেরি নেই।

বাড়িটার কাছে এসে একটা ঝোপের আড়ালে সাইকেলটা লুকিয়ে রাখল সে। আগের দিন যেদিক দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের কাছে গিয়েছিল সেপথটা ধরেই এগোল। ওটা দিয়ে গেলে সুবিধে। ঝোপঝাড়ের আড়াল থাকায় জানালা দিয়ে যদি কেউ নজর রেখে থাকে, বিদ্যুতের আলোতেও সহজে চোখে পড়বে না ওকে।

জানালার নিচে এসে থামল ও। আলো নেই ভেতরে। তারমানে কেউ নেই এ ঘরে। ঢোকার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ঢুকবে কিভাবে? জানালায় তো শিক। তবে ওর ভাগ্য সহায়তা করল। দরজাটাতে ছিটকানি লাগানো নেই। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। বেশি উত্তেজিত না থাকলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগত ওর কাছে। কারণ এমন ঝোড়ো রাতে এ রকম নিরালা একটা বাড়িতে কেউ

ছিটকানি খুলে রাখে না। ভুল করে রাখলেও বেশিক্ষণ সেটা অগোচরে থাকত না। বাতাসে ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলত দরজা।

যাই হোক, কোন কিছু না ভেবেই ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পায়ে রবার সোলের কেডস জুতো। শব্দ হলো না। কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে এগোতে গিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে বসল একটা টেবিলের কোণায়। কাঁচের একটা বাটি মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল।

চমকে গেল সে। দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। কান পাতল পায়ের শব্দ শোনার জন্যে।

কিন্তু বাটি ভাঙার শব্দটা মনে হয় কারও কানে যায়নি। দেখতে এল না কেউ।

আবার পা বাড়াল সে। ভেতরের দরজার দিকে এগোল।

ঠিক দরজাটার কাছাকাছি গিয়ে বিপদটা টের পেল। মনে হলো দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা ছায়া নড়ে উঠল। কিন্তু কিছু করার নেই আর তার। দেরি হয়ে গেছে। বাড়ি পড়ল ঘাড়ে। তীব্র একটা ব্যথা। মনে হলো মাথাটা ছিঁড়ে গেল বুঝি ধড় থেকে। জ্ঞান হারাল সে।

জ্ঞান ফিরতে বুঝল হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথা ঘোরানোর চেষ্টা করতে টনটন করে উঠল ঘাড়। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। জানালাশূন্য একটা ছোট ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে ওকে। অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে।

পেছন থেকে বলে উঠল খসখসে মহিলা কণ্ঠ, 'হুঁশ তাহলে ফিরল। আগেই সাবধান করেছি আমাদের ব্যাপারে নাক না গলাতে। কথা কানে যায়নি। এখন বুঝবে ঠেলা।'

কথা বলতে বলতে ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল মিসেস ইসলাম। খিকখিক করে বিকৃত হাসি হাসল।

ঘরে একটামাত্র দরজা। সেটা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। পেছনে ভেজিয়ে দিয়ে গেল পাল্লা। পুরোপুরি লাগল না। ফাঁক হয়ে রইল। বাইরে থেকে তালা কিংবা ছিটকানি লাগানোরও প্রয়োজন বোধ করল না মহিলা। বেঁধে রেখেই নিরাপদ মনে করেছে।

টেনেটুনে দেখল কিশোর। নিরাপদ মনে না করার কোন কারণ নেই। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধেছে। সামান্যতম ঢিল করতে পারল না সে।

দরজার ওপাশে একটা পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, 'হালো? আমি জলিল। হাসপাতালের ওই ভলান্টিয়ার ছেলেটা বড় জ্বালাতন করছে। চুরি করে ঘরে ঢুকেছিল। ধরে বেঁধে রেখেছি। কি করব?' কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থাকার পর আবার বলল লোকটা, 'না না, ওসব খুনোখুনির মধ্যে আমি নেই। আমি পারব না। পারলে আপনি অন্য কাউকে দিয়ে করানগে। রাখি।'

ফোন রেখে দিল লোকটা।

মিসেস ইসলামের গলা কানে এল, 'কাকে খুন করতে বলছে?'

ছেলেটাকেও। ওর খালাকেও। বলছে, ওরা দুজন বেঁচে থাকলে ভীষণ বিপদে

পড়ব আমরা। পুলিশকে গিয়ে বলে দেবে। ছেলেটা নাকি ওর খালাকে সব বলেছে।'

আঁতকে উঠল কিশোর। আয়না খালাকে খুন করার কথা বলছে। সর্বনাশ!

মরিয়া হয়ে আবার দড়ি টানাটানি শুরু করল সে। বেরোতে না পারলে দুজনেই মরবে। কোন লাভ হলো না। আরও কেটে বসল বাঁধন।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল। থরথর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা।

কি করা যায়? কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়? মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার চেষ্টা করল সে। কোন উপায়ই বের করতে পারল না। বোকার মত এসে শত্রুর হাতে ধরা দিয়েছে। মিসেস ইসলামের সঙ্গে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষ আছে, যার নাম জলিল। এই লোকটাই হয়তো সেদিন গাড়ি চালিয়ে দিপুকে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় বিদ্যুতের আলোয় সাইকেল থেকে নামতে দেখেছে কিশোরকে। রান্নাঘরের দিকে ওকে এগোতে দেখে দরজার ছিটকানি খুলে রেখেছে। দেখতে চেয়েছে ও ঢোকে কিনা। নিজে লুকিয়ে থেকেছে অন্ধকারে।

ইস্, কি বোকামিই না করেছে। রাগে দুঃখে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। দরজাটা খোলা দেখে কেন কিছু সন্দেহ করল না? আজ বোধহয় ওর মরণই আছে কপালে, সেজন্যেই ওরকম বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিল।

আবার দড়ি খোলার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। বুঝল, কিছুতেই কিছু হবে না। অহেতুক শক্তিক্ষয়। অন্যের সাহায্য ছাড়া এই দড়ি সে কিছুতেই খুলতে পারবে না।

ভয়টা এখন বেশি আয়না খালার জন্যে। তাকে শেষ করতে নিশ্চয় লোক পাঠাবে জলিলের বস্—যে লোকটা খানিক আগে ফোন করেছিল। জলিল বলে দিয়েছে, সে খুন করতে পারবে না। অতএব আপাতত কিশোরের ভয়টা কম। খালাকে শেষ করার পর ওর ব্যবস্থা করতে আসবে খুনী।

খুন করার এটা উপযুক্ত সময়। ঝড়বৃষ্টি শুরু হতে দেরি নেই। হাসপাতাল থেকে খালা বেরোলে তার পিছু নেবে খুনী। নিশ্চয় রিকশা নেবে খালা। পথে তাকে খুন করার মত উপযুক্ত জায়গার অভাব হবে না। বাঁচাতে হলে এখন তার হাসপাতাল থেকে বেরোনো বন্ধ করতে হবে। আর করতে হবে তাকেই। অথচ সে হয়ে আছে বন্দি।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল।

জলিল এবং মিসেস ইসলামের আর কোন কথা শোনা গেল না। টেলিভিশনের আওয়াজ আসছে। চড়া ভলিউমে চালিয়ে দিয়ে নিশ্চয় এখন বসে টিভি দেখছে ওরা দুজন। হয়তো ওদের বসের আসার অপেক্ষায় আছে। কিংবা খুনীর। যে আয়না খালাকে খুন করে আসবে।

এত অসহায় আর জীবনে বোধ করেনি কিশোর। মুসা কিছু করবে না। ওর শরীর অতিরিক্ত দুর্বল। ও বেরোতেই পারবে না এই ঝড়বৃষ্টির রাতে। তাছাড়া বেরোবেই বা কেন? কোন ইঙ্গিত তো তাকে দিয়ে আসেনি সে। ইস্, আরেকটা বোকামি হয়ে গেছে। ওকে বলে আসা উচিত ছিল যে সে ভূতের গলিতে যাচ্ছে।

সাইকেলটা নেয়ার সময় মোবারক আলিকে বললেও হত। দিপুকে চড় মারায় এভাবে মাথা গরম করে বেরোনো একেবারেই উচিত হয়নি ওর। সতর্ক না থাকার খেসারত এখন দিতে হবে ভালমত।

হাল ছেড়ে দিয়ে বসে বসে ভাবছে কিশোর। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। ঠিক এই সময় খুট করে একটা শব্দ হলো।

মুখ তুলে তাকাল সে।

ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দরজার পাল্লা।

উঁকি দিল একটা ছোট্ট মুখ।

দিপু!

সতেরো

দিপুর গায়ে গেঞ্জি। পরনে হাফপ্যান্ট। পায়ে স্যাণ্ডেল বা জুতো কিছু নেই। নিশ্চয় বিছানা থেকে নেমে এসেছে। একহাতে পেঁচিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে ভালুকটা। ভীত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ওকে দেখে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল কিশোরের মনে।

'তোমাকে বেঁধে রেখেছে কেন?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সে।

'আস্তে কথা বলো!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'এদিকে এসো!'

পেছন ফিরে তাকাল দিপু। ঢোকার সাহস করতে পারছে না। জানে মিসেস ইসলাম দেখে ফেললে শক্ত চড় খাবে।

'জলদি করো দিপু! তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি আমি। যাবে আমার সঙ্গে?'

আবার পেছন দিকে তাকাল দিপু। ঢুকবে কি ঢুকবে না দ্বিধা করল আরও পাঁচ সেকেণ্ড। তারপর ঢুকে পড়ল।

'লক্ষ্মী ছেলে! দরজাটা ঠেলে দাও। দিয়ে এসো এখানে। আমার কাছে।'

ঘরে ঢোকার পর যেন সাহস বেড়ে গেল দিপুর। কিশোরের কথামত পাল্লাটা ঠেলে দিল। এসে দাঁড়াল ওর চেয়ারের কাছে।

'শোনো, দিপু, আমি বিপদে পড়েছি। তুমিও বিপদে পড়েছ, আমি জানি। বাঁচতে হলে আমাকে এখন সাহায্য করতে হবে তোমার। এই যে, আমার এই পকেটে একটা ছুরি আছে। হাত ঢুকিয়ে সেটা বের করো।'

দ্বিধা করতে লাগল দিপু।

'জলদি করো!' তাড়া দিল কিশোর। 'দেরি করলে মিসেস ইসলাম চলে আসবে। তাহলে আর বেরোতে পারবে না।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল দিপু। বের করে আনল একটা ছোট ছুরি। বাইরে বেরোলে সব সময় পকেটে দু'চারটা ছোটখাট অতি প্রয়োজনীয় জিনিস রাখে কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করতে করতে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

'এই তো, গুডবয়! এবার খোলো তো ছুরিটা। পারবে?'

'পারব। ছুরি দিয়ে কাঁচা আম কেটে খেতে আমার ভাল লাগে। আমারও একটা ছুরি ছিল। হারিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, এই ছুরিটা তোমাকে দিয়ে দেব। দড়ি কাটো। ভালুকটা নামিয়ে রাখো। তাহলে সহজ হবে। আগে এই হাতের দড়িটা কাটো,' ডান হাত দেখিয়ে দিল কিশোর।

ছেলেটা বুদ্ধিমান। যা যা করতে বলা হলো, ঠিক ঠিকমত করল। ছোট হলেও ছুরিটা অসম্ভব ধার। পোঁচ দিতেই দড়ি কেটে গেল। আন্দাজ ঠিক রাখতে পারেনি দিপু। চামড়ায়ও লাগল পোঁচ। রক্ত বেরোতে লাগল। কেয়ারই করল না কিশোর। একটা হাত মুক্ত হতেই দিপুর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে কয়েক পোঁচে অন্য হাত আর পায়ের বাঁধন কেটে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভালুকটা আবার তুলে নিয়েছে দিপু।

ওকে কোলে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাধা দিল না দিপু। টেলিভিশনের জোরাল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাঁ দিকে। ডান দিকে আরেকটা দরজা দেখা গেল। সেদিকে ছুটল সে।

ছিটকানি খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। দৌড় দিল গেটের দিকে। একছুটে গেট পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়। পেছন ফিরে তাকাল না আর।

টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝোপের আড়াল থেকে সাইকেলটা বের করে ভালুকটাকে আটকাল পেছনের ক্যারিয়ারে। সামনের ডাণ্ডায় দিপুকে বসিয়ে দিয়ে শক্ত করে হ্যাণ্ডেল ধরে রাখতে বলল।

শাঁই শাঁই করে প্যাডেল ঘুরিয়ে চলল কিশোর। পেছন থেকে ঠেলে ওর গতি আরও বাড়িয়ে দিল ঝোড়ো বাতাস।

'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমার?' জিজ্ঞেস করল দিপুকে।

'না। আমি এভাবে সাইকেলে বসতে পারি। আসগর চাচা আমাকে এভাবে সাইকেলে বসিয়ে স্কুলে নিয়ে যেত।'

'আসগর চাচা কে?'

'আমাদের বাড়ির কাজের লোক।'

'কাল তোমাকে গাড়িতে করে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ওরা?'

'আমাকে কোথাও নেয়নি।'

'আমি নিজের চোখে দেখলাম গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে গেল। তুমি যেতে চাইছিলে না। জোর করে নিল। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ?'

'আমাকে নেয়নি।'

'তবে কাকে নিল? আমি কি ভুল দেখলাম?'

'অপুকে নিয়েছে।'

অবাক হলো কিশোর। 'অপু কে?'

'আমার ভাই। আমার একটা যমজ ভাই আছে। দেখতে আমার মত।'

এতক্ষণে ভেদ হলো ঘন ঘন দিপুর চেহারা পরিবর্তনের রহস্য। আসলে একেকবার একেকজনকে দেখেছে কিশোর। যমজ ভাই বলে চেহারায় খুব মিল

দুজনের। বেমিলও আছে। টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে যে ছেলেটাকে দেখেছিল কিশোর, সে অপু। সেজন্যেই ওকে চিনতে পারেনি। রান্নাঘরে যে ছেলেটাকে বসে থাকতে দেখেছিল ও, সেও দিপু নয়। অপু। গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাকে। বাড়ির ভেতরে চিৎকার শুনেছে দিপুর। মোটেলের সামনে যাকে দেখেছে, সেও দিপু। তারমানে সে যে ভেবেছিল দিপুকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে আবার ফেরত আনা হয়েছে, সেটা ভুল। সে আগাগোড়া ওই বাড়িতেই ছিল।

'কোথায় নিয়ে গেছে তোমার ভাইকে, জানো?'

'না জানি না!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল দিপু, 'আমি অপুকে দেখতে চাই। ও কোথায় আছে?'

'তা তো আমিও জানি না!'

বৃষ্টি বাড়ছে ধীরে ধীরে। ঝাপটা মারছে দমকা বাতাস। সেই সঙ্গে বজ্রপাত। নিউমোনিয়া থেকে সবেমাত্র সেরে উঠেছে দিপু, এখন বৃষ্টিতে ভিজলে তার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। কথা বলার উপায় নেই। আরও দ্রুত প্যাডাল ঘোরাতে লাগল কিশোর।

কিন্তু যত তাড়াতাড়িই করুক, সাইকেলে গেলে না ভিজে যেতে পারবে না। কিছুদূর গিয়ে একটা রিকশা দেখে ডাক দিল। সাইকেলটা তালা দিয়ে রাস্তার ধারে কাত করে ফেলে রেখে রিকশায় উঠে পড়ল। যে ভাবে ফেলে যাচ্ছে চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। গেলে যাক। একটা সাইকেলের জন্যে দিপুকে ভেজানো ঠিক হবে না। আবার যদি অসুখটা বাড়ে, বাঁচানোই দায় হয়ে পড়বে।

রিকশায় উঠে নিজের শার্ট খুলে ওর চুল মাথা মুছিয়ে দিল সে। তারপর চিপে শার্টটা থেকে পানি বের করে আবার গায়ে দিল।

রিকশাওয়ালাকে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও, ভাই। ক্যান্সার হাসপাতালে যাও।'

ভেবেচিন্তেই আগে হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। বাড়ি গেলে সময় নষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই যদি খালা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আর কিছু করার নেই। যদি না বেরোয়, তাহলে তাকে সাবধান করে দেয়া যাবে। হাসপাতালে বসেই পুলিশকে ফোন করা যাবে।

কোনখান থেকে বাড়িতে আর হাসপাতালে ফোন করতে পারলেও হত। কিন্তু কোথায় পাবে ফোন? আমেরিকার মত তো আর রাস্তার ধারে ফোন বুদ নেই।

মোটর সাইকেলের শব্দ কানে এল। পেছন থেকে রিকশার পাশ কেটে বেরিয়ে গেল একটা লাল হোণ্ডা, হান্ড্রেড সিসি সিডিআই। হেলমেটের জন্যে আরোহীর মুখ দেখা গেল না। অরুণেরটাও লাল হোণ্ডা। এসেছেও ভূতের গলির দিক থেকে। সে-ই নয়তো?

আশ্চর্য! কালও গিয়েছিল। আজও? একই সময়ে? কাকতালীয় হতে পারে না ব্যাপারটা। নিশ্চয় ওর পিছু নিয়েছিল।

আঠারো

হাসপাতালে যখন পৌছল কিশোর, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাগ্যিস রিকশাটা নিয়েছিল। সাইকেলে করে আসতে গেলে মারাই পড়ত দিপু।

কিশোরের সঙ্গে রাতের বেলা এই বৃষ্টির মধ্যে রিকশায় করে আসতে খুব ভাল লাগছে ওর। এ রকম করে আর কোনদিন বেরোয়নি। এটা তার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। অ্যাডভেঞ্চার।

রিকশাওয়ালাকে ভেতরে ঢুকতে বলল কিশোর। একেবারে গাড়িবারান্দার ছাতের নিচে নিয়ে যেতে বলল।

নিয়ে গেল রিকশাওয়ালা।

নেমে পার্কিং লটের দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল কিশোরের দৃষ্টি। গোটা তিনেক মোটর সাইকেল আছে। তার মধ্যে একটা পরিচিত। লাল হোণ্ডা। হান্ড্রেড সিসি সিডিআই। চিন্তিত হলো সে। অরুণ এ সময় হাসপাতালে কেন?

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দিপুকে কোলে করে নিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় উঠল কিশোর। ভালুকটাকে ছাড়েনি দিপু। জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

নিচতলায় রিসিপশন ডেস্কে একটা মেয়েকে বসে থাকতে দেখে খালার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। চিনতে পারল না মেয়েটা। কিশোর জানতে চাইল, হাসপাতালের বোর্ড অভ ট্রাস্টিদের মীটিং হচ্ছে কোনখানে। তাও বলতে পারল না মেয়েটা। 'বসে আছেন কি জন্যে এখানে?' জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল কিশোরের। কিন্তু করল না। অনুমান করল, মীটিং হাসপাতালের বড় কোন কর্মকর্তার অফিসে হওয়াটা স্বাভাবিক। ডিরেকটরের অফিস কয় তলায়, জানতে চাইল।

এর জবাব দিতে পারল মেয়েটা। দোতলায়।

দিপুকে ওখানে রেখে আসবে কিনা ভাবল কিশোর। নাহ্‌, নির্ভর করা যায় না এই মেয়ের ওপর। ওর দায়িত্বে রেখে যাওয়া যায় না। মিসেস ইসলাম আর জলিল নিশ্চয় এতক্ষণে জেনে গেছে দিপুকে নিয়ে পালিয়েছে কিশোর। আয়না খালার খোঁজে ও এখানে এসেছে যদি আন্দাজ করতে পারে, তাহলে এসে ঢুকেই দেখে ফেলবে ছেলেটাকে। আবার ধরে নিয়ে যাবে। রিসিপশনিস্ট আটকাতে পারবে না। দিপুকে কাছছাড়া করা তাই নিরাপদ ভাবল না।

দোতলায় উঠে এল সে। একজন ওয়ার্ডবয়কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল পরিচালকের অফিসটা কোনদিকে।

সিঁড়ির দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল। একটা ছায়া হারিয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। অরুণের মত লাগল।

দিপুকে কোলে নিয়ে দৌড় দিল কিশোর। অরুণ হলে ওকে জিজ্ঞেস করবে, ভূতের গলিতে গিয়েছিল কেন।

কিন্তু ও চার তলায় উঠতে উঠতে হারিয়ে গেল অরুণ। কোথায় যে ঢুকে

পড়ল, বোঝা গেল না।

এখানে উঠে এসে অবশ্য একটা সুবিধে পেল। দিপুকে বসিয়ে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। দেখল ডিউটিতে আছে নার্স বিশাখা। এতরাতে দিপুকে সহ কিশোরকে দেখে চোখ কপালে উঠল ওর। জিজ্ঞেস করল, 'একে নিয়ে এলে কোথেকে?'

'সে অনেক কথা। আপনার কাছে বসিয়ে যাচ্ছি, দেখে রাখুন। ও হারালে কিন্তু পুলিশের ঝামেলায় পড়বেন, বলে দিলাম।' একটা চেয়ারে দিপুকে বসিয়ে দিল কিশোর। আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দিল না মহিলাকে। করিডরের দিকে ছুটল।

পেছনে তাকালে দেখতে পেত হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে নার্স।

আবার দোতলায় নেমে এল কিশোর। একজন পিয়নকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, ডিরেক্টরের অফিসেই মীটিং হয়েছে। শেষ হয়েছে আধঘন্টা আগে। সদস্যরা প্রায় সবাই চলে গেছে। বেগম মেহেরুন্নিসাকে চেনে পিয়ন। মিনিট পনেরো আগেও তাঁকে হাসপাতালে দেখেছে।

'একা গেছেন, না কারও সঙ্গে?' জানতে চাইল কিশোর।

'শিকদার সাহেবের সঙ্গে দেখলাম ওপরতলায় যেতে। তারপর কোনখানে গেছেন জানি না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। পনেরো মিনিট আগে দেখেছে পিয়ন, তারমানে এখনও ওপরেই কোথাও আছে খালা। আর ডাক্তার শিকদার যতক্ষণ সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ খালা নিরাপদ। একা এখন বাসায় যাওয়ার চেষ্টা না করলেই হয়।

খালাকে খুঁজে বের করতে ছুটল সে। চার তলায় উঠে নার্স স্টেশনে ঢুকল। বিশাখার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বেগম মেহেরুন্নিসাকে দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল মহিলা, 'না তো। তিনিও এসেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণ ডিরেক্টরের অফিসে ছিলেন। মীটিঙে। ডিরেক্টরের পিয়ন বলল ডাক্তার শিকদারের সঙ্গে ওপরে উঠেছে। কোন তলায় গেল বুঝলাম না।'

শিফট-ইন-চার্জের নাম শুনে সতর্ক হয়ে গেল বিশাখা। ঢিলেঢালা ভাবটা দূর হয়ে গেল চোখের পলকে। সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। মাথা নেড়ে বলল, 'না, দেখিনি।'

ভালুকটাকে জড়িয়ে ধরে দিপু বসে আছে চুপ করে। ওকে বলল কিশোর, 'আরেকটু বসো, হ্যাঁ? আমি আসছি। তারপর তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

করিডরে বেরিয়ে খুঁজতে শুরু করল কিশোর। যে কটা দরজা বন্ধ দেখল, সবগুলো ঠেলে খুলে উঁকি দিতে লাগল ভেতরে। এ ভাবে উঁকি দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না জেনেও।

খুঁজতে খুঁজতে নিষিদ্ধ দরজাটার সামনে চলে এল সে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। ফাঁক হয়ে আছে। বিকেলে শ্রমিকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর বোধহয় আর ঠিকমত লাগায়নি।

এই তলায় খোঁজা শেষ হয়েছে। দশ তলায় যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে। কানে এল একটা শব্দ। মনে হলো দরজাটার ওপাশ থেকেই এসেছে। কান পাতল। শোনা গেল না আর। দেরি হয়ে যাচ্ছে। খালাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা দরকার। একা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলে ওর এত কষ্ট সব বিফলে যাবে। পা বাড়াল সে। ঠিক এই সময় আবার শোনা গেল দরজার ওপাশে শব্দ। আশ্চর্য! এতরাতে ওই অন্ধকার অসমাপ্ত ফ্লোরে কে করে শব্দ? নার্স সাফিয়ার লাশের কথা মনে পড়ল। আবার কাউকে নিয়ে গিয়ে ওখানে খুন করা হচ্ছে না তো?

খুন!

আয়না খালা!

হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইল কিশোরের। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো। একটা মুহূর্তও দ্বিধা না করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

উনিশ

অন্ধকার ঘরটাকে সেদিনের চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হলো কিশোরের। বিপজ্জনক। এখানে একটা খুন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, আরেকটা হতে বাধা নেই। কালো কালো ভূতুড়ে ছায়াগুলো তেমনি অনড়। বিদ্যুৎ চমকানো কমে গেছে। ভালই হয়েছে। চমকানোর সময় তীব্র আলো, নিভে গেলে অন্ধকার অনেক বেশি।

পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ বের করল সে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় এটাও নিয়েছিল সঙ্গে।

পেন্সিল টর্চের সামান্য আলোয় এতবড় ঘরের অন্ধকার তো কাটলই না, বরং কালো ছায়াগুলো আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। তবে দেখে এগোনো যায়, এটুকুই যা স্বস্তি। হঠাৎ করে কোন গর্তে পড়ে যাওয়ার কিংবা কোন জিনিসে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কিসের শব্দ শুনেছে, খুঁজতে শুরু করল সে। একই সঙ্গে মাথায় চলেছে ভাবনা। সেদিন দুটো মানুষ গায়েব হয়েছিল এখান থেকে—একজন জীবন্ত, আরেকজন মৃত। অরুণ এবং নার্স সাফিয়া। দুজনকেই দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছে সে, কিন্তু বেরোতে দেখেনি। তারমানে দরজা ছাড়াও এখান থেকে বেরোনোর আরও কোন পথ নিশ্চয় আছে।

খানিক আগে শব্দ করেছে যে, সে-ও বেরিয়ে যেতে পারে ওই পথ দিয়ে।

পথটা পেয়ে যেতে সময় লাগল না ওর। সেদিন অন্ধকারে হাতড়ে মরেছে। পরে লোকজন নিয়ে এসে যাও বা ঢুকেছিল, ওদের সঙ্গে থাকায় খুঁজতে পারেনি। পথটাও চোখে পড়েনি। আজ নিজের হাতে টর্চ থাকায় সহজেই বের করে ফেলল ওটা।

মেঝেতে একটা গোল ফোকর। তাতে দড়ি আর বাঁশ দিয়ে তৈরি সিঁড়ি ঝোলানো। শ্রমিকেরা বানিয়েছে। কাজ করার সময় তিন তলার ফ্লোরে যাতায়াতের জন্যে।

অরুণ কোন পথে পালিয়েছিল সেদিন বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। ওদের সাড়া পেয়ে ওই সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় নেমে লুকিয়ে পড়েছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর উঠে এসে দরজা দিয়েই বেরিয়েছে। কিন্তু লাশটাকে গায়েব করল কিভাবে?

খুট করে শব্দ হলো পেছনে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। থাবা দিয়ে তার হাত থেকে ফেলে দেয়া হলো টর্চ। মেঝেতে পড়ে নিভে গেল ওটা। লম্বা একটা ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সামনে। ডান হাত তুলে রাখার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, পিস্তল উদ্যত করে রেখেছে।

প্রাণ বাঁচানোর প্রচণ্ড তাগিদে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন কিশোরের শরীরে। ঝট করে বসে পড়ল সে। পরক্ষণে ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে সরে গেল একটা ভারি মেশিনের অন্য পাশে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে লাগল আরেক দিকে।

এত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারবে ও, ভাবেনি বোধহয় লোকটা। তাই সতর্ক ছিল না। ভেবেছিল টর্চটা ফেলে দিলেই ভয়ে কুঁকড়ে যাবে কিশোর। তখন যা ইচ্ছে করবে ওকে নিয়ে।

'ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো!' হুমকি দিল লোকটা। বিকৃত শোনাল কথা। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললে যেমন হয় অনেকটা তেমনি। চেনা চেনা লাগল কণ্ঠটা। অরুণ নয়।

চুপ করে রইল কিশোর।

'আমি জানি তুমি কোথায় আছ। বেরিয়ে এসো জলদি!' আবার বলল লোকটা।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে কিশোর। গুলি করছে না কেন? শব্দ হয়ে যাওয়ার ভয়ে?

বেরোল না সে। নড়লও না। উঁচু করে সাজিয়ে রাখা কিছু বস্তার সঙ্গে গা মিশিয়ে বসে রইল।

এক পা ডানে সরল লোকটা। এগিয়ে আসতে শুরু করল। একেবারে ওর তিন হাতের মধ্যে চলে এল। শাসাল, 'তুমি ভেবেছ লুকিয়ে থেকে পার পাবে? মোটেও না। বেঁচে ফিরে যেতে পারবে না এখান থেকে।'

কিশোর বুঝে গেল, ওকে দেখতে পাচ্ছে না লোকটা। সঙ্গে টর্চ নেই, তাহলে জ্বালত। আন্দাজে কথা বলত না। সে এখন নড়লেই দেখে ফেলবে। গুলি করবে। দম বন্ধ করে বসে রইল।

দরজায় শব্দ হলো। ফিরে তাকাল কিশোর। আবার খুলে যাচ্ছে পাল্লাটা। করিডরের আলোয় দেখা গেল আরেকজন লম্বা লোক ঢুকছে। পলকের জন্যে দেখা গেল ওকে। আবার ভেজিয়ে দিল দরজা।

ভেতরে ঢুকেছে লোকটা।

কে ও? পিস্তলধারীর সঙ্গী? তাহলে আর বাঁচতে হবে না। মৃত্যু অবধারিত। আয়না খালার ভাগ্যে কি ঘটেছে, খোদাই জানে!

পরের কয়েক সেকেণ্ডে ঘটে গেল অনেক ঘটনা। বড় একটা টর্চ জ্বলে উঠল

দ্বিতীয় লোকটার হাতে। এগিয়ে আসতে শুরু করল। আলো পড়ল পিস্তলধারীর ওপর। দুপ করে গুলির শব্দ হলো। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। তাই বিকট শব্দ হয়নি। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। নিভে গেল টর্চ।

বোঝা গেল দ্বিতীয় লোকটা প্রথমজনের বন্ধু নয়। সন্দেহ হওয়ায় সে-ও নিশ্চয় দেখতে এসেছে এই অসমাপ্ত ফ্লোরে। গুলি কি শুধু টর্চেই লাগল? না গায়েও লেগেছে?

লাগেনি বোধহয়। তাহলে শব্দ করত।

টর্চের আলোয় পিস্তলধারীকে কিশোরও দেখতে পেয়েছে। চিনতে পারেনি। মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক পরা। কথাগুলো কেন বিকৃত হয়ে বেরোচ্ছিল, বুঝতে পারছে এখন। পিস্তলধরা হাতটা সামনে বাড়ানো। দুজন শত্রু এখন তার। যাকে দেখবে তাকেই গুলি করবে।

মরিয়া হয়ে উঠল হঠাৎ কিশোর। একলাফে উঠে দাঁড়াল। থাবা মারল লোকটার পিস্তল ধরা হাতে। খটাস করে মেঝেতে পড়ল ওটা। অস্ফুট শব্দ করে উঠল লোকটা। উবু হয়ে বসে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। পিস্তল খুঁজছে।

এ রকম কোন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল বোধহয় দ্বিতীয় লোকটা। ছায়ার মধ্যে থেকে আচমকা এসে মাস্ক পরা লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি।

কিশোরও বসে রইল না। পিস্তলটা খুঁজতে লাগল। পেয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। চিৎকার করে উঠল, 'যেই হোন আপনারা, উঠে দাঁড়ান! পিস্তল এখন আমার হাতে!'

থেমে গেল ধস্তাধস্তি।

দুটো ছায়ামূর্তিকে উঠে দাঁড়াতে দেখল কিশোর।

'ওটা আমাকে দিয়ে জলদি একটা টর্চ নিয়ে এসো, কিশোর!'

কণ্ঠ চিনতে কোন অসুবিধে হলো না কিশোরের। অরুণ। পরে যে ঢুকেছে।

পিস্তল দিতে দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। অরুণকে কি বিশ্বাস করা যায়? মনে হলো, যায়। সার্জিক্যাল মাস্ক পরা লোকটা যেহেতু তারও শত্রু। সে কে, এখন জানা হয়ে গেছে ওর। মাস্কের জন্যে কথা বিকৃত শোনাচ্ছিল বলে প্রথমে চিনতে পারেনি। এখন পেরেছে। অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে লোকটাকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে।

'বেরোচ্ছ না কেন? একটা টর্চ দরকার,' অরুণ বলল। 'আমার বিশ্বাস, তোমার খালাকেও এখানেই কোথাও ফেলে রেখেছে। জলদি যাও!'

আর দ্বিধা করল না কিশোর। পিস্তলটা অরুণের হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'টর্চ পাব কোথায়?'

'দৌড়ে গিয়ে সিকিউরিটিকে খবর দাও। আমি একে আটকে রাখছি।'

বিশ

আয়না খালাকে পাওয়া গেল দেয়াল ঘেঁষে রাখা কতগুলো সিমেন্টের বস্তার আড়ালে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। মারা যাননি। মাথায় পিস্তলের বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি তাঁকে জরুরী বিভাগে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

মাস্ক পরা লোকটাকে নিয়ে আসা হলো হলঘরে। নার্স বিশাখা যেখানে ডিউটি দিচ্ছে।

পিস্তল তাক করে রাখার আর দরকার নেই। ওটা সিকিউরিটিদের হাতে দিয়ে দিয়েছে অরুণ। ওরাই এখন পিস্তল তাক করে পাহারা দিচ্ছে লোকটাকে।

একটানে ওর মুখোশ খুলে ফেলল অরুণ।

চমকে গেল সবাই। কিশোর বাদে। সে আগেই চিনে ফেলেছিল। শিফট-ইন-চার্জ! ডাক্তার শিকদার হেমায়েত হোসেন।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ডাক্তার। কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমরা সবাই ভুল করছ। আমি ক্রিমিন্যাল নই।'

'ক্রিমিন্যাল নন মানে?' ভুরু নাচাল অরুণ। 'আপনার চেয়ে বড় পাষণ্ড আর কে আছে?' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'এই লোকই খুন করেছে নার্স সাফিয়াকে। তোমাকে আর তোমার খালাকেও খুন করতে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ হয়েছিল, আজ রাতে কিছু একটা ঘটাবে শিকদার। এবং সেটা মীটিঙের পরে। তাই অপেক্ষা করছিলাম। বাথরুমে গিয়েছিলাম, এই সুযোগে শিকদার তোমার খালাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কোথাও খুঁজে না পেয়ে শেষে মনে হলো নিশ্চয় সেকেণ্ড উইঙে ঢুকেছে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিল শরীরে। খুনটা করেই ফেলল নাকি ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম।'

'আমি সময়মত না ঢুকলে ঠিকই করে ফেলত। আর তুমি আসতে আরেকটু দেরি করলে আমি ধরা পড়ে যেতাম। তখন দুজনকেই করত। বেপরোয়া লোক। আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি সবকিছু,' কিশোর বলল। 'নার্স সাফিয়া ডাক্তারের গোপন কথা জেনে ফেলে ব্ল্যাকমেল করছিল। প্রচুর টাকার দরকার ছিল ওর। কারণ মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়ার ভয় দেখিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করছিল ওর স্বামী। খুন হতে হলো বেচারিকে। গোপন কথাটা কি, ডাক্তার সাহেব, বলবেন?'

আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন ডাক্তার। জবাব দিলেন না।

'গোপন কথাটা কি, আমি বলি,' অরুণ বলল। 'ছেলেধরা আর নারী পাচারকারী দলের সঙ্গে জড়িত শিকদার। জুয়া খেলার বদভ্যাস আছে। নিশ্চয় অনেক টাকা ধারদেনা করে বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিল। ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আর কোন উপায় না দেখে ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দিপু আর ওর ভাইকে চিটাগাং কিংবা অন্য কোন শহর থেকে কিডন্যাপ করে এনে মিসেস ইসলামের বাসায় রাখা হয়েছিল। ওই মহিলাও ছেলেধরাদের দলের লোক।

তার আরেক সহকারী জলিল। কপাল খারাপ এদের, দিপুর হলো নিউমোনিয়া। মারধর করে, অমানুষিক অত্যাচার করে আতঙ্কিত করে দিয়ে ছেলেদের মুখ বন্ধ রাখত ওরা। নিশ্চয় অযত্নে রেখে ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল, তাতে নিউমোনিয়ায় ধরেছিল ছেলেটাকে। আসলে শয়তানদের শায়েস্তা করার জন্যে ভগবান একটা না একটা পথ করেই দেন। দিপুকে হাসপাতালে আনার পর সেবা করতে গিয়ে সন্দেহ হয় নার্স সাফিয়ার। ডাক্তার শিকদারের রেফারেন্সে মিসেস ইসলামের ছেলে হিসেবে ভর্তি করা হয়েছিল ওকে হাসপাতালে। টাকা দিয়ে সাফিয়ার মুখ বন্ধ রাখতে চেয়েছিল শিকদার। কিন্তু স্বামীর চাপে পড়ে অনেক বেশি টাকা চেয়ে বসল মহিলা। ওকে খুন করে ঝামেলা চিরতরে সরিয়ে দিল শিকদার।'

অবাক হয়ে শুনছে দুজন সিকিউরিটি আর নার্স বিশাখা। দিপুর এ সবে আগ্রহ নেই। মিসেস ইসলামের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে সে এতেই খুশি। ভালুকটাকে জড়িয়ে ধরে আপনমনে কথা বলছে ওটার সঙ্গে।

'পাগলামি! সব মিথ্যে কথা!' বিড়বিড় করলেন ডাক্তার শিকদার।

'আর অস্বীকার করে লাভ নেই, ডাক্তার,' কঠোর হয়ে উঠল অরুণের দৃষ্টি। 'জয়াকে কি করেছেন, বলুন? কোথায় পাচার করেছেন ওকে?'

'জয়া? কে জয়া? আমি ওকে চিনি না।'

প্রচণ্ড রাগে ঘুসি মারতে গেল অরুণ। ধরে ফেলল তাকে সিকিউরিটিরা।

'জয়া কে?' অরুণের দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার বোন?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'তোমার কথা থেকে আন্দাজ করলাম। তোমার বোনকেও কিডন্যাপ করেছে ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল অরুণ। 'শিকদারকে সন্দেহ হয়েছিল আমার। ওর রেফারেন্সে ভর্তি করেছিলাম। সুস্থ হয়ে যেদিন রিলিজ পাওয়ার কথা, সেদিন এই হাসপাতাল থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিল জয়া। পুলিশ কিছু করতে পারেনি। ওকে খুঁজে বের করার জন্যেই আমি এই হাসপাতালে ভলান্টিয়ারের কাজ নিয়েছি। নজর রেখেছি শিকদারের ওপর। লোকটার চালচলন আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগছিল না।' আবার তাকাল ডাক্তারের দিকে, 'কি করেছেন আমার বোনকে?'

জবাব দিলেন না শিকদার।

'তোমার আর কষ্ট করার দরকার নেই,' অরুণকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর। 'পুলিশ ঠিকই কথা আদায় করে নেবে। একটা কথার জবাব দাও তো? নার্স সাফিয়ার পিছু পিছু তুমি কেন সেদিন সেকেণ্ড উইঙে ঢুকেছিলে?'

'আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম, শিকদার সাফিয়াকে ওখানে ছুটির পর দেখা করতে বলেছে। সন্দেহ হলো। তাই দেখতে গিয়েছিলাম। আরেকটু আগে যেতে পারলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম মহিলাকে। মরণ আছে কপালে, কি আর করব। গিয়ে দেখি গলায় ছুরি মেরে খুন করে ফেলেছে ওকে শিকদার। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই সময় দরজা খুলে তুমি ঢুকলে। ওখানে দেখলে আমাকে সন্দেহ করবে সবাই। তাই পালালাম শ্রমিকদের দড়ি বেয়ে।'

'কিন্তু তোমাকে একবাক্স ছুরি চুরি করতে দেখেছি আমি সেদিন। ওই ছুরির একটা নার্সের গলায় গাঁথা ছিল।'

'ওই ছুরির একটা নয়, ওই ধরনের একটা ছুরি। এটা হাসপাতাল। সার্জিক্যাল নাইফের অভাব নেই। ডাক্তার শিকদারের পক্ষে ওরকম হাজারটা ছুরি যোগাড় করা সম্ভব।'

'কিন্তু তুমি চুরি করলে কেন?'

'আমি চুরি করিনি। ডাক্তার আকবর আমাকে বাক্সটা নিতে পাঠিয়েছিলেন। ওটা নিতে এসে দেখা হয়ে যায় মিসেস ইসলাম আর তোমার সঙ্গে। কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়। তাই অমন তাড়াহুড়ো করে ছুরি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কাছে মনে হয়েছে চুরি।'

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'আরেকটা রহস্যের জবাব পেলাম। সাফিয়ার লাশটা কি করে সরিয়েছেন ডাক্তার শিকদার, তাও বুঝতে পারছি। কি করে সরাবেন, সেটা আগেই ভেবে রেখেছিলেন। ওভাবেই করেছেন খুনটা। এমন জায়গায় ছুরি ঢুকিয়েছেন, যাতে রক্তপাত কম হয়। তিনি ডাক্তার, জানেন, কোথায় ছুরি ঢোকালে গলগল করে রক্ত বেরোবে না। মেঝেতে রক্ত পড়ে থাকবে না। বেমালুম গায়েব করে দিতে পারবেন লাশটা। কেউ কোনদিন খোঁজই পাবে না নার্স সাফিয়ার। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, আমি দেখে ফেললাম লাশ।

'আমি যখন ঢুকেছি, তখনও তিনি সেকেণ্ড উইঙের চার নম্বর ফ্লোরে লুকিয়ে ছিলেন। আমি বেরিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একটা রোগীর বেড নিয়ে এলেন। তাতে লাশটা তুলে নিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। নিয়ে গিয়ে রেখে দিলেন লাশকাটা ঘরে। কেউ সন্দেহ করল না। হাসপাতালে সাদা অ্যাপ্রন আর সার্জিক্যাল মাস্ক পরা কোন লোক যদি রোগীর বিছানা ঠেলে নিয়ে যায় কে সন্দেহ করবে? চাদরের নিচে লাশ আছে, না রোগী, কেউ বুঝতে পারবে না। আমিও পারিনি। ডাক্তার হারুণকে সেকেণ্ড উইঙে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি একটা লোককে দেখেছি বেড ঠেলে নিয়ে যেতে। সে-ই যে ডাক্তার শিকদার ঘুণাক্ষরেও যদি বুঝতাম···লাশটা কি করেছেন, ডাক্তার? বলবেন?'

এ প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না ডাক্তার।

'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা,' কিশোর বলল, 'রেকর্ড রুম থেকে দিপুর ফাইলটাও আমার ধারণা ডাক্তার শিকদারই সরিয়েছেন। এর কোন প্রয়োজন ছিল না অবশ্য। ক্রিমিন্যালদের মন দুর্বল থাকে তো, তাই এই অতিরিক্ত সতর্কতা।'

পুলিশকে ফোন করে দেয়া হয়েছে আগেই। চারজন কনস্টেবল নিয়ে হলে ঢুকলেন একজন দারোগা। শিকদারের হাতে হাতকড়া পরানোর নির্দেশ দিলেন একজন কনস্টেবলকে।

'আমি কি করেছি যে আমাকে অ্যারেস্ট করছেন?' প্রতিবাদ জানালেন শিকদার।

'আপাতত একটা কারণই যথেষ্ট,' কঠোর স্বরে জবাব দিলেন দারোগা। 'ইমার্জেন্সিতে বেগম মেহেরুন্নিসার সঙ্গে কথা বলে এসেছি আমি। হুঁশ ফিরেছে

তাঁর। তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, মীটিঙের পর আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন, নার্স সাফিয়ার মৃত্যু রহস্য আপনি ভেদ করে ফেলেছেন। কিভাবে করেছেন, সেটা বুঝতে হলে সেকেণ্ড উইঙে যাওয়া দরকার বেগম মেহেরুন্নিসার। তিনি দুঃসাহসী মহিলা। তাছাড়া আপনার মতলব বুঝতে পারেননি। অনেক দিনের পরিচয়, তাই আপনাকে সন্দেহ করার কথাও মনে হয়নি তাঁর। নির্দ্বিধায় চলে গেছেন আপনার সঙ্গে। ভেতরে ঢুকেই তাঁকে খুন করার জন্যে ছুরি বের করেন আপনি। সেটা দেখে ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। এই সময় নাকি কে একজন ঢুকে পড়ে ফ্লোরে...'

'আমি,' কিশোর বলল। 'শব্দ শুনে আমি ঢুকে পড়ি।'

ভুরু কুঁচকে তাকালেন দারোগা। 'তুমি কে?'

'আমি মেহেরুন্নিসার বোনপো।'

'ও। তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।' আবার শিকদারের দিকে তাকালেন দারোগা, 'তখন পিস্তল দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে বেগম মেহেরুন্নিসাকে আপনি বেহুঁশ করে ফেলেন। অতএব আপাতত খুনের চেষ্টার দায়ে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি, নাকি, কি বলেন? অ্যাটেম্পট টু মার্ডার।'

'আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলব।'

'সে সুযোগ আপনি থানায় গিয়েও পাবেন। চলুন এখন।'

একুশ

পরদিন।

সকালবেলা আয়না খালার বাসায় হাজির হলো অরুণ। দারোগা সাহেবও এসেছেন। সব কথা জানার জন্যে। এতক্ষণে তাঁর নাম জানা হয়ে গেছে কিশোরের। ইউসুফ আহমেদ।

বসার ঘরে বসেছে তিন গোয়েন্দা, অরুণ, আয়না খালা আর দারোগা। দিপুও আছে। ভালুকটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। এ বাড়িতে এসে বেশ সুখি সে। মিসেস ইসলামের বাড়ির চেয়ে অনেক ভাল জায়গা। একেবারে তার নিজের বাড়ির মত।

ওদের বাড়ি চিটাগাঙে, জানিয়েছে সে। একদিন স্কুল ছুটি হলে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল দুই ভাই। আসগরচাচা এসে ওদের নিয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন এল অন্য এক লোক। নাম বলল জলিল। আসগরচাচা নাকি ওদের নিতে পাঠিয়েছে। কোন সন্দেহ করল না দুই ভাই। উঠে বসল জলিলের বেবিট্যাক্সিতে। কিছুক্ষণ পর দিপুর নাকের কাছে একটা রুমাল চেপে ধরল জলিল। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। পরে দেখল, একটা মাইক্রোবাসে করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। অপরিচিত লোকজন দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল সে। প্রচণ্ড মার মেরেছে ওকে তখন জলিল। ভয়ে আর টুঁ শব্দ করেনি দিপু।

নোটবুক আর বলপেন বের করে তৈরি হলেন দারোগা ইউসুফ।

বলতে আরম্ভ করল কিশোর।

একেবারে গোড়া থেকে সবিস্তারে সব জানাল। একটা কথাও বাদ দিল না। নীরবে লিখে নিলেন দারোগা। মাঝেমধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করলেন।

আয়না খালার স্বীকারোক্তি আগেই নিয়েছেন। কিশোরের নিলেন। দিপুকে প্রশ্ন করলেন। তারপর ফিরলেন অরুণের দিকে।

কিভাবে ওর বোন জয়াকে খোঁজার জন্যে হাসপাতালে কাজ নিল অরুণ, জানাল পুলিশকে। মিসেস ইসলামকে সেও সন্দেহ করেছিল। রাতে লুকিয়ে তাই ওর বাড়িতে গিয়েছিল ওখানে কি ঘটছে জানার জন্যে। কাকতালীয় ভাবে দেখা হয়ে যায় কিশোরের সঙ্গে। ঠিক কাকতালীয়ও বলা যাবে না। দুজনে একই সময়ে হাসপাতালের ডিউটি শেষ করে গিয়েছে, মিলে গেছে তাই তদন্তের সময়টা। দ্বিতীয় দিন অরুণ যায়নি। সেদিন রাস্তায় মোটর সাইকেল যেটা দেখেছে কিশোর, সেটা অন্য কারও হবে। আরেকটা তথ্য জানা গেল অরুণের কাছে। দিপু হাসপাতালে কান্নাকাটি করত বলে ওকে ঘুমের হালকা ডোজের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখত সাফিয়া। যাতে ও কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারে। কেউ কিছু জেনে না ফেলে।

'কিন্তু বিধি বাম,' বলে উঠল রবিন। 'ঠিকই জেনে ফেলল কিশোর পাশা। ওকে ফাঁকি দিতে পারল না সাফিয়া।'

সবার কথা শোনার পর দারোগা বললেন, 'শিকদার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। জয়াকে কোথায় নিয়ে গেছে, বলেছে। ওকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনাদের কথার সঙ্গে শিকদারের কথা মিলে যাচ্ছে সব।'

হেসে বললেন আয়না খালা, 'সেজন্যেই আগে আমাদের কথা শুনে নিলেন, মিথ্যে বলছি কিনা।'

দারোগাও হেসে ফেললেন। 'কি আর বলব, আপা, চোর-ডাকাত নিয়ে কারবার করতে করতে আমাদের স্বভাবই হয়ে গেছে এ রকম। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করি না এখন।'

'ওর দলের লোকদের ধরা হয়েছে?'

'কক্সবাজারে যাদের পেয়েছি, ধরেছি। অন্য জায়গায়ও ধরার চেষ্টা চলছে। বাচ্চা আর মহিলাদের লুকিয়ে রাখার কয়েকটা ঘাঁটি আছে ওদের এখানে। পাহাড়ের মধ্যে আস্তানা করার জায়গার অভাব নেই। পাচার করারও সুবিধে। টেকনাফ দিয়ে মিয়ানমারে নিয়ে যায়। কিংবা নাফ নদী পেরিয়ে ভারতে। সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান করে দেয়।'

'উফ্, শয়তানের দল!'

'তো, যাই, আপা আজ। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।'

'আরে যাচ্ছেন কোথায়, বসুন। চা আসছে।'

কিশোর বলল, 'দারোগা সাহেব, সাফিয়ার লাশটাকে কি করেছে, বলেছে নাকি শিকদার?'

মুখ কালো হয়ে গেল দারোগার। 'লাশকাটা ঘরে নিয়ে নিজেই কাটাকুটি করে

এমন করে রেখেছিল লাশটাকে, যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

'খাইছে!' শিউরে উঠল মুসা, 'এ তো পিশাচ!' অসুখ অনেকটা কমেছে ওর। ঘন ঘন বাথরুমে যাওয়া বন্ধ হয়েছে।

আনমনে বিড়বিড় করলেন আয়না খালা, 'চেহারা দেখে মানুষ চেনা যায় না। এতদিন ধরে জানি ওকে। কত নিরীহ, ভালমানুষ ভেবেছি। ওর ভেতরে যে ইবলিস লুকিয়ে আছে, কে জানত!'

****

তিন গোয়েন্দা

মায়া নেকড়ে

রকিব হাসান

র‍্যাঞ্চহাউসে ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত ঘটনা।
কিসে যেন মেরে রেখে যায় গবাদি পশুগুলোকে।
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শটগান হাতে পাহারায়
বসলেন র‍্যাঞ্চের মালিক ডেভিড হুইটম্যান।
প্রচণ্ড ঝড়ের রাত। বিদ্যুতের আলোয় যা দেখলেন,
গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।
রূপকথার জানোয়ার জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে।
মানুষের মত হাত-পা, চেহারাটা নেকড়ের।
বড় বড় নখ। রোমশ শরীর।
ভয়ঙ্কর, অবিশ্বাস্য দৃশ্য!
তবে কি ইনডিয়ানদের কথাই ঠিক?
সত্যি আছে মায়ানেকড়ে?

জড়িয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
ভয়ঙ্কর পিশাচের তাড়া খেয়ে বুঝল,
প্রাণ বাঁচানো এবার সত্যি দায়।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তিন গোয়েন্দা মায়া নেকড়ে রকিব হাসান

তিন গোয়েন্দা
মায়া নেকড়ে
রকিব হাসান

কিশোর হরর

সেবা প্রকাশনী

এক

সকাল থেকেই ঝড়ের আভাস পাচ্ছেন ডেভিড হুইটম্যান। বিকেলের দিকে অস্থির হয়ে উঠল গবাদি পশুগুলো। অদ্ভুত সবজে আভা নিয়ে অস্ত গেছে সূর্য। অন্ধকার নামছে। বাতাসের গতি বেড়েছে। আর্তনাদ করছে যন্ত্রণাকাতর আহত মানুষের মত। মনটানার আকাশে বিদ্যুতের চমক। বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি। তবে নামল বলে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ডেভিড আর তাঁর ছেলে পিটার। কথা নেই মুখে। কান পেতে শুনছেন ঝড়ের শব্দ। খুনীর অপেক্ষায় আছেন। র‍্যাঞ্চে আসে ওটা পশু হত্যা করার জন্যে।

রাতের কালো আকাশকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল বিদ্যুতের একটা সর্পিল শিখা। বাজ পড়ল বিকট শব্দে। নামল বৃষ্টি। মুষলধারে। ঝোড়ো বাতাসের গতিও যেন বেড়ে গেল অনেক। সেই সঙ্গে নিভে গেল বাড়ির সমস্ত বাতি। ইলেকট্রিসিটি ফেল।

তাতে শঙ্কিত নন ডেভিড হুইটম্যান। জেনারেটর আছে। ইচ্ছে করলে চালাতে পারেন। চালালেন না। আলোর প্রয়োজন নেই আপাতত।

পাথরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। কমলা রঙের আভা ছড়িয়ে পড়েছে ঘর জুড়ে। চকচক করছে দেয়ালের ধার ঘেঁষে সাজিয়ে রাখা হান্টিং ট্রফিগুলোর কাঁচের চোখ। গ্রিজলি ভালুক, পার্বত্য সিংহ কুগার, নেকড়ে, র‍্যাটলস্নেক—এ সবই তাঁর ভয়ানক বিপদে ঝাঁপ দিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার জ্বলন্ত প্রমাণ। আজ রাতেও তিনি ওরকম বিজয়েরই আশা করছেন।

শব্দটা কানে এল হঠাৎ। চাপা গরগর ধ্বনি। গম্ভীর, ভয়াবহ সে শব্দের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কোন জন্তুর কথা জানেন না তিনি। অথচ এই এলাকায় এমন কোন বুনো জানোয়ার নেই, যেটাকে তিনি চেনেন না।

এগিয়ে আসছে শব্দ। কিছুতেই বুঝতে পারলেন না এ রকম শব্দ করে ওটা কোন জীব। তবে শিকারী প্রাণী, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রায়ই এসে গরু-ঘোড়া মেরে রেখে যায়।

অনেক মেরেছে। আজ রাতে আর ছাড়বেন না ওটাকে। উইনচেস্টার থার্টিন হান্ড্রেড ডিফেন্ডার শটগানের ম্যাগাজিনে টুয়েলভ-গজ কার্টিজ ভরে নিলেন দ্রুত।

ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে ভারি গর্জন করে উঠল জানোয়ারটা।

ঝট করে সেদিকে ঘুরে গেল পিটারের চোখ। বিদ্যুৎ চমকাল। নীলচে-সাদা তীব্র আলোয় ক্ষণিকের জন্যে দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সব। চোখে পড়ল না কিছু। বাবার দিকে ফিরল সে।

কিন্তু হুইটম্যানের নজর তখন অন্য দিকে, চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রহস্যময় জানোয়ারটাকে খুঁজে বের করার জন্যে।

আরও বেড়েছে ঝড়। বেদম দোলাচ্ছে র‍্যাঞ্চ হাউসের পাতা

ঝরে যাওয়া শূন্য ডালগুলোকে। কোরালের ভেতর অস্থির হয়ে উঠেছে গরুগুলো। ভয় পেয়েছে ভীষণ।

টর্চ আর বন্দুক হাতে আঙিনায় নামল পিতা-পুত্র। কোরালের দিকে পা বাড়াল। কাদা হয়ে গেছে মাটি। হুইটম্যানের গায়ে কাউবয়-স্টাইল ডাস্টার রেইনকোট। ফলে পানি লাগছে না শরীরে। কিন্তু পিটার তার জিনস আর গেঞ্জির ওপর পানি নিরোধক কিছু চাপায়নি। মুহূর্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল সে। কেঁপে উঠল। ঠাণ্ডায়, নাকি অচেনা বিপদে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে, ঠিক বোঝা গেল না।

ইঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দিলেন হুইটম্যান, গোলাঘরের বাঁ দিকে যাচ্ছেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল পিটার। ডানে রওনা হলো সে।

*

গোঁ-গোঁ শব্দটা কানে আসতে স্থির হয়ে গেল পিটার। গোলাঘরের দিকে তাকাল। ভেতর থেকে আসছে শব্দ। পা টিপে টিপে খোলা দরজার দিকে এগোল সে। দুরুদুরু করছে বুক।

শটগানটা শক্ত করে বগলে চেপে ধরে দরজায় টর্চের আলো ফেলল। ঢুকে পড়ল গোলাঘরে। ওর প্রিয় খড়ের মিষ্টি গন্ধ আর ঘোড়াগুলোর পরিচিত শব্দ অনেকটা স্বস্তি এনে দিল মনে। ঘোড়া বাঁধার স্টলগুলোর দিকে তাকাল। ভয় পেয়েছে জানোয়ারগুলো। মারা পড়েনি এখনও কোনটা। ঝড় এলে অস্থির হয় ওরা। কিন্তু এখন যে ঝড়ের জন্যে এমন করছে না, সেটা বোঝা গেল। ভয় পেয়েছে অন্য কারণে।

সাবধানে ঘরের বাকি অংশে চোখ বোলাল সে। ভারি হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। ঘন ঘন দম নিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল।

ওর পেছনে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে একটা জানোয়ার। শরীরের গঠন মানুষের মত। হাঁটেও দুপায়ে। কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর। মাংসাশী জানোয়ারের মত বড় বড় দাঁত আছে, ধারাল নখও আছে।

দেখতে পেল না পিটার। গোলাঘরে কিছু নেই ভেবে বেরিয়ে এল সে। খানিক দূরে কালোমত কি যেন একটা পড়ে আছে মাটিতে। সেদিকে এগোল।

পেছন থেকে ওর গতিবিধি লক্ষ করতে থাকল রক্তলাল দুটো ভয়ঙ্কর চোখ।

কালো জিনিসটার ওপর আলো ফেলল পিটার। ধক করে উঠল বুক। একটা গরু মরে পড়ে আছে। কণ্ঠনালী দুই ভাগ। গায়ের চামড়া ফালাফালা। আতঙ্কিত হয়ে মরা গরুটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে, এমন কি জানোয়ার ওটা, এতবড় একটা গরুর এই অবস্থা করতে পারে!

ঠিক ওর পেছনে চাপা গরগর শোনা গেল।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সে। আলো পড়ল জীবটার টকটকে লাল চোখে। অনেক কাছে চলে এসেছে।

বন্দুক তোলার সময়ই পেল না সে। প্রচণ্ড এক থাবা এসে পড়ল কাঁধে। লাটিমের মত পাক খেয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল সে। হাত থেকে উড়ে চলে গেল টর্চ, বন্দুক। টের পেল দুহাতে ধরে শূন্যে

তুলে ফেলা হচ্ছে ওকে। ছুঁড়ে দেয়া হলো ছোট্ট পুতুলের মত।

কোরালের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়ল সে। শক্ত কিছুতে ঠুকে গেল মাথা। জ্ঞান হারানোর আগে কানে এল ক্রুদ্ধ গর্জন। তারপর সব অন্ধকার।

*

গোলার দিক থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ কানে আসতে দৌড় দিলেন হুইটম্যান। ভাবলেন গরুগুলো আক্রান্ত হয়েছে। জ্বলে উঠলেন রাগে। বড় বাড় বেড়েছে। আজ শয়তানটার শেষ দেখে ছাড়বেন।

চোখে পড়ল জানোয়ারটাকে। স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। এ কোন জীব! মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে দুপায়ে ভর করে। গায়ে বড় বড় পশম, অনেকটা ভালুকের মত। দুহাতে পিটারকে তুলে ধরেছে। ছুঁড়ে মারল বেড়ার দিকে। আবার ধরার জন্যে এগোতে শুরু করল।

মুহূর্তে বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেল তাঁর। বন্দুক তুলে গুলি চালালেন।

ঝটকা দিয়ে পেছনে বাঁকা হয়ে গেল জানোয়ারটার শরীর। দাঁড়িয়ে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল এক সেকেন্ড। তারপর মাটিতে পড়ে সামান্য ছটফট করে স্থির হয়ে গেল।

দৌড়ে গিয়ে ছেলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন হুইটম্যান। কতটা জখম হয়েছে টর্চের আলোয় দেখতে শুরু করলেন। রক্ত ঝরছে পিটারের কাঁধের একটা ক্ষত থেকে। বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এমন করে নেতিয়ে পড়ে আছে যেন মরে গেছে।

শঙ্কিত হয়ে ছেলের একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলেন হুইটম্যান। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। না, বেঁচেই আছে।

নড়ে উঠল পিটার। জ্ঞান ফিরছে।

চোখ মেলে বাবাকে দেখেই তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। ফোঁপাতে শুরু করল। এমন কাণ্ড দশ বছর বয়েসের পর আর করেনি কোনদিন। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল বাবাকে। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে।

ছেলেকে চেপে ধরে রাখলেন হুইটম্যান। জানোয়ারটা মরেছে কিনা দেখার জন্যে ফিরে তাকালেন। খুনে জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। অনেক সময় গুলি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। মরে না। জ্ঞান ফিরলে পালানোর চেষ্টা করে, কিংবা ব্যথা আর ভীষণ রাগে দিশেহারা হয়ে আক্রমণ করে বসে শিকারীকে।

মাত্র দশ ফুট দূরে কোরালের বেড়ার কাছে পড়ে আছে ওটা। আরেকবার গুলি করার আগে মরেছে কিনা ভালমত দেখার জন্যে ওটার গায়ে টর্চের আলো ফেললেন হুইটম্যান। ফেলেই চক্ষু স্থির। এ কি দেখছেন! জানোয়ার ভেবে এ কাকে গুলি করেছেন!

জানোয়ার নয় ওটা। মানুষ। তরুণ এক ট্রেগো ইনডিয়ান। খালি গা। মাথায় লম্বা কালো চুল। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। পিটারের বয়েসী।

মনে হলো বাস্তবে নেই তিনি, দুঃস্বপ্ন দেখছেন। এ হতে পারে না। স্পষ্ট দেখেছেন ভালুকের মত রোমশ একটা জানোয়ার। গুলি খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল যখন ওটার শরীর, তখনও মানুষ মনে হয়নি। অথচ এখন দেখছেন মানুষ। এমনও যদি হয়, ধোঁকা দেয়ার জন্যে ভালুকের ছাল পড়ে এসে থাকে ছেলেটা, তাহলে ওই ছাল এখন কোথায়? পড়ে তো আছে একেবারে খালি গা একজন মানুষ।

ঘটনার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। এ কিভাবে সম্ভব? তাড়াহুড়া আর উত্তেজনায় এতটাই ভুল দেখেছেন যে মানুষকে জানোয়ার ভেবে গুলি চালিয়েছেন? অসম্ভব! তা ছাড়া গরুটাকেই বা ওভাবে ছিন্নভিন্ন করল কে? মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অত শক্তিশালী দাঁত আর নখ মানুষের নেই।

তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—মানুষ খুন করেছেন তিনি।

দুই

দুদিন পর। উত্তর-পশ্চিম মনটানার বিমান বন্দরে নামল তিন গোয়েন্দা। হল ব্ল্যাকভালচার নামে এক ট্রেগো ইনডিয়ান তরুণের খুনের রহস্যের তদন্ত করতে এসেছে ওরা। প্রথমে যাবে থ্রী সার্কেল র‍্যাঞ্চে। ওটার মালিক ডেভিড হুইটম্যান বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের বন্ধু। কিছুদিন আগে এই র‍্যাঞ্চে একটা ছবির শূটিং করে গেছেন তিনি। তিন গোয়েন্দার কাহিনী নিয়েই ছবিটা বানিয়েছিলেন। তাই ওদের নামটা ভালমতই জানা মিস্টার হুইটম্যানের। অদ্ভুত, রহস্যজনক ঘটনাটা তদন্তের জন্যে তাই প্রথমেই মাথায় এসেছে তিন গোয়েন্দার কথা। দেরি করেননি আর। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফারকে।

বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সি ভাড়া নিল ওরা। ড্রাইভার নিলে আলাদা খরচ। ঝামেলাও আছে। তাই শুধু গাড়িটাই নিল। ওরাই চালাতে পারবে। মুসা বসেছে ড্রাইভিং সীটে। সরু একটা কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। ম্যাপ আছে সঙ্গে। র‍্যাঞ্চের পথ চিনে নিতে কোন অসুবিধে নেই।

ওর পাশে বসেছে কিশোর। কোলের ওপর ম্যাপ ছড়ানো।

কিন্তু সেদিকে চোখ নেই। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আনমনে বিড়বিড় করল, 'আল্লিব্বাবা, কত্তবড় এলাকা!' মিস্টার ক্রিস্টোফারের মুখে শুনেছে র‍্যাঞ্চের বিবরণ। 'এতটা ভাবিনি!'

'হবে না,' পেছন থেকে বলল রবিন, 'পাঁচ হাজার একর। এই এলাকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ। আয়ও তেমনি। ভাবলে না কেন?'

'ইয়ে...ভেবেছি...আসলে চোখে না দেখলে অনেক কিছু ঠিকমত অনুমান করা যায় না।'

'বাড়িটা তো লাগছে আমার কাছে হান্টিং লজের মত,' কাঠের তৈরি দোতলা র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

গেটে গাড়ির শব্দ শুনে দরজায় বেরিয়ে এলেন ডেভিড হুইটম্যান। লিভিং রুমে এনে বসালেন ওদের। সারা ঘরে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। পাথরের ফায়ারপ্লেস, উঁচু গম্বুজ আকৃতির ছাত, বিশাল পিকচার উইনডো—বিশেষভাবে তৈরি জানালা, যেটা দিয়ে র‍্যাঞ্চের পাহাড়ী এলাকার অনেকখানি চোখে পড়ে।

ধনী লোক হুইটম্যান। বেশির ভাগ র‍্যাঞ্চারেরই এত বিলাসী জীবন যাপনের টাকা নেই।

বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। মাথায় ঝাঁকড়া চুল ধূসর হয়ে এসেছে। পুরু গোঁফ। কালো চোখে অসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মেদহীন, রোদেপোড়া শরীর দেখেই বোঝা যায় ঘরের চেয়ে বাইরেই কাটিয়েছেন তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময়। যত বড় বিপদই আসুক, মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা আছে। পিটার আর নিজের আইনজীবী ওয়ারেন ব্ল্যাকের সঙ্গে তিন গোয়েন্দার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুদর্শন চেহারার তরুণ পিটার। বাপের মত বুনো নয়। অনেক বেশি শান্ত স্বভাবের। কিছুটা বিষণ্ন।

লিভিং রুমে বসল সবাই। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ম্যানটেলে রাখা একটা ঘড়ি আর কিছু ছবি—ফটোগ্রাফ। ঘরটা গরম। আরামদায়ক হলেও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কিশোর। এর কারণ জানোয়ারগুলো।

বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর, মিস্টার হুইটম্যান যতটা না র‍্যাঞ্চার, তারচেয়ে অনেক বেশি শিকারী। ট্রফিতে বোঝাই করে রেখেছেন ঘর। এককোণে থাবা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা গ্রিজলি ভালুক, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। বিশাল এক হর্নড আউল ডানা ছড়িয়ে রেখেছে ছাতের কাছে। মাথার পালক শিঙের মত উঁচু হয়ে থাকে বলে এ রকম নাম হয়েছে এই পেঁচার। কফি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্যাজার। বুককেসের ওপরে দাঁড়ানো একটা শেয়াল। এককোণে দাঁত খিঁচিয়ে রেখেছে একটা নেকড়ে। ভঙ্গি দেখে মনে হয় লাফ দিয়ে পড়বে ঘাড়ে। চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওদের কতগুলো মৃত জানোয়ার, কিশোরের অস্বস্তির কারণ এটাই।

আইনজীবী ওয়ারেনের পাশে বসল সে। মুসা আর রবিন উল্টোদিকে, কফি টেবিলটার পাশে। পিটার দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবার পেছনে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন হুইটম্যান। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে একে একে তাকালেন তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে। বললেন, 'আমি খুনী নই...'

ট্রফিগুলো রবিনেরও ভাল লাগছে না। মুসারও নয়। কিশোরের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, 'এতগুলো প্রাণী হত্যা করেছেন, তারপরও বলছেন খুনী নন? মানুষ খুন করলেই কি শুধু খুনী হয়?'

'কোন মানুষের ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার কোনকালে ছিল না,' বলে চলেছেন তিনি। 'বিরক্ত করে ফেলা হয়েছিল আমাকে। একের পর এক গরু মারছিল। গত মাসেই মেরেছে চারটে। শেষে পাহারায় বসলাম। তারপরেও যদি দেখতাম মানুষের কাজ, কিছুতেই গুলি করতাম না ওকে।'

'কার...মানে, কিসের কাজ বলে আপনার ধারণা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

থমকে দাঁড়ালেন হুইটম্যান। 'কিসের? সত্যি বলছি, বলতে পারব না। গরুগুলোকে কি রকম ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। আমাকে যদি কেউ এই উদ্ভট গল্প বলত, আমিও করতাম না।'

'এমন তো হতে পারে খুনগুলো ওই মানুষটাই করত, যাকে আপনি গুলি করে মেরেছেন। কোনও ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত, আলামত দেখে যাতে সবাই ভাবে হিংস্র জানোয়ারের কাজ?'

'তাহলে সেই অস্ত্রটা কোথায়? গুলি খাওয়ার আগেও তো একটা গরুকে মেরেছিল...একটা কথা অবশ্য ঠিক, ট্রেগোদের প্রচণ্ড আক্রোশ আমার ওপর। শুধু আমারই বা বলি কেন, সব আমেরিকানের ওপরই...'

বাধা দিলেন টাকমাথা, মধ্যবয়েসী, জ্যাকেট আর বোলো টাই পরা আইনজীবী, 'মিস্টার হুইটম্যান, মনে রাখবেন জামিনে মুক্তি

পেয়েছেন। সাবধানে কথা বলবেন এখন। বেফাঁস কিছু বলে বসবেন না, যেটা আপনার বিরুদ্ধে যায়।'

'আপনি কি ভাবছেন,' রবিন বলল, 'ট্রেগোরা বলবে ওদেরকে ঘৃণা করে বলে লোকটাকে গুলি করে মেরেছেন হুইটম্যান? তারপর বানিয়ে বলছেন জানোয়ার দেখে গুলি চালিয়েছিলেন তিনি?'

মুখ লাল হয়ে গেল আইনজীবীর। 'বলবে কি? বলা শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।'

'ওয়ারেন...' বলতে গেলেন হুইটম্যান।

তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন আবার আইনজীবী, 'আর একটা কথাও নয়! আইন...'

'ধ্যাত্তোরি, নিকুচি করি তোমার আইনের!' রেগে গেলেন হুইটম্যান। 'কিছুই যদি না বলি ওরা তদন্ত করবে কিভাবে? খোলাখুলি বলতে দাও আমাকে সব। আমি চাই, এই রহস্যের একটা কিনারা হোক।'

হুইটম্যানকে খারাপ মানুষ মনে হলো না কিশোরের। যতই জানোয়ার মেরে ট্রফি বানিয়ে ঘরে সাজিয়ে রাখার মত অমানবিক আর নিষ্ঠুর কাজ করুন না কেন, মানুষ খুন করার মত মানসিকতা তাঁর হবে না। তারপর সেটাকে আবার মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে ধামাচাপা দেয়া...নাহ্, কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

মুসা আর রবিনের দিকে তাকালেন হুইটম্যান। কিশোরের দিকে ফিরলেন। 'তোমরা নিশ্চয় মনে করেছ স্রেফ দেখতে না পারার কারণে একজন ইনডিয়ান যুবককে খুন করেছি আমি?'

'ড্যাড, এ সব কথা ওদেরকে বলে লাভ কি?' পিটার বলল।

'আদালতেই তো সব সমস্যার সমাধান করা যায়।'

'না, এত সহজ না ব্যাপারটা,' ওয়েনার বলল, 'কারণ মানুষ খুন করেছেন তোমার বাবা। তিনিই যে করেছেন, প্রমাণও হয়ে গেছে সেটা। লাশের গায়ে যে গুলি পাওয়া গেছে, সেটা তোমার বাবার বন্দুক থেকে ছোঁড়া। জানোয়ার ভেবে গুলি করেছেন তিনি, এ কথা বিশ্বাস করবে না আদালত...'

'না করলে আমি কি করব?' রেগে উঠলেন হুইটম্যান। 'মানুষকে গুলি করিনি আমি, করেছি জানোয়ারকে। আর এমন জানোয়ার জীবনে দেখিনি কখনও। পিটারকে আক্রমণ করেছিল ওটা। তার চিহ্ন এখনও আছে ওর গায়ে। দেখলেই বোঝা যায় নখের আঁচড়। সেটাও কি মিথ্যে বলছি নাকি?' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি, 'ইচ্ছে করলে দেখতে পারো। পিটার, দেখাও তো।'

বুকের বোতাম খুলে শার্টের কলারটা একপাশে টেনে নামাল পিটার। কাঁধে কয়েকটা বিশ্রী ক্ষত। লম্বা হয়ে চিরে গেছে। অনেক সেলাই পড়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কিসের আঁচড় বোঝার উপায় নেই। এ রকম কিছুই যেন আশা করেছিল সে। বোঝাটা এত সহজই যদি হবে, রহস্যের সমাধান আগেই হয়ে যেত। ওদের ডেকে আনার প্রয়োজন মনে করতেন না হুইটম্যান।

'ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল তখন,' বললেন তিনি। 'একটা গর্জন শুনতে পেলাম। ভাবলাম গরুগুলোকে আক্রমণ করেছে। দেখতে গেলাম

আমি আর পিটার।' চেয়ারে বসে পড়লেন আবার হুইটম্যান। অস্থিরতা কিছুটা কমেছে। 'টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখেছি টকটকে লাল চোখ, নেকড়ের মত দাঁত, আর ভালুকের মত রোমশ পিঠ। একেবারে জানোয়ার। মানুষের কোন চেহারাই ছিল না। মরার পর কি করে যে মানুষ হয়ে গেল...'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। রবিনের চোখে বিস্ময়। মুসার কোন ভাবান্তর নেই। কারণ সে নিশ্চিত জানে—কি দেখেছেন হুইটম্যান। ভূত! ভূতের পক্ষে সবই সম্ভব। অতএব এর মধ্যে সাংঘাতিক কোন রহস্য দেখতে পাচ্ছে না সে।

'তক্ষুণি গুলি করে না মারলে পিটারকে খুন করে ফেলত ওটা,' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন হুইটম্যান। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ইনডিয়ান ছেলেটাকে খুন করে কি যে কষ্ট হচ্ছে আমার বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু ওকে দেখে তো গুলি করিনি আমি। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বৃষ্টির মধ্যে ভুলভাল দেখেছি, এটাও বলা যাবে না। তাহলে গরুটাকে মারল কে? পিটারকে জখম করল কে? যেভাবে বেড়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলল ওকে, কোন মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব না। এত জোর নেই মানুষের। বিশ্বাস করো, যদি চোখের সামনেও দেখতাম গরু মারছে কোন ইনডিয়ান ছেলে, তাকে গুলি করতাম না আমি। গরু মারার অপরাধে মানুষ মেরে প্রতিশোধ নেব, এতটা পিশাচ আমি নই।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হুইটম্যানের দুঃখটা আন্তরিক। মানুষ জানলে সত্যি তিনি গুলি করতেন না। কিন্তু কাকে দেখেছেন সেরাতে? কোন্ ধরনের জানোয়ারকে গুলি করেছেন? তাতে

ইনডিয়ান ছেলেটা মারা পড়ল কিভাবে?

অদ্ভুত রহস্য!

রবিনও একই কথা ভাবছে। কিশোরের দিকে তাকাল। তার চোখে নীরব জিজ্ঞাসা—হুইটম্যানের কথা বিশ্বাস করেছ তুমি?

আস্তে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ও নিশ্চিত, হুইটম্যান সত্যি কথা বলছেন।

তিন

হল ব্ল্যাক ভালচারের মৃত্যু নিয়ে লেখা পুলিশ রিপোর্টের কপি উকিলের কাছ থেকে নিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে রবিন। তাতে মনে হয় অতি সাধারণ একটা কেস। কোন রহস্য নেই এর মধ্যে। অন্ধকারে ভুল করে জানোয়ার ভেবে মানুষ মেরেছেন হুইটম্যান।

মুসার কাছেও এটা অতি সাধারণ কেস। তবে তার ব্যাখ্যাটা অন্য রকম। এটা পুরোপুরি ভূতুড়ে কাণ্ড। একটা ভূত আছে এই র‍্যাঞ্চে। যত অঘটন ওটাই ঘটিয়ে আসছিল। হলের দুর্ভাগ্য, কোন কারণে সেরাতে ঢুকে পড়েছিল র‍্যাঞ্চের মধ্যে। চুরি করার জন্যেও হতে পারে। যাই হোক, ভূতটা যখন পিটারকে আক্রমণ করল, তখন ভয় পেয়ে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে ওদিক দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল সে। ভূতকে লক্ষ করেই গুলি চালান হুইটম্যান। সামনে পড়ে যায় হল। ভূতের গায়ে তো আর গুলি লাগে না, আর লাগলেও কিছু হয় না; সেটা গিয়ে লাগে হলের গায়ে। মারা যায় বেচারা।

চুপচাপ মুসার কথা শুনল কিশোর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হুইটম্যানকে বলল, 'কোরালটা একবার দেখতে পারি?'

'চলো,' পিটার বলল, 'আমি দেখাচ্ছি।'

একটা জ্যাকেট গায়ে দিল সে। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। রেইন কোটের কলার তুলে দিল রবিন। বাতাসে পাইনের গন্ধ। লস অ্যাঞ্জেলেসে এখন গরম। আর এখানে এই রকি মাউনটেইনের কাছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভেজা আবহাওয়া। যেন শীতকাল।

পিটারের সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ পাওয়াতে খুশি হলো সে। দুই হুইটম্যানের মধ্যে সে-ই কোমল মনের মানুষ। বাপের মত রুক্ষ, কর্কশ নয়, বেপরোয়া নয়।

বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে এল ওদেরকে পিটার। দাঁড়িয়ে গেল। ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'কিশোর, একটা কথা, ঘটনাটা যা ঘটেছে আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। বাবা সব বলেনি তোমাদের। বললে পাগল ঠাওরাবে, তাই বলেনি। মুসা যে বলেছে র‍্যাঞ্চে ভূত আছে, একেবারে ভুল বলেনি।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

আবার দ্বিধা করল পিটার। তারপর দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব ঝেড়ে ফেলে বলল, 'গত কয়েক মাস ধরেই পশু খুনের ঘটনা ঘটছে র‍্যাঞ্চে। রাতে গরু-ঘোড়ার উত্তেজিত ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে দেখি কিছু নেই। অথচ কিছু একটা দেখে যে ওরকম করেছে ওরা সেটার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মরে পড়ে থেকেছে কোন গরু অথবা ঘোড়া।...এই অঞ্চলে খুনী জানোয়ার বলতে আছে কুগার আর কায়োট। গ্রিজলিও মাঝেসাঝে র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ওগুলোর চিহ্ন তো দেখিইনি,

এমনকি কোন ট্রেগোর ছায়াও না।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। ঠাণ্ডা বাতাসে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। 'কিছুই দেখিনি,' আবার বলল সে, 'কিন্তু অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে, যার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না। আড়াল থেকে কেউ যেন তাকিয়ে দেখেছে আমাদের। নিশাচর সমস্ত প্রাণীর ডাকাডাকি তখন বন্ধ। বাতাসও মনে হয়েছে থেমে গেছে। যেন সমস্ত প্রকৃতি কোন অজানা ভয়ে জবুথুবু।'

এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল পিটার, বলতে যেন লজ্জা পাচ্ছে। অবশেষে বলেই ফেলল, 'সত্যি কথাটাই বলি, ভয় পেতাম আমি।'

'ভয়?'

'হ্যাঁ, প্রচণ্ড ভয়। ভূতের ভয় কখনও পেয়েছ তুমি? কেমন লাগে বোঝো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ভূতের ভয় না পেলেও কোন কারণে বেশি ভয় পেলে কেমন লাগে জানি।'

ভয়ের ধরনধারণ নিয়ে আলোচনার চেয়ে তদন্ত করার দিকে মনোযোগ দিল সে। পিটারকে অনুরোধ করল কোরালে নিয়ে যেতে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই সূত্র খুঁজতে লাগল ওরা।

পুলিশ রিপোর্টটা মন দিয়ে পড়েছে রবিন। খুঁটিনাটি সব মনে আছে। মিলিয়ে দেখল এখন। কোন কিছু চোখ এড়ায়নি পুলিশের। নতুন কিছু দেখতে পেল না। বেড়ার এক জায়গায় ভাঙা। ওখানে

দাঁড়াল। পিটার জানাল, এখানটাতেই ওকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

মুসাকে নিয়ে পিটার গিয়ে দাঁড়াল কর্দমাক্ত কোরালের অন্য পাশে। মুসার কিছু চোখে পড়ল না। ভূতকে দায়ী করে বসে আছে। অতএব সূত্র খোঁজায় কোন আগ্রহ নেই। এ সব ব্যাপারে পারদর্শীও নয় সে। আগ্রহ না থাকার এটা আরেকটা কারণ।

এমন ভঙ্গিতে পর্বতের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর যেন ধূসর চূড়াটা ওর সব প্রশ্নের জবাব দেবে।

ভাঙা বেড়াটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কিশোরকে ডাকল রবিন, 'এখানে গুলি খেয়েছে লোকটা। মাত্র তিন মিটার দূর থেকে গুলি চালিয়েছেন মিস্টার হুইটম্যান।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'এত কাছে থেকে মানুষকে জানোয়ার বলে ভুল করার কথা নয় কোনমতেই। অন্তত তাঁর মত অভিজ্ঞ শিকারীর।'

এগিয়ে এল কিশোর। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে।

'কিশোর,' পিটারের কান এড়িয়ে নিচু গলায় বলল রবিন, 'আসলেই মিথ্যে বলেননি তো হুইটম্যান? একের পর এক গরু মারা পড়ায় প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। ইনডিয়ানদের দেখতে পারেন না। রাতের বেলা কোরালের কাছে তাই একজন ইনডিয়ান যুবককে দেখে রাগে হুঁশ ছিল না। ভেবেছেন গরু চুরি করতে ঢুকেছে। দিয়েছেন গুলি মেরে। তারপর যখন হুঁশ হলো, অনুশোচনা জাগল। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে এক কাহিনী বানিয়ে বলে দিয়েছেন।'

'ট্রেগোদের মত করেই সন্দেহ করছি তুমি,' জবাব দিল কিশোর। 'হুইটম্যানকে অত খারাপ লোক মনে হয় না আমার। তাঁর

সম্পর্কে মিস্টার ক্রিস্টোফারেরও বেশ ভাল ধারণা। আজেবাজে লোক হলে মিশতেন না তিনি।'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

কাদার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। গরুর খুরের অসংখ্য দাগের মধ্যে বুটপরা একজন মানুষের পায়ের ছাপ। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

ভাল করে দেখার জন্যে হাঁটু মুড়ে বসল। বুটপরা ছাপের পাশে খালি পায়ের ছাপ। ছাপগুলো যেদিক থেকে এগিয়ে এসেছে, সেদিকে তাকাল। আটকে গেল দৃষ্টি। শুরুতে বড় বড় নখওয়ালা জানোয়ারের পায়ের ছাপ ছিল। অনেক বড় কোন জানোয়ার। সেটা বদলে গিয়ে হঠাৎ করে মানুষের খালি পা হয়ে গেছে।

মানুষ থেকে জন্তু! নাকি জন্তু থেকে মানুষ? আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য! শেষ পর্যন্ত ভূতে বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না নাকি?

কাঁধে ঝোলানো খাপ থেকে ক্যামেরা খুলে নিয়ে ছাপগুলোর কয়েকটা ছবি তুলল কিশোর। তারপর আরেকটা জিনিস চোখে পড়তে বিস্মিত হলো আরও।

হাত বাড়িয়ে দুই আঙুলে টিপে ধরে চকচকে এক টুকরো চামড়া তুলে নিল সে। অদ্ভুত জিনিস। একটা থাবা থেকে যেন খসে পড়েছে। থাবাটা অনেকটা মানুষের হাতের মত। আঙুলও পাঁচটা।

হাঁ হয়ে গেল রবিন।

চার

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। ভাড়াটে গাড়িতে চেপে চলেছে ওরা ট্রেগো ইনডিয়ান রিজারভেশনের দিকে।

পেছনে চুপচাপ বসে আছে রবিন। প্রকৃতি দেখছে। পথের দুধার থেকে শুকনো ঘাস রাস্তার কিনারে চেপে এসেছে। কোন বাড়িঘর নেই, পেট্রল পাম্প নেই, টেলিফোন পোল নেই। কালো পিচঢালা এই মহাসড়কটা না থাকলে ভাবাই যেত না এখানে কোনদিন সভ্য মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে। সামনে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রকি পর্বতের শৃঙ্গ—কালো, নিঃসঙ্গ।

পাশে বসা কিশোর। সেও তাকিয়ে দেখছে আশপাশের প্রকৃতি। সামনে সোজা এগিয়েছে রাস্তাটা। যেন এর শেষ নেই।

পশ্চিমের এই অঞ্চলে সব কিছুই যেন বিশাল, ছড়ানো। হুইটম্যানের থ্রী সার্কেল র‍্যাঞ্চের সীমানা শেষ হয়েছে রিজারভেশনের সীমানা যেখানে শুরু। রিজারভেশনে ঢুকে শহরের কেন্দ্রে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগবে, জেনে এসেছে ওরা।

ছোট একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে আজব চামড়ার টুকরোটা রেখেছে কিশোর। বের করে দেখতে লাগল।

'অদ্ভুত,' রবিন বলল। 'সাপের খোলসের মত।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জিনিসটা আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল।

'চামড়াটা কিসের, বলো তো?'

'জানি না।'

'সাপ ছাড়া তো আর কোন প্রাণী এ ভাবে খোলস ছাড়ে বলেও শুনিনি।'

'সাপের থাবা নেই।'

'সে কথাই তো বলছি। হলের লাশটা একবার আমাদের দেখা দরকার, কি বলো?'

'ওর কি থাবা আছে ভাবছ নাকি?' পথের দিক থেকে নজর সরাল না মুসা, 'তিন আঙুলওয়ালা থাবা? থাকুক আর না থাকুক, আমি দেখতে যাচ্ছি না।'

হাসল রবিন, 'ভয় পাচ্ছ?'

'সাধারণ লাশ হলে পেতাম না...'

'না দেখলে জানব কি করে ওর হাত থেকেই খসল কিনা চামড়াটা?'

'খসেনি, বাজি ধরে বলতে পারি। মানুষের হাত খোলস বদলায় না। দেখো, তোমরা যাই বলো, আগাগোড়াই ব্যাপারটা আমার কাছে ভূতুড়ে ঠেকছে। আর ভূতের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। অতএব...'

ওকে থামানোর জন্যে কিশোর বলল, 'লাশটা রিজারভেশন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।' পকেট হাতড়ে একটুকরো

কাগজ বের করল সে, তাতে একটা নাম লেখা। 'শেরিফ উইল বাজারের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের...'

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারে থেমে গেল সে। আকাশের দিকে তাকাল। খুব নিচুতে ডানা মেলে ভাসছে একটা ঈগল। মুসাকে বলল, 'সাইড করে রাখো তো গাড়িটা।'

'কেন?'

'ঈগল দেখব। এ পাখি লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখতে পাবে না।'

কিশোরের আচরণে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছে এখন তার দুই সহকারী। কখন, কোনটার মধ্যে যে কি করে বসবে সে, কোনও ঠিকঠিকানা নেই।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল কিশোর। মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা পর্বতের চূড়া। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একই রকম আছে। পরিবর্তন নেই। শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকায় আসার আগেরও অনেক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। চূড়ার ওপর স্থির হয়ে ঝুলে আছে কুয়াশা। কেমন রহস্যময়। সেদিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল ওর, ওখানে গেলেই যেন দেখতে পাবে পাথরযুগের মানুষ, ম্যামথ হাতি, দাঁতাল বাঘ...

পাহাড়ের ঢালে বনের গাছপালাকে নাড়া দিয়ে বয়ে গেল এক ঝলক জোরাল বাতাস। সূর্য ঢেকে দিল মেঘে। আবার ডেকে উঠল ঈগলটা। চিৎকার করে উড়ে গেল কতগুলো দাঁড়কাক।

মুসা এসে দাঁড়াল পাশে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জায়গাটাই ভূতুড়ে! বললে তো আর বিশ্বাস করো না। আমার মনে হচ্ছে কে যেন নজর রাখছে আমাদের ওপর। ওটার অস্তিত্ব টের

পাচ্ছি আমি।'

যেন শুনতেই পায়নি কিশোর। জবাব দিল না। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

'কিশোর!'

ফিরে তাকাল কিশোর।

'কোথায় চলে গেলে?'

'কই, এখানেই তো আছি।'

'আমার মনে হচ্ছে মেরুদণ্ডের মধ্যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে ইবলিস।'

'হুঁ?' শান্তকণ্ঠে জানতে চাইল কিশোর।

'মা বলে—যদি মেরুদণ্ড সুড়সুড় করে, তাহলে বুঝতে হবে ওটা শয়তানের কাজ।'

হাসল রবিন, 'তারমানে তোমার মধ্যে এখন শয়তান ঢুকে বসে আছে?'

'অত হাসার কিছু নেই। শয়তান সব সময় সবখানে থাকতে পারে।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কেউ কখনও নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গেছ?'

কোন্ কথা থেকে কোন কথা! রবিন আর মুসা দুজনেই অবাক।

রবিন বলল, 'না। কেন?'

'ওটার ভৌগোলিক ব্যাখ্যাটা জানো?'

এ সব লেখাপড়ার মধ্যে মুসা নেই। সে চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

রবিন জবাব দিল, 'দশ হাজার বছর আগে লেক ইরির বরফ

গলতে আরম্ভ করলে পানি ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ওনটারিও নদীতে পড়ার জন্যে ধেয়ে যায়। তাতেই তৈরি হয় নায়াগ্রা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমি গিয়েছিলাম একবার দেখতে। ওটার কাছে দাঁড়ালে এক ধরনের বিচিত্র অনুভূতি হয়। মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে চলে গেছি। এই জায়গাটাও আমার সে রকমই লাগছে। এই যে বন, পাহাড়, সমভূমি, সব দেখো, কেমন আদিম!'

'ইস্‌সিরে!' চোখমুখ কুঁচকে ফেলল মুসা, 'আমার মেরুদণ্ডের সুড়সুড়িটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনিতেই বাঁচি না ভূতের ভয়ে...'

কথা শেষ হলো না ওর। এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ঈগলটা। শাঁ করে নেমে এসে বসল গাড়ির হুডে। দুই পাখা দুদিকে ছড়ানো। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল তিন গোয়েন্দাকে। তারপর তীক্ষ্ণ একটা ডাক দিয়ে উড়ে চলে গেল।

মুসা বলল, 'দেখো বাপু, তোমরা যত যাই বলো, আমার ভাল্লাগছে না। এ সব অশুভ লক্ষণ। ইনডিয়ানরা বলে বাজপাখি আর ঈগলের মধ্যে ভর করেই ঘুরে বেড়ায় প্রেতাত্মারা। ওই পাখিটার রকম-সকম আমার একটুও ভাল লাগেনি। কিছু একটা ইঙ্গিত করে গেল।'

'ঘোড়ার ডিম করল!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন, 'ইনডিয়ানদের মত তোমার মাথায়ও আজগুবি সব চিন্তাভাবনা খেলতে আরম্ভ করেছে। আসলে গাড়ি দেখলেই নেমে আসে ওরা খাবারের লোভে। টুরিস্টরা দিয়ে দিয়ে অভ্যাস করিয়ে ফেলেছে।

একটা ম্যাগাজিনে পড়েছি আমি। ওটা কোন ইঙ্গিতই দিতে আসেনি। অতি সাধারণ একটা ঈগল। তবে হ্যাঁ, দুষ্প্রাপ্য বলতে পারো। শেষ হয়ে আসছে এদের প্রজাতি...'

'অনেক দেখলাম,' কিশোর বলল। 'চলো এবার যাওয়া যাক।' গাড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

পাঁচ

বহুমাইল বুনোপথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে ট্রেগো রিজারভেশনের মাঝখানে ছোট্ট শহরটাতে ঢুকল ওদের গাড়ি। রাস্তা বেশ চওড়া। কিন্তু কাঁচা বলে বৃষ্টিতে কাদা হয়ে গেছে। একধারে সারি দিয়ে রাখা ট্রেলারহোম আর ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। অন্যধারে বাণিজ্য কেন্দ্র: একটা বড় দোকান, পোস্ট অফিস, পুল হল, এ সব।

কয়েকটা পিকআপ ট্রাক আর গোটা দুই মোটর সাইকেল দেখা গেল। একটা ডিশ অ্যান্টেনাও আছে। আর আছে কুকুর। প্রচুর কুকুরের ছড়াছড়ি। পথচারীদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে কিছু, কিছু দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে খামখেয়ালী ভাবে। বিলাসিতার তেমন কোন নিদর্শন চোখে পড়ল না। রিজারভেশনের ভেতর যে ট্রেগোরা থাকে, তাদের কেউ ধনী নয়। আয় খুব কম।

পার্কিঙের জায়গার অভাব নেই। পথের পাশে গাড়ি রাখল মুসা। রবিন তাকাল কিশোরের দিকে, 'কোনখান থেকে শুরু করব?'

'পুল হলটা থেকে,' বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর।

পুল হলের ভেতরে আবছা অন্ধকার। জানালাগুলোর খড়খড়ি

কাউন্টারের ওপরে একটা নিয়ন আলো জ্বলছে। চোখে
নামানো। কাউন্টারের ওপরে একটা নিয়ন আলো জ্বলছে। চোখে আলো সয়ে এলে দেখা গেল তিনটে বড় বড় ঘর। প্রচুর চেয়ার টেবিল। মাঝখান দিয়ে হাঁটার জায়গা খুব সামান্য। পাশের ঘরে একটা নড়বড়ে পুল টেবিল, সবুজ কাপড়ে ঢাকা। একটিমাত্র বাল্ব জ্বলছে ওপরে। খোলা। শেড নেই। জিনসের প্যান্ট আর ফ্লানেলের শার্ট পরা এক তরুণী বিলিয়ার্ড টেবিল সামলাচ্ছে। কাউন্টারের পেছনের একটা ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজনা বাজছে বিকট শব্দে। ড্রামের ধ্রিড়িম ধ্রিড়িমটাই কানে লাগে বেশি। ধোঁয়া, কফি আর উলের কাপড়ের গন্ধে বাতাস ভারি।

দিনের মাঝামাঝি সময় এটা। সাধারণত এ সময়ে আড্ডা দিতে কিংবা জুয়া খেলতে আসে না লোকে, তবে সেটা লস অ্যাঞ্জেলেসের মত শহরে। ওসব জায়গায় এ সময় থাকে কাজের ব্যস্ততা। কিন্তু এখানে কারও কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং বসে বসে অলস সময় কাটানো ছাড়া করার আর কিছু নেই। চেয়ারগুলো প্রায় সবই দখল হয়ে গেছে। তিন গোয়েন্দা বাদে সবাই ইনডিয়ান।

ওরা বারের দিকে এগোতেই ইচ্ছে করে একজন লোক ধাক্কা লাগাল কিশোরের গায়ে। কিছু বলল না সে। এ হলো গায়ে-পড়ে ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা। সে কিছু বলতে গেলেই অপমান করে বসবে। গায়ে হাতও তুলতে পারে।

থেমে গেল বিলিয়ার্ড টেবিলের জুয়া খেলা। ওরা বিদেশী। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সবার। কেউ ভাল চোখে তাকাচ্ছে না। বহিরাগতরা এখানে স্বাগত নয়। গোয়েন্দারাও সেটা জানে।

জেনেশুনেই এসেছে। তাই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে গেল।

ইনডিয়ানরা যে বহিরাগতদের দেখতে পারে না, সেজন্যে ওদের দোষ দেয়া যায় না। শ্বেতাঙ্গরা এ দেশ দখল করে ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছে ওদের ওপর। সৃষ্টি করেছে এক মর্মান্তিক ইতিহাস। ওদের বাড়িছাড়া করেছে, ভূমিহীন করেছে, খুন করেছে পাইকারি হারে। তারপর থেকে বাইরের কাউকে—সে যে দেশেরই হোক, আর বিশ্বাস করে না ট্রেগোরা।

কাউন্টারের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে একজনকে কফি ঢেলে দিচ্ছে একজন ওয়েইটার।

ওর কাছে গিয়ে কেশে গলা পরিষ্কার করে কিশোর বলল, 'এক্সকিউজ মী। আমরা বিদেশী। শেরিফ উইল বারজারকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

জবাব দিল না লোকটা। কফি ঢালা শেষ করে সরে গেল ওখান থেকে। ক্যাসেট প্লেয়ারে জনি ক্যাশের সুরেলা কণ্ঠের গান ছাড়া ঘরে আর কোন শব্দ নেই।

'আপনারা কেউ কি শেরিফ উইল বারজারকে চেনেন?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল কিশোর যাতে ঘরের সবাই শুনতে পায়।

কেউ জবাব দিল না।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কিশোর। তাকাতে লাগল সবার মুখের দিকে। ছোট্ট শহর। লোক সংখ্যা খুব কম। শেরিফকে না চেনার কথা নয় কারও। এদের মধ্যে এখন কে মুখ খোলে দেখা যাক।

এককোণে বসে আছে কয়েকজন তরুণ। এমন ভঙ্গি করছে যেন তিন গোয়েন্দার অস্তিত্বই নেই ঘরে। ওদের সবার পরনে ডেনিম জ্যাকেট আর হেভি-মেটাল টি-শার্ট।

জুয়ার বোর্ড ঘোরাচ্ছিল যে মেয়েটা সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লম্বা, বাদামী চুল ওর। আত্মবিশ্বাসে ভরা মুখ। শানিত দৃষ্টিতে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে।

নাহ্! নিরাশ হলো কিশোর। এখানে কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেবে না। বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল।

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল মুসা।

কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর। অপেক্ষা করতে লাগল সে।

অবশেষে একটা কম্পিত কণ্ঠ বলে উঠল: 'ভাল চাও তো বাড়ি ফিরে যাও। গোয়েন্দার প্রয়োজন নেই আমাদের।'

ছয়

ফিরে তাকাল কিশোর। ওর বাঁ পাশে অন্ধকার কোণে বসে আছে দুজন বুড়ো মানুষ। তাদেরই একজন কথাটা বলেছে। সেদিকে এগোল সে।

যে লোকটা কথা বলেছে তার লম্বা ধূসর চুল, চওড়া চোয়ালের হাড় আর তামাটে রঙের চামড়া। গায়ে উলের জ্যাকেট। নিচে ডেনিম শার্ট। গলায় একটা গোটার মালা। কি গাছের গোটা, চিনতে পারল না কিশোর। লোকটার চোখের দিকে তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়। এ ধরনের মানুষকে চেনে সে। অদ্ভুত রকম শান্ত। ভয় কাকে বলে জানে না এরা। জীবনে অভিজ্ঞতা প্রচুর।

লোকটা বিস্মিত করল কিশোরকে, 'আমাদের নাম জানলেন কি করে আপনি?'

'তোমরা যে গোয়েন্দা, সেটার গন্ধ এক মাইল দূর থেকেও পাওয়া যায়।'

'আপনার নাকের শক্তি সত্যিই অসাধারণ,' রসিকতা করে পরিবেশ হালকা করতে চাইল কিশোর।

সামান্যতম পরিবর্তন দেখা গেল না লোকটার চেহারায়, হালকা

হওয়া তো দূরের কথা। তেমনি গম্ভীর হয়ে থেকে জবাব দিল, 'উনিশশো তিয়াত্তর সালে আমি উনডেড নী-তে ছিলাম। অতএব পুলিশ আর গোয়েন্দার গন্ধ যে চিরকালের জন্যে নাকে লেগে থাকবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

না, আসলেও নেই। এই একটি কথাতেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল কিশোরের কাছে। কার সঙ্গে কথা বলছে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারল।

১৯৭৩ সালে ইনডিয়ানরা উনডেড নী গ্রামটা আচমকা দখল করে নেয় এবং একশো বছর আগে সেখানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক গণহত্যার প্রতিবাদ জানায় আমেরিকান সরকারের কাছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেয় সরকার। আইন সংস্থার লোকজন দিয়ে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করে। বায়াত্তর দিন পর আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় ইনডিয়ানরা। খবরটা চাপা থাকেনি। জেনে যায় দেশের লোকে। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

'তখন কিছু মানুষ আমাদের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও,' লোকটা বলল, 'বেশির ভাগ ছিল বিপক্ষে। কারণ ওরা এ দেশের কেউ নয়, বিদেশী। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। জোর করে দেশটাকে নিজেদের বানিয়ে নিয়েছে। নিজেদের বলে আমেরিকান, আর আমরা যারা আসল বাসিন্দা, তাদের নেটিভ। কেউ কেউ সৌজন্য দেখিয়ে বলে নেটিভ আমেরিকান। সেটা শুনলে আরও পিত্তি জ্বলে। সুতরাং বুঝতেই পারছ বিদেশীদের পছন্দ না করার যথেষ্ট কারণ আছে আমাদের।'

'আমাকে বিদেশী না ভেবে সহজেই আপনাদের দলে টেনে

নিতে পারেন।'

'তোমরা ইনডিয়ান নও।'

'না হলেও আপনাদের চেয়ে কম ভুক্তভোগী নই। বিদেশীরা দেশ দখল করে স্থানীয়দের ওপর যে কি শয়তানীটা করে, সেটা ভালমত জানা আছে আমাদের। আমার পূর্বপুরুষরা আপনাদের মতই অত্যাচারিত ছিল। অতিষ্ঠ করে ফেলা হয়েছিল তাদের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য টিকতে পারেনি বিদেশীরা। তল্পি গুটিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।'

আগ্রহ দেখা গেল লোকটার চোখে। 'মানে? কোন দেশের কথা বলছ?'

'বাংলাদেশ। আমি বাংলাদেশী। প্রথমে গোটা ভারতবর্ষ ছিল আমাদের দেশ। ইংরেজরা বাণিজ্য করার ছুতোয় সেখানে ঢুকে সেটা দখল করে নিল। পুরো দুশো বছর রাজত্ব চালাল। তারপর যেতে বাধ্য হলো। পাকিস্তান আর ভারত, দুটো দেশের জন্ম হলো। আমাদের বাপ-দাদারা যেহেতু মুসলমান, পাকিস্তানে চলে গেল তারা। সেই পাকিস্তানের হলো আবার দুটো ভাগ—একটা পূর্ব, একটা পশ্চিম। আমাদের ভাগে পড়ল পূর্ব, কারণ বাপ-দাদারা বাঙালী। পশ্চিমারা এসে তাদের ওপর ইংরেজদের মতই শাসন আর অত্যাচার চালানো শুরু করল। শেষে বাঙালীরা খেপে গিয়ে ওদেরকেও তাড়াল। আবার ভাঙল দেশটা। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেল আরেকটা নতুন দেশ—বাংলাদেশ।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। চোখে স্বপ্ন। যেন নিজেদেরকেও ওভাবে মুক্ত করে স্বাধীন

ইনডিয়ান রাজ্যে বাস করার কথা ভাবছে। মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, তুমি আমাদের মতই। আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান। নিজেদের স্বাধীন করতে পেরেছ।' রবিন আর মুসার দিকে তাকাল, 'ওরা?'

মুসার দিকে ইঙ্গিত করে কিশোর বলল, 'ওর বাড়ি আফ্রিকায়। নিগ্রো। ওদের ওপর আরব, ইংরেজ, ফরাসি আর জার্মানরা কি অত্যাচার করেছে, শোনেননি? ওরা আমাদের চেয়েও বেশি অত্যাচারিত হয়েছে। আমাদের দেশের লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্তত কেউ কখনও গোলাম বানাতে পারেনি, নিগ্রোদেরকে তাও করা হয়েছে।' রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'আর ও আইরিশ। ট্রেগো ইনডিয়ানদের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ কোনকালে ছিল না ওই দেশের লোকের। কখনও দখল করতেও আসেনি। মোট কথা, আপনাদের শত্রু নয় ও। আরও একটা ব্যাপার, আমার আর মুসার চেয়ে ও আপনাদের বেশি আপনজন। কারণ ওর গায়ে মোহক ইনডিয়ানের রক্ত আছে।'

দীর্ঘ সময় ধরে এক এক করে তিনজনের ওপর নজর বোলাল বুড়ো। অনেকটা নরম হয়েছে দৃষ্টি। কিশোরের দিকে তাকাল আবার, 'কিন্তু তোমরা এখানে কেন এসেছ? উদ্দেশ্যটা কি?'

'আমার তো ধারণা সেটা আপনি ভাল করেই জানেন।'

'কি জানি, সেটাই বলো শুনি।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। চুপ করে আছে ওরা। জানে এ সব পরিস্থিতি ওদের চেয়ে ভাল সামাল দিতে পারে কিশোরই। তাই নিজেরা চুপ থেকে কথা বলার দায়িত্বটা ওর ওপরই ছেড়ে দিল।

সহকারীদের নীরব সম্মতি পেয়ে আবার বুড়োর দিকে ফিরল কিশোর। বলল, 'হল ব্ল্যাকভালচারের খুনের ব্যাপারে নতুন তথ্য দিতে পারে আমরা এমন একজনকে খুঁজছি।'

'তার জন্যে কষ্ট করে এতদূর আসার কি প্রয়োজন ছিল,' শান্তকণ্ঠে বলল বুড়ো। 'হুইটম্যানকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে। সে সব জানে। খুনটা যেহেতু সে করেছে, আর সবার চেয়ে জবাবও সে-ই ভাল দিতে পারবে।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল পুলের কাছে দাঁড়ানো মেয়েটা। চিৎকার করে উঠল, 'আসলে সবাই তোমরা মেরুদণ্ডহীন! জানো, হুইটম্যান খুন করেছে আমার ভাইকে, অথচ কেউ কিছু করছ না। তাকে গিয়ে কিছু বলার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই তোমাদের। কোন প্রতিবাদ নেই, মুখ বুজে সবাই সহ্য করে, এ কারণেই সাহস পেয়ে যায় ওই বিদেশীরা, অত্যাচার করে। নইলে আমাদেরই জায়গা দখল করে ও র‍্যাঞ্চ বানায় কিভাবে?'

'টিরানা, তুমি চুপ করো!' বুড়ো লোকটা বলল।

'চুপ তোমরা থাকো, আর পড়ে পড়ে মার খাও!' পাশে রাখা জ্যাকেটটা একটানে তুলে নিয়ে গটমট করে দরজার দিকে রওনা হলো মেয়েটা। তিন গোয়েন্দার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াল। তীব্র দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে, বনবেরালীর থুতু ছিটানোর ভঙ্গি করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

মেয়েটা বেরিয়ে যাওয়ার পর রবিনের চোখে পড়ল লোকটাকে। আরেকজন ইনডিয়ান। জ্যাকেট পরা। বুকে শেরিফের ব্যাজ। লম্বা। সুদর্শন। ধূসর হয়ে আসা চুল ব্যাকব্রাশ

করা। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীরবে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে।

'ওই যে শেরিফ,' প্রায় ফিসফিস করে দুই বন্ধুকে বলল রবিন।

এগিয়ে গেল কিশোর। হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা, আর ও রবিন।' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিয়ে বলল, 'আমরা শখের গোয়েন্দা।'

কার্ডটার দিকে একপলক তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। আগের মতই গম্ভীর। রিজার্ভেশনের অন্য ইনডিয়ানদের চেয়ে আলাদা মনে হলো না তাঁকে। সহযোগিতা করার কোন লক্ষণ নেই।

পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের একটা বিশেষ অনুরোধপত্র বের করে দেখাল কিশোর। তাঁর অফিস প্যাডে লেখা:

এরা জুনিয়র গোয়েন্দা। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের অনেক কাজে সহায়তা করে থাকে। আমেরিকার যে কোন অঞ্চলের পুলিশকে তদন্তের কাজে এদের সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিচে ক্যাপ্টেনের সই এবং সীল দুটোই আছে।

ওটা দেখেও তেমন ভাবান্তর হলো না শেরিফের। কাটা কাটা স্বরে শুধু বললেন, 'হলের লাশ আমার অফিসে আছে।'

ওদের আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বেরিয়ে গেলেন পুল হল থেকে।

শেরিফের কাছ থেকে এতটা শীতলতা আশা করেনি কিশোর। অবাকই হলো। চট করে একবার দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে রওনা হলো তাঁর পিছু পিছু।

সাত

খুব দ্রুত হাঁটেন শেরিফ। তাল রাখতে মুসাই হিমশিম খেয়ে গেল। পেছনে পড়ে গেল কিশোর আর রবিন।

পুরানো একটা কাঠের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সিঁড়ির ওপরে বারান্দা। তার ওপাশে দরজা। কাঁচের পাল্লা। তাতে লেখা:

TRIBAL POLICE OFFICE

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে দুজন ট্রেগো ইনডিয়ান। পাহারা দিচ্ছে। পরনে জিনস, গায়ে শার্টের ওপরে জ্যাকেট, পায়ে বুট। দুজনেরই লম্বা কালো চুল মেয়েদের মত বেণি করা। প্রতিটি বেণির মাথায় গিঁট, তাতে পাখির পালক গোঁজা। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের মুখ। সাদা রঙ মাখা। মনে হয় মুখোশ পরে আছে। ভূতুড়ে লাগে দেখতে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন শেরিফ। দরজা খুললেন।

কিশোর ওঠার জন্যে সিঁড়িতে পা রাখতেই দু'পাশ থেকে সরে এসে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল দুই প্রহরী।

ফিরে তাকিয়ে শেরিফ বললেন, 'ছেড়ে দাও। আসুক।' হাত

নেড়ে ছেলেদের ডাকলেন, 'এসো।'

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল প্রহরীরা। তারপর সরে দাঁড়াল।

লস অ্যাঞ্জেলেসের যে কোন পুলিশ স্টেশনের তুলনায় অফিসটা মোটেও আহামরি কিছু নয়। অতি সাধারণ বললেও ভুল হবে। বিশাল হলঘরও নেই, অসংখ্য পুলিশের লোক ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরিও করছে না। অনবরত ফোন বাজছে না। হাজার রকমের অভিযোগ নিয়ে লোক আসছে না, চিৎকার করে কথা বলছে না, সন্দেহভাজনদের ধরে এনে বিশেষ বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়নি। একজন লোকও নেই ভেতরে।

অতি সাধারণ ঘর। একটা মাত্র চেয়ার। একটা ফাইলিং কেবিনেট। এককোণে শূন্য হাজত। টেবিলে একটা কম্পিউটার আর একটা টেলিফোন রাখা।

টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বারজার। ডাকে আসা একগাদা চিঠিপত্রের দিকে তাকালেন।

বাইরের লোকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে কিশোর জানতে চাইল, 'ওরা কে?'

'গার্ডিয়ানস অভ দা ডেড,' জবাব দিলেন শেরিফ, 'মৃতের অভিভাবক। মৃতের আত্মাকে পাহারা দিয়ে পরপারে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ওদের।'

'পরপারে পৌঁছে দেবে মানে? ওরা কি ওখানে যেতে পারে নাকি?'

'সশরীরে তো আর পারে না, মনে মনে পারে,' টেবিলের ধার ঘুরে অন্যপাশে চলে গেলেন শেরিফ। 'যতক্ষণ না লাশের সৎকার

হবে, ওরা ওটার কাছ থেকে সরবে না। ভেতরেই ঢুকতে চেয়েছিল। আমি অনুমতি দিইনি।'

'আপনি এ সব বিশ্বাস করেন?'

'জাতে আমি ইনডিয়ান,' ঘুরিয়ে জবাব দিলেন শেরিফ, 'কিন্তু এখন আমি একজন পুলিশ অফিসার। অবাস্তব কোন কিছুতে পুলিশের বিশ্বাস থাকা উচিত নয়।'

'তার মানে হুইটম্যানের র‍্যাঞ্চে যে অদ্ভুত একটা জন্তু দেখা গেছে এটা আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'দেখো,' বললেন তিনি, 'আমি এখানকার পার্ক রেঞ্জার নই। জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে জানতে চাইলে ওদের কাছে যাও।'

'আপনি রেগে যাচ্ছেন...'

'না, রাগছি না। আমি পুলিশ, অপরাধীদের নিয়ে কারবার। জন্তু কোন অপরাধীর মধ্যে পড়ে না। তবে অনবরত যদি মানুষের ক্ষতি করতে থাকে, আমার কাছে রিপোর্ট আসে, কিছু একটা করতেই হয়...যাকগে, বেশি কথা বলার সময় নেই। আমার কাজ আছে,' চিঠিপত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন শেরিফ। 'লাশটা দেখতে চাও?'

সহকারীদের দিকে তাকাল কিশোর।

হলের লাশ দেখতে চায় না, আগেই বলে দিয়েছে মুসা। বাইরের দুই রঙমাখা ইনডিয়ান আরও ভড়কে দিয়েছে ওকে। মাথা নেড়ে মানা করে দিল।

ঘরের অন্যপাশের একটা দরজা খুলে দিলেন বারজার।

এগিয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

লম্বা টেবিলে শোয়ানো চাদরে ঢাকা একটা দেহ। পা বেরিয়ে আছে। এক পায়ের বুড়ো আঙুলে হাতে লেখা একটা কাগজের টুকরো বাঁধা। তাতে মৃতের নাম লেখা: হল ব্ল্যাকভালচার।

'পুল হলের সেই মেয়েটা এর কিছু হয় নাকি?' লাশের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'টিরানা?' শেরিফ বললেন, 'হ্যাঁ, ভাই-বোন। হুইটম্যানের সঙ্গে জায়গার সীমানা নিয়ে ওরা দুজনই প্রথম আপত্তি তোলে। ওদের অভিযোগ, হুইটম্যান তার গরু-ছাগলকে ঘাস খাওয়ানোর জন্যে রিজারভেশনের সীমানায় ঠেলে দেয়। এ সব নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি। শেষে আদালতে নালিশ করেছে হল আর টিরানা। এ জন্যেই ইনডিয়ানরা মনে করছে, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হলকে খুন করেছে হুইটম্যান।'

আস্তে করে মাথার কাছের চাদর টান দিয়ে সরাল কিশোর। সুদর্শন এক তরুণের লাশ। উঁচু কপাল। লম্বা, কালো চুল। খালি গা।

প্রথমেই চোখে পড়ল কাঁধের তিনটে লম্বা দাগ। অনেক আগের গভীর ক্ষত। শুকিয়ে গেছে।

বন্দুকের গুলি পিঠে লেগে পেট দিয়ে বেরিয়েছে। বিরাট গর্ত হয়ে আছে। রবিনের দিকে ফিরে বলল, 'পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছেন বারজার।

লাশের নিচের ঠোঁটটা টেনে নামাল কিশোর। দেখতে দেখতে মৃদু শিস দিয়ে উঠল। 'আশ্চর্য!'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি?'

লাশের দুটো ঠোঁটই যতটা সম্ভব ফাঁক করে দেখাল কিশোর, 'ভাল করে দেখো। বুঝতে পারবে।'

কৌতূহলী হয়ে শেরিফও এগিয়ে এলেন। দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। ওপরে-নিচে দুটো করে চারটে অদ্ভুত দাঁত গজিয়েছে। হলদে রঙের। প্রায় ইঞ্চিখানেক বড় একেকটা। শ্বদন্ত, অর্থাৎ, কুকুরে-দাঁত।

আট

রবিন বলল, 'আশ্চর্য! মানুষের এ রকম দাঁত গজানোর কথা তো শুনিনি কখনও!'

'শুনবে না কেন,' কিশোর বলল, 'ব্রাম স্টোকা.রর ড্রাকুলা পড়নি?'

'ও তো কল্পিত ভূত।'

'বাস্তব অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়,' রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। শেরিফের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ওর ডেন্টাল রিপোর্ট পাওয়া যাবে? এ সম্পর্কে ডাক্তারের বক্তব্য কি দেখতাম।'

'ও সব আর পাবে কোথায়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন শেরিফ, 'দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছে নাকি কোনকালে?'

রবিন বলল, 'বয়েসের তুলনায় শরীরে ক্যালসিয়াম ফসফেট সল্ট বেশি হয়ে গেলে নাকি...'

'ও সব না,' ওকে থামিয়ে দিল কিশোর। বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বোঝাল, 'মিস্টার হুইটম্যানের মত শিকারী ভুল দেখেছেন, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। সেরাতে কিছু তো

একটা নিশ্চয় দেখেছেন তিনি। সেটা কি?'

'আমারও ওই একই প্রশ্ন,' শেরিফ বললেন। 'হুইটম্যান ভেবেছিলেন কুগারের কাজ। ওই পার্বত্য সিংহগুলো গরু মারার ওস্তাদ। র‍্যাঞ্চারদের অনেক ক্ষতি করে। সেজন্যেই বন্দুক নিয়ে বসে ছিলেন।'

'কিন্তু কুগার বা ওই জাতীয় কিছু তো দেখেননি তিনি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'বরং অদ্ভুত এক জন্তুর ওপর গুলি চালিয়েছেন বলেছেন। ওটার গায়ে এতই জোর, তাঁর ছেলেকে তুলে নিয়ে বেড়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলেছিল।'

'জন্তুটার সঙ্গে নাকি ভালুকের মিল আছে,' রবিন বলল। 'গ্রিজলি ভালুক মানুষকে আক্রমণ করে, গায়েও অনেক জোর। পিটারকে আক্রমণ করেছিল, এ কথা মিথ্যা নয়। ওর গায়ে খামচির দাগ আছে।'

'তাহলে সেই ভালুকটা গেল কোথায়?'

'মানুষ দেখেই সটকে পড়েছিল ওটা। আর বন্দুকের সামনে পড়ে গিয়েছিল বেচারা হল। ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছেন মিস্টার হুইটম্যান। ফেরানোর উপায় ছিল না। গুলি লেগে গেছে হলের গায়ে। সেটা এখন আর স্বীকার করছেন না তিনি।'

'এগুলো অতি কল্পনা,' কিশোর বলল। 'পিটারকে আক্রমণ করল, আর হুইটম্যানকে দেখে সটকে পড়ল, এটা কোন যুক্তির কথা নয়।...দেখো, আর যাই হোক, মিস্টার হুইটম্যানকে মিথ্যুক মনে হয় না আমার।' শেরিফের দিকে তাকাল, 'এটা তো অপমৃত্যুর কেস। লাশের ময়না তদন্ত হবে না?'

মাথা নাড়লেন শেরিফ, 'না।'

'কেন?'

'ইনডিয়ানরা মৃতদেহ কাটাকুটি পছন্দ করে না।'

'কিন্তু এটা আইন। নিয়ম।'

'সেই আইন আর নিয়ম ইনডিয়ান রিজারভেশনের বাইরে চলে। এখানেও চলবে না তা বলছি না। আমি ইচ্ছে করলে পারি। কিন্তু করতে যাব না। কোন প্রয়োজন নেই। এখানে খুনী কে, সবাই জানে। খুনী নিজের মুখে স্বীকারও করেছে সেটা। খুনীকে পাকড়াও করার জন্যে সূত্র খোঁজার ঝামেলা নেই, অতএব ময়না তদন্তেরও দরকার নেই। শুধু শুধু এখানকার মানুষের মনে আঘাত দিতে চাই না আমি। এমনিতেই আমেরিকান সরকারের ওপর যথেষ্ট বিরক্ত ওরা।'

'ও,' হতাশ হলো কিশোর।

'ময়না তদন্তের কি প্রয়োজন? তুমি কি ভাবছিলে?'

'দেখতে চাইছিলাম দাঁতের মতই হার্ট, কিডনি, এ সবের মধ্যেও গোলমাল আছে কিনা।'

'যদি থাকে?'

'অবাক হব না। সূত্র পাওয়ারও আশা করছি।'

'কিসের?'

'জন্তু রহস্যের।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাচ্ছ তুমি। মানুষের ভুল হয়। হুইটম্যানও মানুষ, অতিমানব নন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভুল দেখতেই পারেন...এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা আমার মাথায়

আসছে না। যাই হোক, ময়না তদন্তের নির্দেশ আমি দিতে পারব না। সরি।'

'লাশটাকে তাহলে কি করা হবে এখন?'

'নিয়ে যাবে গার্ডিয়ানরা। সৎকার করবে।'

'কবে?'

'আজ রাতেই।'

'তারমানে সময় আছে। কোনভাবেই কি একটা ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারেন না?'

'না,' একমুহূর্ত ভাবলেন শেরিফ। 'খুলেই বলি। লাশ কাটাকুটি না করার পেছনে আরও একটা কারণ আছে। ট্রেগোদের বিশ্বাস, মরার সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় আত্মা। পরপারে গিয়ে নিজের দেহটা আস্ত দেখতে চায়। যদি দেখে নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে ভীষণ রেগে যায়। অস্থির হয়ে ওঠে। আর কোনমতেই শান্তি পায় না সে। দুষ্ট প্রেতে পরিণত হয় তখন। নিজের এলাকায় নেমে এসে অত্যাচার শুরু করে। আত্মীয়-পরিজন কাউকে রেহাই দেয় না।'

'এ সব কুসংস্কার বিশ্বাস করেন আপনি?'

'না করি না।'

'তাহলে?'

'যা বলার আগেই বলেছি। প্লীজ, আমাকে চাপাচাপি করো না,' অধৈর্য হয়ে উঠলেন শেরিফ।

রাগ লাগল কিশোরের, 'আপনার কি ধারণা এই ঘরের মধ্যে এখন হলের আত্মা বসে আছে? দেখছে সবকিছু?'

'বড় বেশি জেদি ছেলে তুমি,' কিছুটা নরম হয়ে এলেন শেরিফ। 'শোনো, পরিষ্কার করেই বলি—আজ যদি তোমাদের কথায় আমি এর শরীরটা কাটি, কিছু পাওয়া যাক আর না যাক, তোমরা হয়তো খুশি হবে, কিন্তু আমার হবে বিপদ। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। ওদের সংস্কারে বাদ সাধলে একঘরে করবে ওরা আমাকে। এখানে বাস করা তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে আমার জন্যে। খুনী যদি ধরা না পড়ত, কোন কিছুই কেয়ার করতাম না আমি। ময়না তদন্ত করাতাম। কিন্তু এখন তার কোন প্রয়োজন দেখি না। আর কাটলে তুমি যে নতুন কোন সূত্র পাবেই, তার নিশ্চয়তা কোথায়?'

নয়

অন্ধকার হওয়ার আগেই কবরখানার কাছে পৌঁছে গেল তিন গোয়েন্দা। গাঁয়ের কিনারে পাহাড়ের ওপর একটা খোলা জায়গায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দর জায়গা। পাহাড়ের ঢালে পাইনের বিশাল বন। তারও ওপরে চূড়ার কাছে ধূসর রঙের মেঘ জমে থাকে সর্বক্ষণ।

অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কাঠ আর ডালপাতা দিয়ে তৈরি আয়তাকার একটা মঞ্চে চিত করে শোয়ানো হয়েছে লাশ। সাদা কাপড়ে ঢাকা। সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দুই গার্ডিয়ান। শবদেহের চারপাশে ঘুরে ঘুরে একটা ঈগলের পালক দোলাচ্ছে নেকড়ের ছাল গায়ে দেয়া ওঝা।

ঈগলকে মহাক্ষমতাধর মনে করে ইনডিয়ানরা। আকাশের এত উঁচুতে আর উঠতে পারে না কোন প্রাণী। ওদের বিশ্বাস, ডানায় করে প্রার্থনা আর বিশেষ অনুরোধ মেঘের ওপারে প্রেতের রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারে শুধুমাত্র ঈগলই। সেজন্যে শব পোড়ানো অনুষ্ঠানে ঈগলের পালক ব্যবহার করাটা বাধ্যতামূলক।

আসতে শুরু করেছে শোকার্তরা। টিরানা এল কালো জিনস

আর কালো জ্যাকেট পরে। দাঁড়াল গিয়ে ভাইয়ের শবমঞ্চের কাছে।

গাড়িতে বসে দেখছে তিন গোয়েন্দা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে গোয়েন্দাপ্রধান। গভীর ভাবনা চলেছে তার মগজে। জানতে চাইল রবিন, 'কি ভাবছ?'

দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর ঘাড়ের পেছনে সীটের ওপাশের খালি জায়গায় ফেলে রাখা একটা কালো ব্রিফকেস টেনে নামাল। বের করল একটা ফাইল। ভেতরে আদিম টাইপ রাইটারে টাইপ করা হলদে হয়ে আসা কাগজের একটা পাণ্ডুলিপি।

'উনিশশো ছেচল্লিশ সালে বেশ কয়েকটা রহস্যময় খুন হয় এই অঞ্চলে, হুইটম্যান যেখানে র‍্যাঞ্চ করেছেন তার আশেপাশে। তদন্তের ভার পড়েছিল সেজউইক স্টোকস নামে এক গোয়েন্দার ওপর।' ফাইলটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'এ ফাইল তারই লেখা। পড়ে দেখো। চমকে যাবে।'

ফাইলের কুঁকড়ে যাওয়া পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল রবিন। 'কি লিখেছে?' পড়ায় মন বসাতে পারল না। আকর্ষণটা ইনডিয়ানদের অনুষ্ঠানের দিকে। মুসার নজরও সেদিকে। তবে কিশোর আর রবিনের কথায়ও কান আছে।

'আলামত দেখে মনে হয়েছে,' কিশোর বলল, 'খুনগুলো কোন হিংস্র বুনো জানোয়ারের কাজ। নখের আঁচড়ে ফালাফালা করেছে শিকারের শরীর। ভালুক বা কুগারেরও মানুষ মারার বদনাম আছে, কিন্তু ওদের খুন করার কায়দা অন্য রকম। ওই হত্যাকাণ্ডগুলোর

সঙ্গে মেলে না।'

ফিরে তাকাল মুসা, 'তাহলে কিসে মেরেছিল?'

'সেটাই রহস্য,' কিশোর বলল। 'হেইফার গুন নামে একটা লোককে সন্দেহ করল স্টোকস। কিন্তু কিভাবে খুনগুলো করে যায়, ধরতে পারল না। তার কথামত একরাতে গোপনে গিয়ে গুনের কেবিন ঘেরাও করে রাখল পুলিশ। রাত দুপুরে ঘর থেকে বেরোতে দেখল একটা অদ্ভুত জন্তুকে। পুলিশ ভাবল, ভালুকের ছালটাল বা ওই জাতীয় কিছু পরে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে পালানোর চেষ্টা করছে খুনী। সাবধান করল। থামতে বলল। কিন্তু থামল না জন্তুটা। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল। গুলি চালাল পুলিশ। মাটিতে পড়ে মরে গেল ওটা। কাছে গিয়ে পুলিশ দেখল হেইফার গুন মরে পড়ে আছে। খালি গা। ভালুকের ছালের চিহ্নমাত্রও নেই। তাজ্জব হয়ে গেল ওরা। এ রহস্যের কোন সমাধান করতে পারল না।'

'খাইছে! একেবারে হুইটম্যানের কিচ্ছা!' গলা কেঁপে উঠল মুসার।

'হ্যাঁ, তাই। তবে সেদিন থেকে মানুষ খুন বন্ধ হয়ে গেল। স্টোকসের মনে কিন্তু একটা খুঁতখুঁতি ভাব রয়েই গেল। খুন বন্ধ হয়েছে ঠিক, কিন্তু হেইফার গুন মরে গিয়ে রহস্যটাকে আরও জটিল করে রেখে গেছে। কি করে খুনগুলো করত সে, বুঝতে পারেনি স্টোকস,' টোকা দিয়ে নাকের ডগা থেকে একটা ছোট্ট পোকা ফেলল কিশোর। 'যাই হোক, ধীরে ধীরে ভুলে গেল লোকে ওই সব খুনের কথা।'

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল রবিনের। 'কিন্তু এই যে বলছে আট বছর পরে চুয়ান্ন সালে শুরু হয়েছিল আবার?'

'হ্যাঁ, চুয়ান্ন, বাষট্টি, সত্তর, আটাত্তর, ছিয়াশি, চুরানব্বই—প্রতি আট বছর পর পর ঘটতে থাকে ওই রহস্যময় খুন। খুনী সন্দেহে একজন করে মানুষ মারা পড়ার পর কয়েক বছরের জন্যে বন্ধ হয়। তারপর আবার শুরু।'

'কয়েক বছর মানে তো আট?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, একেবারে অঙ্কের হিসেবের মত। তদন্ত করতে গিয়ে আরেকটা বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করেছিল সেজউইক স্টোকস। পুলিশের পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে বের করেছিল, দেড়শো বছর আগেও এই অঞ্চলে এ ধরনের খুনখারাবি হয়েছে। তার আগের রেকর্ড আর নেই পুলিশ অফিসে। স্টোকসের ধারণা, থাকলে দেখা যেত আরও বহুকাল আগে থেকেই হয়ে আসছে ওধরনের খুন।'

'ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি!' মুসা বলল।

'স্টোকস একজন বাস্তববাদী মানুষ। ভূতুড়ে কাণ্ড বলে উল্লেখ করেনি কোথাও। তবে ব্যাখ্যা যেটা দিয়েছে, তাতে মনে হয় আধিভৌতিক কোন ব্যাপার ঘটতে দেখেছিল সে। বলেছে—এমন কিছু ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, যেগুলোর কারণ এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি মানুষ। তবে সেগুলোকে ভূতুড়ে বলা ঠিক হবে না।

ফাইলে কতগুলো ছবিও রয়েছে। পুরানো পত্রিকা থেকে ফটোকপি করে নিয়েছে কিশোর। একটা ছবি আছে অনেক

পুরানো, সেই ১৮০৫ সালের।

'এগুলো জোগাড় করলে কখন?' জানতে চাইল রবিন।

'ডেভিস ক্রিস্টোফার যেদিন ডেকে পাঠালেন, সব কথা বললেন, অবাক হলাম। মনে পড়ল এ ধরনের খুনের কথা আগে কোথাও পড়েছি। চলে গেলাম পত্রিকার অফিসে। মর্গ ঘেঁটে বের করেছি এগুলো।'

'আর ফাইলটা?'

'পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে। মিস্টার ভিকটর সাইমনের সহায়তায়।'

'কই, এ সব কথা তো আগে বলনি?'

'বলার সুযোগ পাইনি। তা ছাড়া ভেবেছি আমার সন্দেহ ঠিক নাহলে আর বলবই না।'

'এখন কি মনে হচ্ছে তোমার সন্দেহ ঠিক?'

'শিওর না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'হ্যাঁ, স্টোকস আরও কি লিখেছে শোনো। রেন এবং ইয়াং নামে দুই অভিযাত্রী এদিকের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালাতে গিয়ে একজন ইনিডয়ানের দেখা পায়। সে নাকি ইচ্ছেমত বদলে ফেলতে পারত নিজেকে। মানুষ থেকে নেকড়ে, আবার নেকড়ে থেকে মানুষ হয়ে যেতে পারত।'

'আমি যদি বলতাম এ সব কথা,' ফোড়ন কাটল মুসা, 'তাহলে বলতে গাঁজা। এখন নিজে যে বলছ?'

'বলা আর বিশ্বাস করা এক কথা নয়,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। একটা ছবি দেখাল। রেন আর ইয়াঙের বক্তব্যের ওপর

ভিত্তি করে এঁকেছে আর্টিস্ট।

হাত বাড়াল মুসা, 'দেখি তো?'

বাড়িয়ে দিল রবিন।

'খাইছে! এ কোন্ জানোয়ার!' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। নেকড়ের মাথা, মানুষের শরীর, ভালুকের মত রোমশ, টকটকে লাল চোখ। নতুন বসতি করতে আসা এক শ্বেতাঙ্গের শরীর চিরে ফালা-ফালা করছে। জীবটার ভয়াবহ ক্ষমতার কাছে একেবারে অসহায় হয়ে আছে শ্বেতাঙ্গ।

ফাইলটা বন্ধ করে ফিরিয়ে দিল মুসা। 'এ সব কাল্পনিক জানোয়ারের ওপর তোমার আগ্রহ জন্মাল কবে থেকে?'

জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিল কিশোর, 'স্টোকসের বিশ্বাস, এটা কাল্পনিক জানোয়ার নয়। তবে অনেক বেশি রঙ চড়িয়ে এঁকেছে আর্টিস্ট। লিক্যানথ্রপি নামে মানুষের এক ধরনের পাগলামি রোগ হয়। এই রোগ হলে রোগী ভাবতে আরম্ভ করে সে নেকড়েতে পরিণত হচ্ছে। আসলে তা হয় না।'

'ওহ্, তাই বলো!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'তোমার কথাবার্তায় তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল, পাগল হয়ে গেছ।'

'তবে কথা আছে,' তর্জনি নাচাল কিশোর। 'লিক্যানথ্রপির ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে হুইটম্যানের কেসটার সমাধান হবে না। এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যেগুলোর অন্য কোন মানে হয়। এই যেমন কাদার মধ্যে জানোয়ারের পায়ের ছাপ বদলে মানুষের ছাপ হয়ে যাওয়া, চামড়ার খোলসের টুকরো, জানোয়ারের দাঁতওয়ালা

মানুষ...'

'আসলে কি বলতে চাও তুমি বলো তো?' ধৈর্য হারাল রবিন। 'যা বলার খোলাখুলি বলো। তোমার কি ধারণা হল নিজেকে নেকড়েতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল?'

'করাটা অস্বাভাবিক, স্বীকার করছি। কিন্তু এ কেসটা সত্যি বড় অদ্ভুত...'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রবিন। এ ক্ষেত্রে ভূত বিশ্বাস করছে কি না—কোনমতেই এ প্রশ্নের সরাসরি জবাবটা আদায় করতে পারছে না কিশোরের মুখ থেকে। বলল, 'অদ্ভুত হলেও এখন আর কিছু করার নেই আমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে হলের মৃতদেহ। রহস্যেরও ইতি এখানেই। কেস অসমাপ্ত রেখেই ফিরে যেতে হবে আমাদের।'

হলের শবদাহের সময় হয়ে গেছে, হঠাৎ যেন লক্ষ করল কিশোর। 'হ্যাঁ, চলো, নামি। কি করে ওরা কাছে থেকে দেখি।'

গাড়ি থেকে নেমে মঞ্চের দিকে এগোল ওরা। পর্বতের চূড়া ছুঁয়ে বয়ে এল কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল।

সুগন্ধী কাঠের মশাল ধরাচ্ছে ওঝা। আগুন লাগাবে মঞ্চে। পুড়ে ভস্ম হবে হলের মৃতদেহ।

আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল কিশোর। প্রায় দৌড়ে চলল। দেহটা পুড়ে যাওয়ার আগেই যদি নতুন কিছু চোখে পড়ে এই আশায়। হলের মুখের বড় বড় দাঁতগুলোর কথা মনে পড়ল। কাঁধে জখমের দাগ। ওগুলোর সঙ্গে পিটারের আঁচড়গুলোর মিল আছে। খুন করা

গরুটার গায়ের আঁচড়ের সঙ্গেও।

আধিভৌতিক কোন কিছুর শিকার হয়েছে ওরা, এ কথা মোটেও বিশ্বাস করে না সে। তবু উদ্ভট কিছু একটা যে ঘটছে এই অঞ্চলে, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। সে-রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব এখন ওদের ওপর।

দশ

সন্ধ্যা নামছে।

মেঘের গায়ে লালচে-কমলা রঙ। যেন আগুন জ্বলছে। অপার্থিব লাগছে। রঙ দেখে মনে হয় খানিক পরে হলের মঞ্চে জ্বলে ওঠা আগুনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ইচ্ছে যেন ডুবন্ত সূর্যের।

লাশের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র আউড়ে চলেছে ওঝা। সিডার কাঠপোড়া গন্ধে বাতাস ভারি। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে ইনডিয়ানদের সৎকার অনুষ্ঠান। শেষ আর হতে চায় না যেন।

হলকে শেষ বিদায় জানাতে একজায়গায় জড়ো হলো শোকার্তরা। পুল হলের সেই লম্বা বুড়ো লোকটাকে চোখে পড়ল কিশোরের। কিন্তু সে যেন ওদের দেখেও দেখল না। কথা বলল না।

বুড়োর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিন্তু লোকটা জবাব দিল না।

রবিনের চোখ টিরানার দিকে। ভিড় থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পানি নেই। কিন্তু বুকের মধ্যে যে ছিঁড়ে যাচ্ছে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়। এত মানুষের ভিড়েও যেন বড় একা।

চোখে কাঁচের মত স্বচ্ছ, শূন্য দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকে। মনে হচ্ছে বাস্তবে নেই সে।

ধীরে ধীরে ওর দিকে এগোল রবিন।

মুখ ফেরাল না টিরানা। বলল, 'এখানে কেন এসেছ?'

'টিরানা...'

'আমার দুঃখ দেখে মজা পেতে এসেছ!'

তর্ক করার সময় কিংবা জায়গা এটা নয়। টিরানার দিকে আরেকটু এগোল রবিন। 'আমি শুধু বলতে এসেছি, তোমার ভাইয়ের জন্যে আমারও দুঃখ হচ্ছে, বিশ্বাস করো। পরিবারের কোন কোন মানুষ চিরতরে চলে গেলে যে কি কষ্ট হয়...'

'কোন মানুষ! ও ছিল আমার সমস্ত পরিবার,' ধরা গলায় বলল টিরানা। 'পৃথিবীতে এখন আমি একেবারে একা।'

কথা হারিয়ে ফেলল রবিন। এটা আশা করেনি। ভাই ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ ছিল না ওর, জানত না। কি জবাব দেবে এখন? অসহায় বোধ করল সে। টিরানার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কি করবে? ওর মুখে হাসি ফোটানোর এখন একটাই উপায়—হলকে জীবিত করে দেয়া। সেটা তো আর সম্ভব না। চুপ হয়ে গেল রবিন।

এতক্ষণে ওর দিকে ফিরল টিরানা। 'আমাদের সমাজে দুঃখ প্রকাশের নিয়ম হলো মৃত আপনজনের জিনিস অন্যকে দান করে দেয়া। তোমাকে দিয়েই শুরু করি। এই নাও,' রবিনের হাতে একটা ব্রেসলেট গুঁজে দিল সে।

পাখির পালক, ভালুকের দুটো বড় বড় নখ আর একটা পার্বত্য

সিংহের দাঁত লাগিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছে ব্রেসলেটটায়। এ সবের মানে জানা আছে রবিনের। ভালুকের নখ আর সিংহের দাঁত হলো মহাবীর কিংবা মহাশক্তিধর মানুষের নিদর্শন। হল ব্ল্যাকভালচার বোধহয় খুব সাহসী মানুষ ছিল।

অবাক হয়ে গেছে রবিন। কল্পনাই করেনি তাকে হলের জিনিস দিয়ে দেবে টিরানা। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ফিরিয়ে দিতে চাইল, 'না না, আমি বাইরের লোক...আমাকে দেয়াটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না...'

'দান করতে দেশী-বিদেশী লাগে না, যাকে খুশি দেয়া যায়,' চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠল টিরানার। 'অনেক জিনিস আছে ওর। অনেক...কেবল বন্ধু ছিল না কেউ!'

রবিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সরে গেল টিরানা।

*

একটা জীপ এসে থামল পাহাড়ের নিচে। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। গাড়ি থেকে নামলেন শেরিফ। এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। হাঁটার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় অস্বস্তি বোধ করছেন। গায়ে সরকারী পারকা। পরনে গাঢ় রঙের স্যুট। গলায় বোলো টাই।

ভিড় থেকে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মঞ্চের দিকে চোখ।

পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'শেরিফ, আপনি কি এখনও মনে করেন, হল ব্ল্যাকভালচারের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল?'

'না। গুলি করে মারা হয়েছে ওকে। অপঘাতে মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।'

'আমি কি বলতে চাইছি আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আমি জানতে চাইছি স্বাভাবিক অবস্থায় মারা গেছে কিনা ও?'

ঝট করে একটা হাত মঞ্চের দিকে তুললেন শেরিফ, 'তোমার প্রশ্নের জবাব ওই যে ওইখানে শুয়ে আছে, কিশোর পাশা।' কিশোরের দিকে তাকালেন না তিনি। 'আর খানিক পরেই পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। প্রমাণের জন্যে কোন চিহ্নই আর থাকবে না। এ সব অতিকৌতূহল বাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

হাল ছাড়ল না কিশোর। সেও বুঝতে পারছে এই তদন্তের এখানেই ইতি। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রশ্ন করল, 'দেহরূপান্তরের কথা কি বিশ্বাস করেন আপনি?'

কিশোরের দিকে এবারও চোখ ফেরাতে পারলেন না শেরিফ। তাকিয়ে আছেন মঞ্চের দিকে। 'কথা বোলো না। মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে। লোকে রেগে যাবে।'

ডুবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও বিদায় নিল পশ্চিমের আকাশ থেকে। আস্তে করে মশাল নামিয়ে মঞ্চে আগুন ছোঁয়াল ওঝা। শুকনো কাঠে আগুন ধরতে সময় লাগল না। লেলিহান শিখা লাফিয়ে উঠল ওপর দিকে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যেতে লাগল আরও ওপরে, যেন সদ্য জ্বলে ওঠা তারাগুলোকে ছোঁয়ার আকাঙ্খা।

রাতের আকাশের পটভূমিতে জ্বলছে সিডারের আগুন। একপাশে দাঁড়িয়ে ধীরতালে ক্রমাগত ঢাকে বাড়ি দিয়ে চলেছে একদল বাদক। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের গান ধরল একজন। এক এক করে তাতে গলা মেলাল অন্যরা। যুগ যুগ ধরে ট্রেগোরা এই একই

গান গেয়ে আসছে।

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। পুরো দৃশ্যটা অবাস্তব লাগছে ওর কাছে। উঁচু লয়ের ওই সুর সহ্য করতে পারছে না যেন ওর কান। আদিম, কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ সুর। কানের পর্দায় তো চাপ দেয়ই, মনে হয় সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটাকেও চেপে ধরেছে।

বাতাসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। ছড়াচ্ছে উৎকট মাংস পোড়া গন্ধ। সিডারের সুগন্ধ ঢাকা তো দিতে পারছেই না, দুই ধরনের গন্ধ মিলে আরও দুঃসহ হয়ে উঠছে।

গান-বাজনা ছাপিয়ে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ।

ফিরে তাকাল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল ঘোড়ায় চেপে এসে হাজির হয়েছে পিটার হুইটম্যান। পরনে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের উপযোগী স্যুট, টাই।

খোলা জায়গাটার কিনারে এসে ঘোড়া থামাল পিটার। মাথা থেকে হ্যাট খুলল। ঘোড়ার পিঠেই বসে থেকে তাকিয়ে রইল এদিকে।

হালকা ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা।

কানে যেতে ফিরে তাকাল টিরানা। রাগ ফুটল চেহারায়। গটমট করে এগোলা পিটারের দিকে।

ওর পিছু নিলেন শেরিফ। কিশোরও চলল শেরিফের পেছনে। দেখাদেখি রবিনও এগোল। মুসার আগ্রহ মঞ্চের দিকেই বেশি। যদিও এই মানুষ পোড়ানোর ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না তার।

'ভাগো এখান থেকে!' চিৎকার করে উঠল টিরানা।

'প্লীজ!' অনুরোধ করল পিটার, 'আমাকে থাকতে দাও। মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতেই এসেছি আমি। কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই।'

'তোমার শ্রদ্ধার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের,' রাগত স্বরে বলল টিরানা। 'আমি চাই তোমার বুকের ধুকপুকানিও বন্ধ হয়ে যাক খুব শীঘ্রি। তাতে আমার ভাইয়ের আত্মা শান্তি পাবে। আমি যে তোমাকে কতটা ঘৃণা করি, বলে বোঝাতে পারব না।' মুখ ওপর দিকে তুলে থুতু ছুঁড়ল পিটারকে লক্ষ্য করে।

জবাব দিল না পিটার। লজ্জিত ভঙ্গিতে মুখ নিচু করল শুধু।

'পিটার,' শেরিফ বললেন, 'তোমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। ওরা কেউই তোমাকে সহ্য করতে পারবে না এখন।' টিরানাকে শান্ত করার জন্যে ওর কাঁধে একটা হাত রাখতে গেলেন তিনি।

ঝাড়া দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল টিরানা।

হলের জন্যে পিটারের দুঃখটা আন্তরিক। সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ইনডিয়ানরা এট বুঝতে চাইবে না কিছুতে। প্রচণ্ড রেগে যাবে ওরা। কোন্ অঘটন ঘটিয়ে বসে কে জানে!

সেটা পিটারও বুঝতে পারল। হ্যাটটা মাথায় পরল আবার। টিরানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার যদি এখন ক্ষমতা থাকত তোমার ভাইকে বাঁচানোর, নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও সেটা করতাম আমি...'

জবাব দিল না টিরানা। ঝটকা দিয়ে ঘুরে এগোল আবার জ্বলন্ত মঞ্চের দিকে। পেছনে কানে এল পিটারের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

ফিরেও তাকাল না সে।

আগের জায়গায় ফিরে এসে টিরানার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। আগের মতই বিষণ্ণ, গম্ভীর। বাজনা আর গানের তালে তালে খুব আস্তে শরীর দোলাতে লাগল।

মঞ্চের দিকে ফিরল কিশোর। আগুনের লেলিহান শিখা পুরোপুরি গ্রাস করেছে হলকে। ওর দেহের কোন অংশই চোখে পড়ছে না। তাকিয়ে রইল সেদিকে। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না ভাবনাটা—সত্যি কি নিজের দেহকে রূপান্তর করতে পারে মানুষ?

অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিভাবে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটা অতি মূল্যবান সূত্র।

এগারো

ওখান থেকে বহু মাইল দূরে র‍্যাঞ্চহাউসের দাওয়ায় রকিং চেয়ারে বসে আছেন ডেভিড হুইটম্যান। শীতল, তারাজ্বলা রাত। ধীরে ধীরে শরীর দোলাচ্ছেন আর ভাবছেন সেরাতের কথা, যে রাতে জানোয়ারটা আক্রমণ করেছিল পিটারকে। ভাঙা বেড়াটা মেরামত করে ফেলেছেন। আরও অনেক কাজ করেছেন। বসে থাকতে পারেন না তিনি। অলসতা পছন্দ নয়। কয়েক ঘণ্টা লাগিয়ে এক একটা নতুন বুনো বেয়াড়া ঘোড়াকে বশ করেছেন, এক ট্রাক খড় খালাস করেছেন, গোলাটাকে শীতকালের উপযোগী করেছেন। সারাদিনের প্রচণ্ড খাটুনির পর হাতে কফির মগ নিয়ে এ ভাবে বসে আরাম করে সন্ধ্যা কাটাতে ভালবাসেন তিনি। সূর্য অস্ত যেতে দেখেন, দেখেন চাঁদের উদয়।

সন্ধ্যা হয়েছে এক ঘণ্টা আগে। কালো আকাশে কোটি তারার মেলা। জ্বলছে হীরের টুকরোর মত। তালু দিয়ে গরম মগটা চেপে ধরে হাত গরম করতে লাগলেন তিনি। তাকিয়ে আছেন কালো অন্ধকারের দিকে। ছেলের কথা ভাবছেন। গেল কোথায় ও? ডিনারের পর পরই একটা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখনও

ফেরেনি।

আবার আগের ভাবনায় ফিরে গেলেন। ইনডিয়ান ছেলেটাকে গুলি করে মারাটা একটা জঘন্য কাজ হয়ে গেছে। এখনও বুঝতে পারছেন না ঘটনাটা কি ঘটেছিল। তিনি নিশ্চিত, কোন ধরনের জানোয়ারকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়েছেন। পিটারকে আক্রমণ করেছিল, এটাও ভুল দেখেননি। ওর গায়ের দাগগুলো তার প্রমাণ। কোন মানুষের পক্ষে ওরকম করে আঁচড়ানো সম্ভব নয়। আরও একটা ব্যাপার অবাক করেছে তাঁকে, হলকে গুলি করে মারার পর খোঁয়াড়ে গরু-ঘোড়ার ওপর হামলা বন্ধ হয়ে গেছে।

একঝলক কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। জ্যাকেটের জন্যে তাঁর গায়ে দাঁত বসাতে পারল না ঠাণ্ডা। কলারটা তুলে দিয়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন নিশির শব্দ। ঝিঁঝি ডাকছে। আস্তাবলে নরম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে ঘোড়া। গাছের মাথায় শিরশিরানি তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। যেখানেই বাধা পাচ্ছে, বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করছে। বারান্দার কাঠের মেঝেতে রকিং চেয়ারটা দোলানোর তালে তালে শব্দ তুলছে মচমচ মচমচ করে।

কফিতে চুমুক দিলেন তিনি। শান্ত, সুন্দর একটা রাত। যেমনটা হওয়া উচিত।

হঠাৎ কানে এল শব্দটা। চাপা, হালকা একটা গরগর। এতই মৃদু, প্রথমে ভাবলেন শোনার ভুল।

ঘাড় কাত করে ভালমত শোনার জন্যে কান পাতলেন।

কানে এল কেবল বাতাসের শব্দ।

তারপর থেমে গেল বাতাস। বন্ধ হয়ে গেল শব্দ।

অবাক লাগল তাঁর। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গরু-ঘোড়াগুলোও

শব্দ করা বন্ধ করে দিয়েছে। ঝিঁঝিগুলো ডাকছে না। রাতের সমস্ত শব্দ যেন হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করলেন তিনি। কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। ব্যাপারটা পীড়াদায়ক। অস্বাভাবিক। এ অঞ্চলে রাতের বেলা অতটা নীরব হয় না সাধারণত। কোন আবহাওয়াতেই না। কিছু না কিছু শব্দ থাকেই।

ভয়ের কাছে পরাজিত হতে চাইলেন না তিনি। জীবনে কখনও হননি। আর এখন তো অনেক বয়েস হয়েছে, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মনের অস্বস্তি বোধটা গেল না। আস্তে করে নামিয়ে রাখলেন মগটা।

উঠে দাঁড়ালেন। নড়ে উঠল রকিং চেয়ারটা। শব্দও হয়ে গেল সামান্য। আস্তে করে বারান্দা থেকে নামলেন। হাঁটার সময় চামড়ার কাউবয় বুট মচমচ করতে লাগল। সেই শব্দ বন্ধ করতে পারলেন না। আসলে বন্ধ করার চেষ্টাও করলেন না।

কোরালের দিকে এগোলেন তিনি। মাঝপথে থামলেন একবার। কান পাতলেন। পুরোপুরি নীরবতা। কোন আওয়াজ আসছে না কোনওদিক থেকে। গরগর শব্দটা সত্যি শুনেছেন? নাকি কানের ভুল? গত ক'দিনে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে এখানে, তাতে এ সব ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে সাবধান থাকা ভাল। খালি হাতে আর এগোনো উচিত না। বন্দুকটা আনার জন্যে আবার বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

এতই নিঃশব্দে এল ওটা, কিছুই টের পেলেন না তিনি।

একটা সেকেন্ড, নীরবতা। পরক্ষণে ঠিক তাঁর পেছনে চলে এল ওটা। প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাঁকে সিঁড়ির ওপর।

উপুড় হয়ে পড়েছেন। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ঘাড়ে। সেটা অগ্রাহ্য করে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকালেন কিসে ফেলেছে দেখার জন্যে। ক্ষিপ্ত ভালুকের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি, শাবকের পাহারায় থাকা ভয়ানক হিংস্র নেকড়ে-মায়ের চেহারা দেখেছেন অতি কাছে থেকে, এমনকি একবার একটা পাগল হয়ে যাওয়া পার্বত্য সিংহের সামনেও পড়েছিলেন, চোখের পাপড়িও কাঁপেনি তাঁর। কিন্তু এখন যে জীবটাকে দেখলেন, এ রকম জানোয়ারের কবলে পড়েননি আর কখনও। সামান্য কুঁজো হয়ে মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ভালুকের মত রোমশ শরীর। কুকুরের মত নাক। লাল টকটকে চোখে বুনো দৃষ্টি। থাবার আঙুলে বড় বড় ক্ষুরধার নখ। আধা পশু, আধা মানুষ।

মুহূর্তে বুঝে ফেললেন তিনি, জন্তুটা যাই হোক, তাঁর খোঁয়াড়ের গরু-ঘোড়া মারার জন্যে ওটাই দায়ী। আরও বুঝলেন, এ রাতে তাঁকে খুন করার জন্যেই এসেছে ওটা।

বরফ-শীতল ভয়ের শিহরণ খেলে গেল শরীরের শিরায় শিরায়। হলকে যেদিন গুলি করে মেরেছেন, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর মনে হলো আজকের রাতটা। সেরাতে ছেলের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। আজ বাঁচাতে হবে নিজের জীবন।

পালানোর চেষ্টা করলেন। কোনমতে ঘরে গিয়ে শটগানটা যদি একবার হাতে নিতে পারেন, তাহলে কোন জানোয়ারের সাধ্য নেই আর তাঁর গায়ে একটা আঁচড় কাটে। কিংবা যদি কোনমতে তাঁর সামনের ওই শক্ত কাঠের দরজাটার ওপাশে গিয়ে পাল্লা লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলেও···

কিন্তু কোন সুযোগই দিল না তাঁকে জানোয়ারটা। উঠে দাঁড়িয়ে

তিনি এক পা বাড়ানোর আগেই পেছন থেকে ধরে ফেলল। রকিং চেয়ারটার ওপর এত জোরে ছুঁড়ে ফেলল, আঘাতের চোটে মড়মড় করে ভেঙে গেল ওটা।

একটা মুহূর্ত নিথর হয়ে পড়ে রইলেন হুইটম্যান। কপাল কেটে রক্ত বেরোতে লাগল। পেছনে খেপা গর্জন করছে জানোয়ারটা। ফিরে তাকালেন তিনি। দেখতে চাইলেন কিভাবে আসে আক্রমণ।

আবার ধরল তাঁকে জানোয়ারটা।

অনেক কষ্টে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনে তুলে সরে যেতে চাইলেন। যখন পারলেন না, কাঠের মেঝে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন। শক্ত কাঠে ঘষা লাগল শুধু নখ, বিঁধানো তো দূরের কথা, সামান্যতম আঁচড়ও কাটতে পারলেন না।

আবার শূন্যে তুলে নেয়া হলো তাঁকে। বাচ্চা ছেলের হাতে বেড়ালছানার মত শরীর মুচড়ে মুচড়ে মুক্তি পেতে চাইলেন।

বৃথা চেষ্টা। শক্তি, ক্ষিপ্রতা, কোন কিছুতেই ওটার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না তিনি। আজ ভাগ্যও বিরূপ হয়ে গেল তাঁর প্রতি।

নিজের অজান্তে চিৎকার বেরিয়ে এল গলা ফুঁড়ে। মনটানা-রাতের শীতল-কালো অন্ধকার চিরে দিল সেই চিৎকার। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়ে পড়ল সিরামিকের মগটায়। মিশে গেল মগের কফিতে।

আবার নীরবতার আলখেল্লা দিয়ে যেন ঢেকে দেয়া হলো র‍্যাঞ্চটাকে। কোথাও কোন শব্দ নেই আর।

অনেক পরে ফিরে এল বাতাস। বইতে শুরু করল গাছের পাতায় কাঁপন তুলে। গেয়ে চলল নিশিরাতের ঘুমপাড়ানি গান।

বারো

পরদিন সকালে উঠে এয়ারপোর্ট রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ফিরে যাচ্ছে। কেসের কিনারা না করেই। থেকে লাভ নেই। কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না।

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। গম্ভীর হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর। রবিনও চুপ।

'এ ভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে কি ভাল লাগে?' আচমকা কথা বলল কিশোর।

'আর কি করতে পারতাম,' রবিন বলল।

'সত্যি কি পারতাম না?'

'তাহলে যাচ্ছি কেন? আমি তো কোন উপায় দেখছি না। হল ব্ল্যাকভালচারের দেহ পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতি ঘটেছে এ কেসের।'

আবার মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর রবিন বলল, 'তোমার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, মানুষের দেহের রূপান্তর ঘটার ব্যাপারটা নিয়ে তুমি গভীর চিন্তা করছ। ভূতুড়ে কাণ্ড—এ কথা যে বিশ্বাস করবে না, ভাল করেই জানি। তাহলে কি ভাবছ? তোমার কি

ধারণা কোনও ধরনের জিনেটিক কারণে হলের দেহে রূপান্তর ঘটে যেত?'

'অসম্ভব কি? ভূত বিশ্বাস করাটা হাস্যকর, কিন্তু মেডিক্যাল সাইন্সের কতটা জানি আমরা? জিনেটিক কারণে মানুষের দেহের যদি আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, বিকৃত হতে পারে, বিকলাঙ্গ হতে পারে, অতিরিক্ত চুল গজিয়ে রোমশ হয়ে যেতে বাধাটা কোথায়?'

'তেমন কিছু যদি ঘটেই থাকে হলের বেলায়, সেটা জেনে এখন কি হবে আমাদের?'

'তাহলে ঠেকানোর চেষ্টা করতে পারতাম এ ধরনের ঘটনা যাতে আর ঘটতে না পারে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন এ রকম ঘটনা আরও ঘটবেই তুমি জেনে বসে আছ। ঘটেও যদি কিভাবে ঠেকাবে? কার চুল সোনালি হবে, কার কালো, কার চেহারা কেমন, সেটা জন্মের আগে মায়ের পেটেই ঠিক হয়ে যায়। সেসব বদলানোর সাধ্য কারও নেই। জিনেটিক সাইন্স এখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে মানুষের জন্ম নিয়ে যা খুশি করতে পারবে বিজ্ঞানীরা...'

'জন্মের আগেরটা না পারুক, কিন্তু পরেরটা? সব পারা না গেলেও দেহের কিছু কিছু অস্বাভাবিক জিনিস চিকিৎসা করে সারানো সম্ভব...'

'অহেতুক তর্ক করছ তোমরা,' বাধা দিল মুসা, 'মাথা গরম করছ শুধু শুধু। অতি সহজ সমাধান এর। আমার কথার তো কোন দাম দাও না...'

ওর দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বলতে চাও?'

'বিজ্ঞানের মধ্যে এই রহস্যের সমাধান খুঁজতে যাওয়াটাই হচ্ছে বোকামি। এলাকাটা ইনডিয়ানদের। আরেকটা সহজ সমাধানের দিকে নজর দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়...'

মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই বেজে উঠল কিশোরের বুকপকেটে রাখা সেলুলার টেলিফোন। কানে ঠেকাল সে, 'হালো, কিশোর পাশা বলছি।'

অন্যপাশ থেকে কি বলা হচ্ছে শুনতে পেল না রবিন। কিন্তু দেখল দ্রুত বদলে যাচ্ছে কিশোরের মুখভঙ্গি। কথা শেষ করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মুসা, গাড়ি ঘোরাও!'

'কেন?'

'এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না আমরা। থ্রী সার্কেল র‍্যাঞ্চে চলো।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুই সহকারীকে নির্বাক করে রেখে ধীরে ধীরে ফাঁস করল খবরটা কিশোর, 'শেরিফ ফোন করেছেন। ডেভিড হুইটম্যান মারা গেছেন। গত রাতে। পুলিশের ধারণা, কোন বন্য জন্তুর শিকার হয়েছেন তিনি।'

*

এক ঘণ্টা পর।

করোনার আর ব্রাউনিঙের দুজন পুলিশ অফিসারের পেছন পেছন র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। আরেক প্রান্তে প্লাস্টিকে ঢেকে রাখা হয়েছে ডেভিড হুইটম্যানের মৃতদেহ।

মুসার দিকে তাকাল রবিন, 'লাশ দেখবে নাকি?'

হাত নেড়ে নীরবে জানিয়ে দিল মুসা, সে ওসব ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে চায় না।

এগিয়ে গিয়ে তেরপলের এককোণ উঁচু করল রবিন। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল যেন। ভয়াবহ বললে কম বলা হবে। বীভৎস দৃশ্য।

ক্যামেরার ফ্ল্যাশার ঝিলিক দিয়ে উঠল একজন অফিসারের হাতে। খুনের দৃশ্যটা রেকর্ড করে রাখছে। শেরিফ উইল বারজার দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির মাথায়। আরেকজন অফিসার তাঁর হাতে তদন্তের একটা রিপোর্ট ধরিয়ে দিয়েছে, সেটা পড়ছেন।

পাশে গিয়ে দাঁড়াল রবিন।

ফিরে তাকালেন শেরিফ। 'কিছু বলবে?'

'বিকৃত করে ফেলা হয়েছে,' বলল রবিন। 'মনে তো হয় বুনো জানোয়ারেরই কাজ। তবে সাজানোও হতে পারে।'

মন্তব্য করলেন না শেরিফ।

'শেরিফ,' আবার বলল রবিন, 'এমন কি হতে পারে না, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ঘটানো হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড? হলের কোন বন্ধু বা...'

'জানি না।'

'টিরানার সঙ্গে কথা বলেছেন? কাল রাতে ভয়ঙ্কর হয়ে ছিল ওর মেজাজ।'

'ও চলে গেছে,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিলেন শেরিফ। 'অনুষ্ঠানের পর আর দেখা যায়নি ওকে।'

অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন। চাপা দিল সেটা। প্রকাশ করল না শেরিফের সামনে। টিরানা এখন সবচেয়ে বড় সন্দেহ। ও এই

এলাকা ছেড়ে চলে গেছে এ ব্যাপারে এতটা শিওর হচ্ছেন কি করে শেরিফ?

রবিনের মনের কথা পড়তে পেরেই যেন শেরিফ বললেন, 'ওকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলাম। খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

ভুরু কোঁচকাল রবিন। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পিটার কোথায়?'

'ওকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মেরে ফেলেনি তো! খুঁজতে যাওয়া দরকার।' উদ্বিগ্ন হলো রবিন। হাত নেড়ে ডাকল মুসাকে।

মুসাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রবিন।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। ফিরে তাকালেন তেরপলে ঢাকা দেহটার দিকে। একবার দেখা দরকার।

এক পা বাড়িয়েই থেমে গেলেন। বাঁ হাতে ধরা কাগজটা কাঁপছে। হুইটম্যানের লাশটা দেখতে চান না তিনি। যা অনুমান করেছেন, সেটাই যদি দেখতে পান, এই ভয়ে।

*

ওখান থেকে মাইলখানেক দূরে সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে কিশোর, যেখানে দেখার কথা ভাবেনি অন্য কেউ। কোরালের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা পাহাড়ে উঠেছে। বড় বড় নখওয়ালা পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এসেছে এখানে। হল যেখানে মারা গেছে, সেখানেও এই ছাপ দেখতে পেয়েছিল সেদিন।

খুঁজতে খুঁজতে একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। নিচু হয়ে মাটি

থেকে তুলে নিল কয়েক গোছা খসখসে বাদামী চুল। ভালুকের রোম নয়। গরু কিংবা কুগারের লেজেরও নয় এগুলো। তাহলে কিসের? বিশেষজ্ঞরাই ভাল বলতে পারবেন। আসলেই কি পারবেন? সন্দেহ হতে লাগল ওর। তবু, দেখাতে হবে। অন্তত নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে তাঁরাও পারলেন না।

কেন যে এ ধরনের ভাবনা মাথায় আসছে ওর, নিজেও বলতে পারবে না। ভেবে অবাকই লাগল। মুসার মত সেও কি আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল! বুঝল, সেজউইক স্টোকসই এ জন্যে দায়ী। ওর মগজে আজেবাজে সব চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আরও খুঁজতে লাগল। তারপর পেয়ে গেল সেই জিনিসটা যেটা পাওয়ার আশায় এসে উঠেছিল এখানে।

খোলসের টুকরো।

চকচকে চামড়া। আগের বার যেটা পেয়েছিল সেটার মতই। তবে থাবার নয়, হাতের আরেকটু ওপরের।

তেরো

ঘুরতে শুরু করল রবিন। র‍্যাঞ্চ হাউসটাকে ঘিরে চক্কর দিতে দিতে ক্রমেই দূরে স রে যেতে লাগল। বাড়াতে থাকল পরিধি। কোথাও কোন সামান্য সূত্র থেকে থাকলেও যাতে সেটা মিস না হয়।

মুসার এ সব ভাল লাগছে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, পুরো ব্যাপারটাই ভূতুড়ে। ভূত ছাড়া কোন স্বাভাবিক মানুষ এ সব করতে পারে না। ইনডিয়ানরা নানা রকম তুকতাক জানে। গুণ করে স্বাভাবিক মানুষকে জন্তু বানিয়ে ফেলা কোন ব্যাপারই নয় ওদের কাছে।

কিন্তু এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না রবিন আর কিশোরকে। ওদের ধারণা, পৃথিবীতে আজগুবি বলে কিছু নেই। আসল কারণটা খুঁজে বের করতে পারলেই হলো। ভূতুড়ে ব্যাপারও তখন আর ভূতুড়ে থাকে না, আজগুবি মনে হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে কোরালের একটা বিশেষ অংশে এসে দাঁড়াল দুজনে। এখানটাতে একটা ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা বানিয়েছিলেন হুইটম্যান। তার আর শিক দিয়ে খাঁচা বানিয়ে তাতে ভরে রাখা হয়েছে অসংখ্য জানোয়ার। বিভিন্ন জাতের মুরগী, খরগোশ আর

ছাগলও রয়েছে তার মধ্যে।

আরও অনেকের মতই রবিন আর মুসাকে লক্ষ করছে একজোড়া হলদেটে চোখ। প্রতিটি পা ফেলা মেপে নিচ্ছে শিকারীর চোখ মেলে।

চাপা, ভারি গর্জন শুনে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল একটা পার্বত্য সিংহের ওপর। লেজ দোলাচ্ছে ওটা। শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ওরা কেউ কিছু করার আগেই লাফ দিল ওটা। বিকট হাঁয়ের ভেতর বেরিয়ে আছে ভয়ঙ্কর, ধারাল দাঁত। থাবার নখ বেরিয়ে গেছে। ওই নখ আর দাঁতের আওতায় পেলে মুহূর্তে চিরে ফালা ফালা করে দেবে শরীর।

কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারল না ওটা। খাঁচার শিকের দেয়াল ভেদ করতে পারল না। ভয়ঙ্কর রাগে গর্জাতে লাগল ভেতরে থেকে।

দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল রবিন। ঢিল হলো মাংসপেশী।

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা সশব্দে ফেলে মুসা বলল, 'খাইছে! গায়ে এসে পড়লে আর রক্ষা ছিল না! এতক্ষণে দোজখে চলে যেতাম।'

'বেহেশত নয় কেন?' অন্য সময় হলে প্রশ্ন করত রবিন। মুসা জবাব দিত, 'আমার মত পাপী বান্দা কি আর বেহেশতে যায়?' তর্কাতর্কি, হাসাহাসি হত কিছুক্ষণ। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। ওসব হালকা রসিকতার মানসিকতা নেই দুজনের কারোরই।

এ রকমভাবে বিনা কারণে এখানে জানোয়ার ধরে বন্দি করে রাখার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না রবিন। অন্যায় মনে হচ্ছে

তার কাছে। এটা শহর নয়, আর কোন উপায় না দেখে লোকে এসে জানোয়ার দেখে তৃপ্ত হচ্ছে, সেরকম কোন ব্যাপারও নেই। অহেতুক নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার জন্যে আর একা একা মজা পাওয়ার লোভে এগুলোকে এ ভাবে আটকে রেখে কষ্ট দেয়া হচ্ছে।

নাকি অন্য কোন কারণ? আরও জঘন্য, নিষ্ঠুর কোন বিকৃত মানসিকতা? হুইটম্যানের স্টাফ করা জানোয়ারগুলোর কথা মনে পড়ল ওর। এই কুগারটাকেও মেরে স্টাফ বানিয়ে সাজিয়ে রাখার জন্যে ধরে আনা হয়নি তো?

জবাবটা হয়তো আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। কারণ, হুইটম্যান এখন মৃত।

কুগারের খাঁচার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে রবিন, এ সময় চিৎকার করে উঠল মুসা। 'খাইছে! ওটা কি? মানুষ না?'

ঘুরে তাকাল রবিন। দৌড় দিয়েছে ততক্ষণে মুসা। রবিনও দেখল, মাটিতে কালোমত কি যেন পড়ে আছে। সেও ছুটল মুসার পেছনে।

মানুষই। বৃষ্টির পানিতে কাদা হয়ে আছে একটা জায়গায়। গর্তমত, তাই পানি সরেনি, শুকায়ওনি পুরোপুরি। ওই কাদা-পানির মধ্যে পড়ে আছে পিটার। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মৃত।

*

সমস্ত ভয় আর অস্বস্তি জোর করে সরিয়ে আস্তে করে তেরপলের কোণা ধরে টান দিলেন শেরিফ। যতই জানা থাকুক কি দেখবেন, ডেভিড হুইটম্যানের লাশ দেখার কৌতূহলটা দমন করতে পারলেন

না কিছুতে।

তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে থাকলেন কিছু চোখে পড়ে কিনা। পড়ল। একহাতে তেরপল ধরে রেখে আরেক হাত বাড়িয়ে লাশের গা থেকে তুলে আনলেন জিনিসটা। ভাল করে দেখতে গিয়ে কাছাকাছি হয়ে গেল দুই ভুরু।

*

বারান্দার দিকে এগোতে গিয়ে শেরিফের দিকে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকাল কিশোরও। এত মনোযোগে কি দেখছেন?

নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াল সে।

জিনিসটা দেখে তার ভুরুও কুঁচকে গেল।

দুই আঙুলে একটা নখ ধরে রেখেছেন শেরিফ। বড়, বাঁকা, ক্ষুরের মত ধারাল নখ।

'কোন্ জানোয়ারের?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'এমন নখ তো আর দেখিনি!'

জবাব দিলেন না বারজার।

'শেরিফ,' কিশোর বলল, 'চুপ করে না থেকে দয়া করে আমার সঙ্গে একটু খোলাখুলি কথা বলুন, প্লীজ! আমি শিওর,আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন।'

আগের মতই নীরব রইলেন শেরিফ।

রাগ লাগল কিশোরের। শেরিফের এই চুপ করে থাকা ভাল লাগছে না ওর। অপঘাতে মানুষ মরছে। সেটা দেখেও এ ভাবে তাঁর মুখ বন্ধ রাখাটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না।

'শেরিফ!' একটু জোরেই ডাক দিল সে এবার।

অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন তিনি। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন কথা বলার জন্যে। ঠিক এই সময় বাড়ির কোণ ঘুরে বেরিয়ে এল মুসা আর রবিন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে পিটারকে। ওর গায়ে জড়ানো একটা ঘোড়ার কম্বল। দুজনে দুদিক থেকে ধরে রেখেছে। তাও হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ওর। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখ। জ্বরের রোগীর মত লাল চোখের চারপাশে কালি পড়েছে। তাপমাত্রা এখন খুবই কম, তার মধ্যেও দরদর করে ঘামছে।

'হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি,' রবিন বলল। 'মনে হচ্ছে ডিহাইড্রেশনে ভুগছে। কিভাবে এত পানিশূন্য করে ফেলল শরীর, বুঝতে পারছি না। সুস্থ হলে তখন জিজ্ঞেস করা যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

গাড়ির দিকে ওকে নিয়ে চলল মুসা আর রবিন। ওদের ভাড়াটে গাড়িটার পেছনের সীটে বসিয়ে দিল।

শেরিফ কিছু বললেন না।

পেছনের সীটে পিটারের সঙ্গে বসল রবিন। মুসা আগেই ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে।

চলতে আরম্ভ করল গাড়ি। গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শেরিফের দিকে ফিরল কিশোর। কোন রকম ভূমিকার মধ্যে গেল না আর। জিজ্ঞেস করল, 'কি লুকাচ্ছেন আপনি, শেরিফ, দয়া করে বলবেন? না এখনও সময় হয়নি? আরও মানুষের মৃত্যু দেখতে চান?'

মাটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন শেরিফ, 'এখন আর বলে কোন লাভ নেই। যা ঘটার তা ঘটে গেছে। সব শেষ।' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই শোনালেন কথাগুলো।

'সব শেষ মানে? সেজন্যেই কি হলের লাশের ময়না তদন্ত করতে আপনি বাধা দিয়েছেন? ভেবেছেন ওর দেহ পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে সব কিছু? কিসের ভয় আপনার, শেরিফ? কি এমন জেনে যেতাম আমরা, যেটা আমাদের জানতে দিতে আপনি নারাজ?'

আবার হুইটম্যানের লাশের দিকে তাকালেন শেরিফ। তারপর চোখ তুললেন কিশোরের দিকে। 'চলো, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। রহস্যটা আমাকেও বোকা বানিয়ে দিয়েছে। মায়ানেকড়ের গল্প শুনতাম ছোটবেলায়। রূপকথার সেই জানোয়ারের সঙ্গে এর যেন কোথায় একটা মিল আছে। ভাবছি, আমারও একবার কথা বলা দরকার তার সঙ্গে।'

'কার সঙ্গে?'

'সেটা গেলেই দেখতে পাবে।'

চোদ্দ

ছোট্ট হাসপাতাল। দুই তলা কাঠের বাড়ি। দোতলার একটা ঘরে বসে অপেক্ষা করছে মুসা আর রবিন। পিটারের হাতের শিরায় সুচ ঢুকিয়ে রক্ত নিচ্ছে একজন নার্স।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে রবিন। আসবাবপত্র আর জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ১৯৩০ সালের গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় তৈরি করার পর থেকে তেমনি রয়ে গেছে হাসপাতালটা, আর উন্নত করা হয়নি। আশা করল, চিকিৎসার যন্ত্রপাতিগুলো অন্তত কিছুটা আধুনিক হবে।

মুসার কোন ভাবান্তর নেই। সে তাকিয়ে আছে নার্সের দিকে। নিরাসক্ত চোখে ওর কাজ দেখছে। জীবাণুনাশক আর অন্যান্য ওষুধের কড়া গন্ধ বাতাসে। এ সব তার সহ্য হচ্ছে না। এখান থেকে এখন বেরোতে পারলে বাঁচে।

কাজ সেরে বেরিয়ে গেল নার্স। পিটারের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। বালিশে পিঠ রেখে আধশোয়া হয়ে আছে ও। ঘোর পুরোপুরি কাটেনি এখনও। চেহারা তেমনি রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে।

ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল রবিন। আগের দিন সন্ধ্যায়

টিরানার ধমক খেয়ে চলে আসার পর কোথায় গিয়েছিল? কি ঘটেছিল? বাবার মৃত্যুর খবরটা কি জানে ও? বেহুঁশ হয়ে ওই কাদাপানির মধ্যে পড়ে থাকল কেন? যে জানোয়ারটা ওর বাবাকে খুন করেছে, সেটা কি আবার ওকে আক্রমণ করেছিল?

রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে পিটার। যেন ওর মুখ দেখেই মনের প্রশ্নগুলো জেনে গেল। বলল, 'অনুষ্ঠান থেকে চলে আসার পর ঠিক কি ঘটেছে বলতে পারব না। মনে হলো বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে নিচু স্বরে কথা বলছে। দ্বিধা করল একটা মুহূর্ত। রবিনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। 'ওখান থেকে সোজা র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলাম...তারপর কি ঘটেছে বলতে পারব না।'

চেহারা বিকৃত করে ফেলল সে। রাতের কথা মনে পড়ায়, নাকি শরীরের ব্যথায়, বুঝতে পারল না রবিন।

'কোন কোন সময় আমার মন যখন খুব খারাপ হয়ে যায়,' বলতে লাগল সে, 'চিড়িয়াখানাটার কাছে চলে যাই আমি। বসে বসে জানোয়ারগুলোকে দেখি আর ভাবি। তাতে মনের অস্থিরতা দূর হয়।'

চুপচাপ শুনছে রবিন। কোনদিকে চলেছে পিটার বুঝতে পারছে না।

'খাঁচায় যে একটা কুগার আছে,' পিটার বলল, 'শুধু ওটার দিকে তাকিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। খাঁচার মধ্যে অনবরত পায়চারি করে ওটা। তাকিয়ে দেখি হাঁটার তালে তালে কিভাবে ঢেউ খেলে যায় ওটার শক্তিশালী মাংসপেশীতে। সোনালি

চোখে গনগনে আগুন। ওই চোখের পেছনের মগজটা আইনজীবী চেনে না, সম্পত্তির দলিল সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, জানে না অন্যের জায়গায় অনধিকার প্রবেশ বেআইনী, চেনে শুধু রক্ত...'

মুসাও শুনছে। ওর মনে হচ্ছে, মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে পিটারের। তাই প্রলাপ বকছে।

ওরা এ রকম ভাবতে পারে বুঝেই যেন থেমে গেল পিটার। তারপর আবার শুরু করল, যেন কথা বলার নেশায় পেয়েছে ওকে, 'ওই চিড়িয়াখানাটা কিন্তু আগে চিড়িয়াখানা ছিল না। ওটা ছিল আমার মায়ের পশু হাসপাতাল। জখম হওয়া জানোয়ার পেলে সেগুলোকে ধরে সেবাযত্ন দিয়ে ভাল করে ছেড়ে দিত মা। মন খারাপ হলে ওখানে গিয়ে আমার বসে থাকার আরেকটা কারণ, ওখানে গেলে মায়ের স্মৃতি মনে পড়ে। তার কথা ভাবি। ওখানে বসে ভাবতে আমার ভাল লাগে।' বিষণ্ণ হাসি দেখা দিল ওর মুখে। হতাশার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু কাল রাতে ওখানে গিয়ে বসেও বোধহয় মন শান্ত করতে পারিনি আমি। মনে হচ্ছিল যেন আমিও ওগুলোর মতই জানোয়ার হয়ে গেছি।'

এতক্ষণে আগ্রহ জেগেছে মুসার। আর কি বলে শোনার জন্যে কান খাড়া করল।

রবিন জানতে চাইল, 'কাল রাতে বাড়ি ফিরে বাবার সঙ্গে দেখা করেছেন? কোথায় গিয়েছিলেন বলেছেন তাঁকে?'

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত ভেবে নিল পিটার, যেন মনে করতে কষ্ট হচ্ছে। 'না। ওই অনষ্ঠানে গিয়েছি শুনলে রেগে আগুন হয়ে যেত। আমি...আমার মনে হয় অন্ধকারে তাকে বসে থাকতে

দেখেছি...বারান্দায়...রোজ যেভাবে বসে থাকে...তবে কথা বলেছি কিনা মনে পড়ে না। কেন?'

বুঝে ফেলল রবিন, বাবার মৃত্যুর খবর জানে না পিটার। তারমানে জানানোর সেই কঠিন দায়িত্বটা এখন তাকেই নিতে হবে। মুসার দিকে তাকাল।

হাত নেড়ে মানা করে দিল মুসা। ও বলতে পারবে না।

সত্যি কথাটা সহজভাবে জানিয়ে দেয়াই ভাল, যত মর্মান্তিকই হোক। সুতরাং দ্বিধা করল না রবিন। যতটা নরম করে বলা সম্ভব, বলল, 'আপনার বাবা বেঁচে নেই।'

চমকাল না পিটার। চিৎকার করল না। রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। ওর চোখ যেন বলতে চাইছে, 'তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নাও, রবিন, এ হতে পারে না!'

'সরি, পিটার,' রবিন বলল, 'সত্যি মারা গেছেন তিনি!'

চোখ বন্ধ করে ফেলল পিটার। বালিশে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। কান্না থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে ও, বুঝতে অসুবিধে হলো না রবিনের।

'আলামত দেখে মনে হয়েছে কোন বুনো জানোয়ারের শিকার। তবে ঘটনাটা খুনও হতে পারে। হয়তো মানুষের কাজ।'

নীরবে শুনল পিটার। তেমনি চিত হয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল শুধু।

ওর জন্যে মায়া হলো রবিনের। সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেল না। তবু বলল, 'মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না, পিটার...'

'দোষটা কি আমার?' চোখের পাতা বন্ধ রেখেই প্রশ্ন করল

পিটার।

অবাক হয়ে গেল রবিন। কি বলতে চায় পিটার?

'আপনার মানে?'

'আমি ওদের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম বলেই কি রেগেমেগে কেউ এসে খুন করে রেখে গেছে বাবাকে?'

'কি জানি! এখানকার ইনডিয়ানদের স্বভাব তো আমি জানি না। তবে অঞ্চলটা বড় বেশি আদিম। এখানে যা খুশি ঘটতে পারে।'

পিটারের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কষ্টে ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে ওর। 'মৃত্যু আমার কাছে নতুন কিছু নয়,' বিড়বিড় করে বলতে লাগল সে। 'র‍্যাঞ্চে বাস করি। প্রকৃতির মাঝে। এখানে যখন-তখন যে-কেউ মারা যেতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক। বাবা অমর ছিল না। আমরা কেউ নই। মেনে নিতেই হবে...'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'কিন্তু আমি যদি এর জন্যে দায়ী হয়ে থাকি...যদি আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসি বাবার মৃত্যুর কারণ,' চোখের পানি ঠেকানোর চেষ্টা করল পিটার, 'তাহলে নিজেকে...নিজেকে...'

আর পারল না সে। ভেঙে পড়ল। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সমবেদনায় একটা হাত রাখল রবিন ওর কাঁধে। মুসাও উঠে এল। কি বললে, কি করলে একটু সান্ত্বনা পাবে পিটার, ভাবতে লাগল। করার মত কিছুই খুঁজে না পেয়ে শেষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কেঁদেকেটে নিজে নিজেই শান্ত হোক পিটার, সে-ই ভাল।

পনেরো

থ্রী সার্কেল র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোনোর পর এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। একটানা গাড়ি চালিয়ে চলেছেন শেরিফ। গাড়িতে ওঠার পর থেকে একটা কথাও বলেননি তিনি । এমনকি হুইটম্যানের মৃত্যুর ব্যাপারেও নয়। কোথায় যাচ্ছেন, কার কাছে, তাও বলেননি।

মিনিট দশেক আগে হাইওয়ে থেকে নেমে এসেছেন একটা কাঁচা রাস্তায়। বনের ভেতর ঢুকে গেছে পথটা।

কাঁচা রাস্তা থেকে আবার মোড় নিলেন তিনি। সামনে একটা কাঠের কেবিন দেখা গেল। ওটার দিকে এগোলেন।

কেবিনের ছাত ধরে রেখেছে যে সব খুঁটি, তার মধ্যে একটার মাথা বারান্দার ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ওই মাথায় বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা গরুর খুলি। তার নিচে ফালি করে কাটা কয়েক রঙের কাপড় পেঁচিয়ে বাঁধা। খোলা মাথাগুলো বাতাসে উড়ছে। মোট ছয় রঙের কাপড়। ইনডিয়ানদের এ ভাবে কাপড় লাগানোকে বলে প্রেয়ার টাইজ। হলুদ রঙ পুব দিকের জন্যে, সাদা দক্ষিণ, কালো পশ্চিম, লাল উত্তর, নীল ওপর অর্থাৎ আকাশের দিক, আর সবুজ মাটির দিক বোঝানোর জন্যে। একবার একজন ল্যাকোটা

ইনডিয়ান ওঝাকে একটা বাড়িতে ভূত তাড়ানোর অনুষ্ঠানে প্রেয়ার টাইজ বাঁধতে দেখেছিল কিশোর। একটা করে কাপড় বাঁধছিল ওঝা, আর একবার করে মন্ত্র পড়ছিল ওদিকে বসবাসকারী আত্মার উদ্দেশে।

কেবিনের একপাশে এক আঁটি লাকড়ি বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। ভাঙা, পুরানো, মরচে পড়া গাড়ি আর মোটর সাইকেলের বডি ছড়িয়ে আছে চারপাশে। একটিমাত্র সচল পিকআপ দাঁড়িয়ে আছে কেবিনের কাছাকাছি। তবে সেটাও কম পুরানো নয়।

পিকআপের পাশে এনে গাড়ি রাখলেন শেরিফ।

নামল কিশোর।

নেমে এসে শেরিফ বললেন, 'এটা রিশের বাড়ি।'

রিশ কে, জিজ্ঞেস করার আগেই খুলে গেল দরজা।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পুল হলের সেই ধূসর চুলওয়ালা বুড়ো লোকটা। শান্ত, টলটলে চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এতটুকু অবাক হয়নি। মুখ দেখেই বোঝা গেল, ওদের প্রতীক্ষাতেই বসে ছিল সে। যেন জানত, ওরা আসবে।

হাতের ইশারায় কিশোর আর বারজারকে ঘরে যেতে বলল রিশ।

বারজারের পেছন পেছন ঢুকল কিশোর। লম্বা একটা ঘরকে দুই ভাগ করা। একভাগে রান্নাঘর, আরেক ভাগে বেডরুম। অনেকগুলো মোম আর ছোট ছোট বাতি জ্বালানো হয়েছে। বাতাসে সিডারের মিষ্টি গন্ধ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় কোন চিন্তাবিদ কিংবা দার্শনিকের ঘর।

গাদা গাদা বই ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। একটা বেশ বড় বিছানায় উলের চাদর পাতা। বোনা হয়েছে খাঁটি নেভাজো ইনডিয়ানদের কায়দায়। জ্যামিতিক ডিজাইনের অলঙ্করণ। একটা বর্ম ঝোলানো দেয়ালে। এককালে এ ধরনের বর্ম পরে যুদ্ধে বেরোত রিশের পূর্বপুরুষরা। এখন বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানে শুধু ওঝারা ব্যবহার করে থাকে এ জিনিস।

আরেকদিকের দেয়ালে সাঁটা সিটিং বুলের ছবি ছাপা একটা বড় পোস্টার। সিউজ ইনডিয়ানদের নেতা ছিলেন সিটিং বুল। ১৮৬৮ সালে আমেরিকান সরকারের সঙ্গে ইনডিয়ানদের শান্তিচুক্তিতে সই করেছিলেন তিনিও। তারপর যখন বেঈমানী করল সরকার, চুক্তিভঙ্গ করল, যোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ করে বসলেন আমেরিকান সৈন্যদের। ব্যাটল অভ লিটল বিগহর্নের যুদ্ধে তাঁর যোদ্ধাদের হাতে শোচনীয় পরাজয় ঘটল জেনারেল কাস্টারের সেনাবাহিনীর।

ইনডিয়ান আর আমেরিকান সরকারের মাঝে তিক্ত সম্পর্কের এক জলজ্যান্ত প্রমাণ যেন ওই পোস্টার। বার বার ইনডিয়ানদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে সরকার, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। আমেরিকানদের যে ঘৃণা করে এখন ইনডিয়ানরা, সেজন্যে ওদের দোষ দিতে পারল না কিশোর।

মগ ভর্তি ধূমায়িত চা এনে দিল রিশ, ইনডিয়ানদের প্রিয় হার্ব টী। কাঠের মেঝেতে পাতা রঙচটা কম্বলের ওপর বসল। কিশোর আর শেরিফকেও বসতে ইশারা করল। কেন এসেছে ওরা, জিজ্ঞেস করল না। জানা আছে ওর।

'হুইটম্যানকে কে খুন করেছে জানতে এসেছ তো?' ভূমিকা না

করে সরাসরি আসল কথায় চলে এল রিশ, 'জানি কে করেছে। নিজের চোখে একটাকে দেখেছিলাম। বহুদিন আগের কথা। এতই আগের, স্বপ্নের মত মনে হয়। তখন আমি খুব ছোট।'

'১৯৪৬ সালে?' প্রশ্ন করল কিশোর, 'হেইফার গুনের কেস?'

মাথা ঝাঁকাল রিশ। সমীহ মেশানো নতুন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। শান্তকণ্ঠে বলল, 'বিদেশীদের মধ্যে তুমি অনেক আলাদা, ইয়াং ম্যান। ইনডিয়ানদের ব্যাপারে অনেক ইনডিয়ানের চেয়েও জ্ঞান তোমার বেশি।'

আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিলেন শেরিফ। তাঁকে খোঁচা মেরেই কথাটা যে বলেছে রিশ, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

আবার কিশোরের দিকে ফিরল বুড়ো ইনডিয়ান। 'তোমার নামের মধ্যেও একটা ইনডিয়ান ইনডিয়ান গন্ধ রয়েছে। পাশা। রিশা, ঈশা, এ সব নাম হয় ইনডিয়ানদের। পাশাও রাখা যেতে পারে। ভাল লাগে শুনতে। ছন্দ আছে।'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। ওকে আপন করে নিয়েছে রিশ। অতএব যা জিজ্ঞেস করবে এখন, জবাব পাওয়া যাবে। হেসে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তবে বাড়িয়ে প্রশংসা করছেন আমাকে।'

'না, তা করছি না,' বিন্দুমাত্র ভাব পরিবর্তন হলো না রিশের চেহারার। 'ছয়টা পবিত্র দিকের কথাও নিশ্চয় জানা আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হঠাৎ করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল কেন রিশ, বুঝতে পারল না। বলল, 'আছে। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ওপর এবং নিচ।'

আলোর ঝিলিক দেখা গেল রিশের চোখে। 'একটুও বাড়িয়ে বলিনি তোমার সম্পর্কে। সাধারণ ভাবে ছয়টা দিককেই ধরে থাকে সবাই। তবে আরও একটা দিক আছে। সেটা কি জানো?'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'না জানাটাই স্বাভাবিক,' রিশ বলল। 'এটা জানে কেবল ওঝা আর যারা দিক নিয়ে চর্চা করে, তারা। যদি খুনের তদন্ত করতে চাও, এই সপ্তম দিকটাই তোমাকে পথ দেখাবে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে রিশের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'সাত নম্বর এই দিকটা কোথায় আছে সহজেই বলে দেয়া যায়। কিন্তু সেটাকে খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন।' নিজের বুকে হাত রাখল রিশ, 'এই যে, এখানে থাকে এই সপ্তম দিকটা। হৃৎপিণ্ডে। এটার কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে তোমাকে, তোমার কি করা উচিত।'

চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর। এই সপ্তম দিকটার কথা জানে সে-ও। বুড়োর বলার ধরনে প্রথমে বুঝতে পারেনি। ও জানে, মনোবিজ্ঞানে একে বলে ইন্‌স্টিঙ্কট বা সহজাত প্রবৃত্তি। ওর সে বেশ প্রবলভাবেই আছে। এই ক্ষমতার বলে অনেক কিছু আগে থেকেই আঁচ করে ফেলতে পারে সে। সেজন্যে অবাক হয় ওর দুই সহকারী মুসা আর রবিন।

আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এই দিকটার কথাও আমি জানি, রিশ। কিন্তু এমন ভাবে বললেন, প্রথমে ধরতে পারিনি। যাই হোক, ছেলেবেলায় আপনি কি দেখেছিলেন, বলুন।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রিশ। ফিরে গেল ছেলেবেলার

স্মৃতিতে। 'প্রায়ই বনে যেত হেইফার গুন। একদিন একা পেয়ে কি একটা জানোয়ার জখম করল তাকে। আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেল ক্ষতগুলো। ভাল হয়ে উঠল সে। ভুলে গেল সবাই। এবং তারপরই শুরু হলো খুন।

'আমাদের ধারণা, বনের মধ্যে স্বাভাবিক কোন জানোয়ার নয়, ম্যানিটোর হামলার শিকার হয়েছিল গুন। এই ম্যানিটো নামটা দিয়েছে অ্যালগোনোকুইয়ান ইনডিয়ানরা। এর মানে হলো 'প্রচণ্ড ক্ষমতাধর'—প্রকৃতির সবখানে ছড়িয়ে আছে এই মহাক্ষমতাশালী শক্তি। তবে ম্যানিটোর আরেকটা মানেও আছে। সেটা হলো দুষ্ট ভূত, যে, যে কোন সময় যে কোন রূপ নিতে পারে, মানুষকে পশুতে রূপান্তরিত করতে পারে। কোন মানুষকে যদি জখম করে এই ম্যানিটো, সেই মানুষটিও তখন ম্যানিটো হয়ে যাবে।'

'ড্রাকুলার মত,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'কিসের মত?'

'ড্রাকুলা!'

মাথা ঝাঁকাল রিশ, 'হ্যাঁ, ড্রাকুলা। ঠিকই বলেছ। সেই রক্তচোষা ভূত, রক্ত খাওয়ার জন্যে যে পাগল হয়ে ওঠে। যাকে কামড়ায় সেই মানুষটিও ড্রাকুলার মত ভূত হয়ে যায়। তারও তখন প্রয়োজন হয় রক্তের। ম্যানিটোও প্রায় একই জিনিস, চেহারাটা কেবল ভিন্ন। আরও একটা তফাৎ আছে ড্রাকুলার সঙ্গে। ড্রাকুলা দাঁত ফুটিয়ে ফুটো করে কারও রক্ত খেলে তবেই সে ড্রাকুলায় পরিণত হয়, কিন্তু ম্যানিটো কারও গায়ে আঁচড় দিলেও সেই লোক ম্যানিটো হয়ে যায়। শেষবার যার রক্ত খায়, তার রক্ত বইতে থাকে

ধমনীতে। আগের রক্ত আর থাকে না।'

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। 'হল ব্ল্যাকভালচারের শুকনো ক্ষতগুলো...'

আবার মাথা ঝাঁকাল রিশ, 'হেইফার গুনের শুকিয়ে যাওয়া জখমগুলোর মতই ছিল। দুজনকেই ম্যানিটোতে জখম করেছিল এবং দুজনেই ম্যানিটো হয়ে গিয়েছিল। ড্রাকুলার মত ম্যানিটোও হামলা চালায় রাতের বেলা। রক্তের নেশায় পাগল হয়ে ওঠে। বদলে যায় ওর মনুষ্যরূপ। কুৎসিত চেহারার প্রচণ্ড শক্তিধর দানবে পরিণত হয় তখন। গায়ের জোরে কোন জানোয়ারই ওর সঙ্গে টিকতে পারে না, কেউ দাঁড়াতে পারে না সামনে। রক্তের নেশা মিটে গেলে সেই দানব আবার মানুষ হয়ে যায়। কি করেছিল, কি ঘটিয়েছে ভুলে যায় সব। কিছুতেই মনে করতে পারে না আর। কিন্তু রক্তের তৃষা মেটে না। পরদিন আবার একই ঘটনা ঘটায়। চলতে থাকে এ রকম করে। যতদিন না তার মৃত্যু হয়, ম্যানিটো হওয়া থেকে আর রেহাই নেই, ম্যানিটো তাকে হতেই হবে।'

শেরিফের দিকে তাকাল কিশোর। রিশের কথা বিশ্বাস করছেন কিনা, বোঝার চেষ্টা করল।

সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে রিশ, যেন চোখের সামনে ফুটে উঠেছে তার অতীত। 'আমার বয়েস তখন ষোলো। একরাতে কাট ব্যাংক ক্রীক থেকে মাছ ধরে ফিরছি। শর্টকাট একটা রাস্তা ছিল, হেইফার গুনের ঘরের পেছন দিয়ে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে সেদিক দিয়ে চলেছি, এই সময় কানে এল গোঙানির শব্দ...জানোয়ার নয়, মানুষের। কৌতূহল দমাতে না পেরে জানালা

দিয়ে উঁকি দিলাম। রক্ত আর ঘামে মাখামাখি হয়ে গেছে গুনের শরীর। ভয়াবহ, অকল্পনীয় যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে সে। চোখের সামনে দেখলাম ওর হাতের চামড়া চিরে গেল, ফাঁক হয়ে খুলে পড়তে লাগল সাপের খোলস ছাড়ানোর মত...মাটিতে পড়ে গেল আলগা চামড়াটা...'

র‍্যাঞ্চ হাউসে পাওয়া হাতের চামড়াটার কথা ভাবল কিশোর।

'হাতের আঙুলের মাথা থেকে গজিয়ে উঠতে লাগল বড় বড় বাঁকা নখ,' বলে চলেছে রিশ। 'যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল সে। আমাকে দেখে ফেলল...'

নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলল বুড়ো। সেরাতে যা দেখেছিল, সহ্য করতে পারছে না যেন। মনে হয় ভয় পাচ্ছে, আবার চোখের সামনে এসে উদয় হবে সেই আতঙ্ক। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল। কিশোরের ভয় হলো, কাহিনীটা শেষ করবে না।

কিন্তু চোখ মেলল আবার রিশ। আবার যখন কথা বলল, আগের মত শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। যেন মনের জোরে দূর করে দিয়েছে সমস্ত ভয় আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। 'গুনের চোখ দুটো তখনও মানুষের মতই আছে। নীরবে আকুতি জানাচ্ছিল যেন আমি ওকে মেরে ফেলি। খুন করে বাঁচাই। সঙ্গে যদি সেদিন আমার রাইফেলটা থাকত, নির্দ্বিধায় গুলি করতাম ওকে। কিন্তু ছিল না। তা ছাড়া বয়েসও কম ছিল আমার। আর থাকার সাহস পেলাম না। ও দেখে ফেলার পর একটা মুহূর্ত আর দেরি না করে ঘুরে দিলাম দৌড়...দৌড়, দৌড়, দৌড়...একেবারে বাড়িতে...'

'এরপর গুলি খেয়েই মরেছিল, তবে পুলিশের হাতে,' কিশোর

বলল, 'তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রিশ। 'কিন্তু ও মারা গেলেও ম্যানিটো মরল না। আবার জেগে উঠল।'

'আট বছর পর,' আনমনে নিজেকেই যেন কথাটা বলে রিশের দিকে তাকাল কিশোর। 'কিন্তু হেইফার তো নেই তখন। ম্যানিটো আবার হামলা চালাল কার ওপর ভর করে?'

'হেইফারের একটা ছেলে ছিল। ওর মধ্যেও ঢুকে গিয়েছিল ম্যানিটো। শুধু যে জখম হলে রক্তের মধ্যে ঢুকে যায় ম্যানিটোর বিষ, তা নয়; জন্ম সূত্রে বাবা-মায়ের কাছ থেকেও সন্তানের দেহে চলে যায়। রক্তের সম্পর্কিত নিকট আত্মীয় যারা খুব কাছাকাছি বাস করে, তাদের দেহেও যেতে পারে।'

'বাপরে! ড্রাকুলার চেয়েও ভয়ঙ্কর!' বলে শেরিফের দিকে তাকাল কিশোর। 'মারাত্মক ছোঁয়াচে!'

এখানে ঢোকার পর এই প্রথম মুখ খুললেন শেরিফ, 'টিরানা!'

হতে পারে। কিন্তু কেন যেন ওকে ম্যানিটো ভাবতে ইচ্ছে করল না কিশোরের।

'যদি আপনার কথামত ম্যানিটো হয়ে গিয়ে থাকে হল,' রিশের দিকে তাকিয়ে শেরিফ বললেন, 'কার কাছ থেকে পেয়েছিল রোগটা? বাপের?'

'ম্যানিটো কোন রোগ নয়,' গম্ভীর স্বরে শুধরে দিল রিশ। ইনডিয়ান বিশ্বাসের প্রতি শেরিফের এই অনাস্থা পছন্দ হলো না তার। 'তা ছাড়া ওর বাপ ম্যানিটো ছিল না। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।'

'ঠিক আছে, আপনার কথাই সই—ভূত,' হাত তুলে মেনে নেয়ার ভঙ্গি করলেন শেরিফ। 'ওটা আছর করেছিল হলকে। যেহেতু খুব কাছাকাছি থাকত ভাই আর বোন, টিরানার দেহেও চলে যায় বিষটা। সেও ম্যানিটো হয়ে গেছে। কাল রাতে ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে খুন করেছে ডেভিড হুইটম্যানকে।'

ষোলো

বাইরে একটা গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো। একবার গর্জে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল।

একটানে খাপ থেকে পিস্তল বের করে আনলেন শেরিফ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রিশের দেহেও। বিছানার নিচে হাত ঢুকিয়ে মুহূর্তে টেনে বের করল একটা একশো বছরের পুরানো রাইফেল।

পা টিপে টিপে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে। শব্দ করলে চলে যেতে পারে লোকটা, ধরা যাবে না আর।

সোজা গোলাঘরের দিকে রওনা হলেন শেরিফ।

রিশকে দরজার কাছে থাকতে ইশারা করে বাড়ির পাশ ঘুরে সামনের দিকে এগোল কিশোর। বুক কাঁপছে ওর। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। কি দেখতে পাবে জানে না। রিশের কেবিন, পরিবেশ, বলার ধরন, ভূতের গল্প—সব মিলিয়ে কেমন একটা ভূতুড়ে আবহ তৈরি করে ফেলেছে। ক্ষণিকের জন্যে কল্পনায় উদয় হলো একটা বিকৃত চেহারা, রক্তাক্ত শরীর; মনে হলো যেন এখনই সামনে

দেখতে পাবে ডেভিড হুইটম্যানের প্রেতাত্মাকে। ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে দিল মাথা থেকে। দূর, কি আবল-তাবল ভাবছে! ভূত বলে কিছু নেই! তবু সতর্ক রইল। এ শত্রু ভূতের চেয়ে ভয়ঙ্কর। মানুষ মারতে তার হাত কাঁপে না।

পুরানো গাড়ির বডিগুলোর ওপর চোখ বোলাল সে। যে কোনটার আড়ালে মানুষ লুকিয়ে থাকা সম্ভব।

আবার হলো এঞ্জিনের শব্দ। কয়েকবার গোঁ গোঁ করে আবার বন্ধ।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। এঞ্জিন চালু হওয়ার মত একটা গাড়িই চোখে পড়ল—রিশের পিকআপটা। শব্দটাও আসছে ওদিক থেকেই। ইগনিশন কী না পেয়ে তার ছিঁড়ে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে।

তার মানে ভূতও নয়, অপার্থিব কোন জন্তুও নয়, মানুষ। সঙ্গে অস্ত্র থাকতে পারে লোকটার। তাই মাথা নিচু করে সাবধানে সেদিকে এগোল কিশোর।

গাড়ির এগজস্ট পাইপ দিয়ে বেরিয়ে এল একঝলক ধূসর ধোঁয়া। স্টার্ট হয়ে গেল এবার। ড্রাইভিং সীটে সোজা হয়ে বসল একটা মেয়ে।

'টিরানা!' চিৎকার করে উঠে দৌড় দিল কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখল শেরিফও ছুটে আসছেন।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল টিরানা। শেরিফকে দেখে ভয়ে বড় বড় হয়ে গেল কালো চোখ। সামনে আর আশেপাশে এত বেশি গাড়ির জঞ্জাল হয়ে আছে, পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগোনো খুব কঠিন।

বেরোতে হলে একমাত্র পথ পিছানো। তা-ই করল সে। পিছিয়ে গিয়ে সামান্য খোলা জায়গা পেতেই আবার সামনের গিয়ার দিয়ে ডানে কাটার চেষ্টা করল।

কিশোরের আগে পৌঁছে গেলেন শেরিফ। লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন গাড়ির রানিং বোর্ডে। খোলা জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে গিয়ার শিফট টেনে এঞ্জিনের গতি স্তব্ধ করে দিলেন।

চিৎকার শুরু করে দিল টিরানা। কি বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। খেপার মত চিৎকার করছে।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেললেন শেরিফ। টিরানাকে বের করে আনতে যেতেই হাত-পা ছুঁড়ে আরও জোরে চিৎকার শুরু করল সে। উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। কোন কিছুরই পরোয়া করলেন না শেরিফ। কর্দমাক্ত মাটিতে টেনে নামালেন ওকে। কঠোর স্বরে ধমক দিলেন, 'গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছিলে কেন?'

বিধ্বস্ত লাগছে টিরানাকে। আগের রাতে অনুষ্ঠানের সময় যে কাপড়ে দেখেছিল ওকে কিশোর, তাই পরে আছে এখনও। জিনসের প্যান্টে কাদা। লম্বা, বাদামী চুলে জট। শুকনো কুটো, পাতা, এ সব লেগে আছে। গালে ঘাম আর চোখের পানির দাগ। থরথর করে কাঁপছে ও।

এগিয়ে এল রিশ। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, টিরানা? ওরকম করে পালাতে চাইছিলে কেন?'

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না টিরানা। হাঁটু গেড়ে বসে ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমি ওটাকে দেখেছি! হুইটম্যানকে খুন করতে দেখেছি!'

ওর হাত ছেড়ে দিলেন শেরিফ। বিমূঢ়ের মত তাকাতে লাগলেন একবার কিশোরের দিকে, একবার রিশের দিকে।

হাতের রাইফেলটা কিশোরের হাতে দিয়ে টিরানাকে টেনে তুলল রিশ। ওর বাহু আঁকড়ে ধরে রাখল মেয়েটা। চোখে আতঙ্ক। রিশের জ্যাকেটে মুখ চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগল। এতই বেশি, কথা বলতে পারছে না।

অনেকক্ষণ পর কিছুটা শান্ত হয়ে এলে বলল, 'কাল রাতে অনুষ্ঠানের পর আমি র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলাম। পিটারের সঙ্গে ঝগড়া করতে। ওকে দেখলাম না। ভাবলাম, বাইরে থেকে ফেরেনি। লুকিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুইটম্যান তখন বারান্দায় বসেছিল। তারপর...তারপর...ওই জন্তুটা...' দুহাতে মুখ ঢেকে আবার ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'কি যে ভয় পেয়েছিলাম...রাতটা যে কিভাবে পার করলাম, উফ্!...আজ সারাটা দিন লুকিয়ে রইলাম ঝোপের ভেতর। শেষে মনে হলো, বাঁচতে হলে এ এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। তাই এসেছিলাম গাড়িটা নিতে...'

আবার ফোঁপাতে শুরু করল সে।

কি করবে বুঝে উঠতে পারলেন না শেরিফ। নীরবে তাকালেন কিশোরের দিকে।

হাত ধরে টানল রিশ, 'এসো, ভেতরে চলো। আর কোন ভয় নেই তোমার।'

গভীর ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটল কয়েকবার। রিশ বলেছে ম্যানিটো যেই হোক, সে কাউকে খুন করলে পরদিন তার আর কিছু মনে থাকে না। সে যে

দানবে পরিণত হয়েছিল, সেটাও মনে করতে পারে না। যেহেতু মনে করতে পারছে, ধরে নেয়া যায় টিরানা ম্যানিটো হয়নি। হুইটম্যানকে সে খুন করেনি। মিথ্যে যে বলছে না, এই আতঙ্কিত হয়ে পড়াই তার প্রমাণ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, টিরানা যদি খুনী না হয়ে থাকে, তাহলে খুনী কে?

সতেরো

টিরানাকে ভেতরে নিয়ে গেল রিশ। একটা কম্বল জড়িয়ে দিল ওর গায়ে। 'চুপ করে বসো এখানে। আমি চা নিয়ে আসি।'

টিরানার পাশে বসলেন শেরিফ। 'তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, হলের কাঁধের দাগগুলো সম্পর্কে। আশা করি সত্যি জবাব দেবে। ওগুলো কি নখের আঁচড়?'

মাথা ঝাঁকাল টিরানা। ঘরের মধ্যে মানুষের সঙ্গে থেকে ভয় অনেকটা দূর হয়েছে ওর। শান্ত হয়েছে আগের চেয়ে। 'কয়েক মাস আগে হ্যানব্লিসিয়া সাধনা করতে ব্ল্যাক মাউন্টেনে গিয়েছিল হল।'

ল্যাকোটা শব্দ হ্যানব্লিসিয়া, জানে কিশোর। এর বাংলা করলে দাঁড়ায় 'দৃষ্টির সন্ধানে'। ইনডিয়ান সমাজে হ্যানব্লিসিয়া অনেক পুরানো বিদ্যা। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্যে এই সাধনা করে ওরা। পর্বতের চূড়ায় চার দিন চার রাত একটানা জেগে বসে থাকতে হবে। শোয়া, খাওয়া, ঘুম কোনটাই চলবে না। প্রয়োজনে সামান্য পানি খাওয়া যেতে পারে কেবল। প্রতিটি মুহূর্ত জেগে থেকে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রার্থনা করে যেতে হবে।

'পর্বত থেকে যখন ফিরে এল ও,' টিরানা বলল, 'ওর কাঁধে দেখলাম তিনটে গভীর আঁচড়ের দাগ। তখনও রক্ত বেরোচ্ছিল। কি করে হয়েছে জানতে চাইলাম। ও হেসে বলল প্রেতের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে।'

'সত্যি কথাই বলেছে,' টিরানার হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল রিশ।

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। লাফ দিয়ে উঠে চলে গেল ফোনের কাছে। যে হাসপাতালে পিটারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে ফোন করল। মুসা আর রবিনকে সাবধান করে দেয়া দরকার।

ফোন ধরল রিসিপশনিস্ট। কিশোর বলল, 'পিটার হুইটম্যান নামে একজন লোককে আজ সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে কি আছে?'

লাইনে থাকতে বলা হলো কিশোরকে। ওর মনে হলো প্রায় একযুগ পর ওপাশ থেকে জবাব এল, 'হ্যালো?'

এত অস্পষ্ট, চিনতে পারল না কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'রবিন?'

'আমি ডাক্তার বেন,' আরেকটু স্পষ্ট হলো কণ্ঠটা। অনেক ভারি লাগল এখন।

'ও। আমার নাম কিশোর পাশা। রবিন মিলফোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাই। পিটার হুইটম্যানের সঙ্গে গেছে সে।'

'ওরা তো চলে গেছে। রিলিজ করে দেয়া হয়েছে পিটারকে।'

'কখন বেরোল?'

'এই তো, কয়েক মিনিট আগে,' ডাক্তার বললেন। 'আপনি কি পিটারের কেউ হন?'

'না। কেন?'

'আত্মীয় না হলে...'

'আমরা ওর বন্ধু। শুভাকাঙ্ক্ষী। বহুদূর থেকে ওর বাবার এক বন্ধু আমাদের পাঠিয়েছেন ওদের সাহায্য করতে। আপনার যা বলার, নির্দ্বিধায় বলতে পারেন আমাকে।'

'পিটার সুস্থ হয়নি পুরোপুরি। কিন্তু বেরোনোর জন্যে এমন জোর করতে লাগল, না ছেড়ে দিয়ে পারলাম না। ওর দিকে ভালমত নজর রাখা দরকার। প্রয়োজন হলে আবার ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে।'

'রাখব,' বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে কিশোরের। বুঝল, আরও কোন কথা আছে ডাক্তারের।

'হ্যালো, শুনছেন?' ওপাশ থেকে ভেসে এল আবার ভারি কণ্ঠস্বর।

'আমাকে আপনি আপনি করার প্রয়োজন নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'আমার বয়েসও মুসা আর রবিনের মত। তুমি করে বলুন। আপনি শুনতে অস্বস্তি লাগছে।'

'কি নাম তোমার?'

'কিশোর...'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিশোর। শুরুতেই তো বলেছ। তো শোনো কিশোর, পিটারের রক্তের মধ্যে একটা অদ্ভুত গণ্ডগোল রয়েছে। আর কোন মানুষের রক্তে এই জিনিস দেখিনি। ডাক্তারি ভাষায় এর

ব্যাখ্যা দিতে গেলে হয়তো বুঝতে কষ্ট হবে তোমার, তাই সহজ করেই বলি—রক্তটা মানুষ আর পশুর রক্তের এক বিচিত্র মিশ্রণ, যেন রক্তের ঘাটতি পড়ে যাওয়ায় শিরা দিয়ে পশুর রক্ত ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওর শরীরে। এ এক অসম্ভব ব্যাপার! কি করে বেঁচে আছে ও বুঝতে পারছি না! সেজন্যেই বলছি যে কোন সময় আবার হাসপাতালে নিয়ে আসার প্রয়োজন পড়তে পারে ওকে।'

পাথর হয়ে গেছে যেন কিশোর। কানে বাজছে রিশের কথা: ম্যানিটো কারও গায়ে আঁচড় দিলেও সেই লোক ম্যানিটো হয়ে যায়...শেষবার যার রক্ত খায়, তার রক্ত বইতে থাকে ধমনীতে...

শেরিফের সন্দেহ অমূলক—টিরানা ভূত হয়নি, হয়েছে পিটার হুইটম্যান! কিন্তু পশুর রক্ত যাবে কি করে তার দেহে? হত্যা তো করেছে নিজের বাপকে। নাকি তারপরে আবার কোন জানোয়ার মেরে তার রক্ত খেয়েছিল?

কি ভয়ানক ভাবনাগুলো অবলীলায় ভাবছে ভেবে নিজেই অবাক হলো সে। রিশের কথা মেনে নিলে ধরে নিতে হবে ম্যানিটোর হামলার শিকার হয়েছে পিটার। ম্যানিটো ওকে জখম করেছে। রক্তের প্রয়োজনে সে নিজেও ম্যানিটো হয়ে গিয়ে প্রথম যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই আক্রমণ করে রক্ত খেয়েছে। দানব হয়ে নিজের বাপকেও চিনতে পারেনি, রেহাই দেয়নি।

ওপাশ থেকে কথা শোনা গেল, 'হ্যালো, কিশোর, শুনতে পাচ্ছো?'

চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল সে। খেয়াল হলো কানে চেপে ধরে আছে রিসিভার। কোনমতে বলল, 'হ্যাঁ, শুনছি। আপনার কি

ধারণা? কিভাবে ঘটল এটা?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমিও। আরও কিছু জিনিস লক্ষ করেছি—ওর দেহকোষের মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। থেকে থেকে রূপ বদল করছে ওগুলো। সন্দেহ নেই, এটা রোগ। কিন্তু কি রোগ বলতে পারব না! চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রকম রোগের কথা আর শুনিনি আমি।'

'রোগটা কি ছোঁয়াচে হতে পারে? কি মনে হয় আপনার?'

'হতে পারে, জানি না। পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না। নমুনা রেখে দিয়েছি। আজই দেখব। কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছি আমি।'

'কি রেজাল্ট পেলেন, দয়া করে জানাবেন। কাল আমিই নাহয় একবার ফোন করব আপনাকে।'

'ঠিক আছে, কোরো। রোগটা সারানোর ব্যবস্থা করতে হবে ওর।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ডাক্তার বেন...থ্যাংক ইউ এগেন।'

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। পশ্চিম দিগন্তে রক্তলাল আগুনের বল তৈরি করে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। তার ছটার লালিমা এসে কেবিনের ভেতরটাও লালচে করে তুলেছে। এ মুহূর্তে কেমন অপার্থিব লাগল আলোটাকে।

অন্ধকারের বেশি বাকি নেই। আবার কানে বাজতে লাগল রিশের কথা: ড্রাকুলার মতই ম্যানিটোও হামলা চালায় রাতের বেলা। রক্তের নেশায় পাগল হয়ে ওঠে।...রক্তের নেশা মিটে গেলে সেই দানব আবার মানুষ হয়ে যায়। কি করেছিল, কি ঘটিয়েছে ভুলে যায় সব।...কিন্তু রক্তের তৃষা মেটে না। পরদিন

আবার একই ঘটনা ঘটায়। চলতে থাকে এ রকম করে। যতদিন না তার মৃত্যু হয়...

গতরাতে খুন করেছে পিটার। সকালে ভুলে গেছে। নিশ্চয় রক্তের তৃষ্ণা মেটেনি। আজ রাতে আবার দানব হবে সে। রক্তের নেশায় পাগল হবে। কাল র‍্যাঞ্চে ছিল ওর বাবা। আজ আছে রবিন আর মুসা।

*

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। পশ্চিমে চলেছে আবার। সামনে বিছিয়ে আছে পথ। পেছনের সীটে জানালার গায়ে হেলান দিয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে পিটার। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই—ভাবছে পাশে বসা রবিন। আগের রাতের ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই বাবার মৃত্যু সংবাদের মত আরেকটা বড় রকমের আঘাত একেবারে ধসিয়ে দিয়েছে বেচারাকে।

কি করবে ও এখন? র‍্যাঞ্চটা রেখে দেবে? নিজে চালানোর চেষ্টা করবে? পারবে একা? নাকি বাবার স্মৃতি সারাক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে ওকে?

নড়ে উঠল পিটার। আস্তে মেলল চোখের পাতা। বাইরে তাকাল। ওর চোখের দিকে তাকালে এখন পরিবর্তনটা ধরে ফেলত রবিন। বদলে যাচ্ছে পিটারের দৃষ্টি। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কোনমতেই মানবিক ব্যাপার বলা যাবে না একে।

মুসা গাড়ি চালাচ্ছে। নজর সামনের দিকে। অতএব পিটারের চোখের পরিবর্তনটা সেও দেখতে পেল না।

সোজা পথের শেষ মাথায় পশ্চিম দিগন্তে ডুবতে শুরু করেছে তখন লাল সূর্য।

আঠারো

পাহাড়ের ওপারে হারিয়ে গেল সূর্য। থ্রি সার্কেল র‍্যাঞ্চে যখন পৌছল ওরা পশ্চিম আকাশের শেষ রঙটুকুও মুছে গেল।

সারাদিন এতবার করে গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মুসা। তবু দায়িত্ব যখন নিয়েছে ওটা শেষ করতে হবে। পিটারকে নিরাপদে তার ঘরে পৌছে দিয়ে তারপর ছুটি।

চুপ করে আছে পিটার। কোন কথা বলছে না। রবিন ভাবল, বোধহয় ঘুমাচ্ছে এখনও।

র‍্যাঞ্চের গেটে মুসা গাড়ি থামালে নেমে গেল রবিন। গেটের খিল সরিয়ে পাল্লাটা খুলে দিয়ে এল। গাড়ি ঢোকাল মুসা। গেট বন্ধ করে দিয়ে আবার গাড়িতে এসে উঠল রবিন।

ধুলোয় ঢাকা লম্বা পথটা ধরে গাড়ি নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল মুসা। গোধূলি শেষের নীলচে আলোয় কেমন ভূতুড়ে লাগছে নির্জন বাড়িটা। পুবের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা।

পিটারের কাঁধ ধরে নাড়া দিল রবিন, 'পিটার, উঠুন। বাড়ি এসে গেছে।'

'উঁ!' অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে বিড়বিড় করে কি বলল পিটার। খুব ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামল। চারপাশে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়তে লাগল। যা ঘটে গেছে এখানে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বৃদ্ধ মানুষের মত সামান্য কুঁজো হয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। টলে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। দুদিক থেকে ধরে ওকে হাঁটতে সাহায্য করতে চাইল মুসা আর রবিন। হাত নেড়ে মানা করে দিল সে, লাগবে না।

বিশাল হলঘরটায় ঢুকল ওরা। আলো নেই। নীল.ঃচ অন্ধকার। ঠাণ্ডা, ভয়াবহ একধরনের শূন্যতা।

দরজা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ভালুকটার মাথায়। হাঁ করা মু..র ছায়া পড়েছে মেঝেতে। হঠাৎ করে সেদিকে তাকালে গা ছমছম করে ওঠে।

শিকারীদের অপছন্দ করে না মুসা, অন্তত যারা মাংসের জন্যে শিকার করে। কিন্তু ঘর সাজানো কিংবা পোশাকের বাহারের জন্যে জানোয়ার মারার পক্ষপাতী নয় ও। বরং যারা এ সব কাজ করে তাদেরকে নিষ্ঠুর, অমানুষ মনে হয়।

ভালুকটার দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল ওর। ভয়ে নয়, অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তিতে। ঘরটা শুরু থেকেই ওর পছন্দ হয়নি, এখন কেন যেন আরও খারাপ লাগতে লাগল। যেদিকেই তাকানো যায়, দেখা যাবে কোন না কোন মরা জানোয়ার এমন ভঙ্গি করে আছে, যেন জীবন্ত।

দরজাটা লাগিয়ে দিল পিটার। আলো জ্বালার জন্যে সুইচ টিপল।

জ্বলল না। আগের মতই অন্ধকার হয়ে রইল ঘরটা। আলো-আঁধারির খেলা।

রবিন বলল, 'ইলেকট্রিসিটি নেই বোধহয়।'

'না, নেই,' জবাব দিল পিটার। শুকনো, খসখসে কণ্ঠস্বর। 'প্রায়ই থাকে না এখানে। বড় যন্ত্রণা দেয়।' একটা টর্চ খুঁজতে শুরু করল সে। 'জেনারেটরটা চালানো দরকার।'

কিন্তু তিন পা যাওয়ার আগেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। সিঁড়ির পাশে মুখ থুবড়ে পড়ল। গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়।

দৌড়ে গিয়ে ধরল ওকে রবিন আর মুসা।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রবিন, 'খুব লেগেছে?'

পিটারের কপালে ঘাম। অন্ধকারে দেখতে পেল না রবিন। তবে ওর হাঁপানির শব্দ কানে আসছে স্পষ্ট। যেন বহুপথ দৌড়ে এসেছে।

'খুব খারাপ লাগছে আমার!' পিটার বলল। 'বমি আসছে। আমাকে বাথরুমে নিয়ে চলো!'

*

তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে একটা নিঃসঙ্গ জীপ। ঝিলিক ঝিলিক করে জ্বলছে ছাতের লাল-নীল আলোটা। গাড়ি চালাচ্ছেন শেরিফ উইল বারজার। পাশে বসা কিশোর। সেলুলার ফোনের নম্বর টিপে কানে লাগাল। অন্য পাশে . সিভার তোলার অপেক্ষা করছে অস্থির হয়ে।

রিঙ হচ্ছে। সেই সঙ্গে খড়খড় শব্দ।

মুখ বাঁকাল সে। END বাটন টিপে দিয়ে আবার চেষ্টা করল।

সেই একই শব্দ।

বার বার চেষ্টা করে দেখল সে। কোন লাভ হলো না।

হতাশ হয়ে যন্ত্রের সুইচ অফ করে দিল। 'যাচ্ছে না,' জানাল শেরিফকে। 'সিগন্যাল আটকে দিচ্ছে পর্বত। আর কদ্দূর?'

'মাইল সাতেক,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন শেরিফ। নজর সামনের দিকে। গ্যাস পেডাল চেপে ধরলেন যতটা যায়। এত জোরে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। আইনের লোক হয়েও পরোয়া করলেন না তিনি।

*

র‍্যাঞ্চ হাউসে আলো জ্বলছে। একটিমাত্র আলো। রবিনের টর্চের। হলঘরে বাথরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে। ভেতরে পিটারের বমি করার শব্দ কানে আসছে।

মুসার লাগছে অস্বস্তি। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। আবার কি পিটারকে হাসপাতালে নিতে হবে? আরেকবার এতটা পথ গাড়ি চালানোর কথা ভাবতেই দমে গেল সে। কিন্তু উপায় নেই। বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিয়ে যেতেই হবে।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল রবিন, 'দরজাটা খুলুন। আমরা এসে ধরি। মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন তো।'

জবাব দিল না পিটার। দম নিতে যে কষ্ট হচ্ছে ওর গলার ঘড়ঘড়ানি শুনেই বোঝা গেল।

অবাক লাগছে রবিনের। হাসপাতাল ছাড়ার সময় তো এতটা অসুস্থ ছিল না পিটার। তাহলে ডাক্তারই ওকে ছাড়তেন না। কি ঘটল? র‍্যাঞ্চে ফিরে কি বাবার স্মৃতি মনে করে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে?

সইতে পারেনি দুর্বল শরীর? ভোগাচ্ছে এখন? নাকি এমন কিছু ঘটেছে শরীরে যেটা ডাক্তার ধরতে পারেননি?

আবার বমি করতে শোনা গেল পিটারকে।

চিৎকার করে দরজা খুলতে বলল রবিন।

আগের মতই জবাব দিল না পিটার।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে মুসা।

নব ঘুরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। ভেতর থেকে নবের লক টিপে আটকে দিয়েছে পিটার।

*

ছোট বাথরুমটায় দাঁড়িয়ে আছে সে। সিংকে হেলান দিয়ে কোনমতে খাড়া রেখেছে নিজেকে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। ঘরের ভেতর গরম নেই। তবু ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেছে পিটারের শরীর।

টেনেটুনে জ্যাকেট খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। কিন্তু লাভ হলো না। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে বুক আর পিঠ বেয়ে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলতে পারছে না। তার ওপর শুরু হয়েছে ব্যথা। ভয়াবহ, তীব্র যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে যেন দেহের যন্ত্রপাতি, পেশী, চামড়া সব ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে।

আবার শুনতে পেল রবিনের চিৎকার।

'পিটার! পিটার, দরজা খুলুন!'

মুখ তুলে আয়নার দিকে তাকাল সে। বাথরুমের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতেও দেখতে পেল চোখের মণির চারপাশের সাদা অংশটুকু টকটকে লাল।

*

হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। পিটারের জবাবের অপেক্ষায়।

এল না জবাব।

অধৈর্য হয়ে আবার ডাকল রবিন, 'পিটার, কি করছেন? দরজা খুলছেন না কেন?'

ভীষণ অস্বস্তি লাগছে মুসার। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, পালাও এখান থেকে। ভয়ানক বিপদ। বলল না সেকথা রবিনকে। বললে বিশ্বাস তো করবেই না, হেসে উড়িয়ে দেবে। বলবে, ভূতের ভয়ে এমন করছে সে।

এবারও সাড়া না পেয়ে ঝুঁকে দরজার নবটা পরীক্ষা করে দেখল রবিন। পকেট থেকে একটা চাবির রিং বের করল। তাতে নেইল কাটার থেকে শুরু করে কোকের টিন কাটার উপযোগী ছোট ছোট কয়েকটা টুলস রয়েছে। নেইল কাটারের ছুরিটা বেছে নিল সে। নবের স্ক্রুর খাঁজে ঢুকিয়ে দিয়ে স্ক্রু-ড্রাইভারের মত ব্যবহার করে খুলতে শুরু করল।

*

ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেছে পিটার। প্রতিটি সেকেণ্ড যাচ্ছে, আর যন্ত্রণা আরও বাড়ছে। গরম ছুরি দিয়ে কেউ খোঁচাচ্ছে যেন তাকে। ভেতরের সব কিছু চিরছে।

ফিরে তাকিয়ে দেখল ডোরনব ঘিরে থাকা পিতলের পাতটা নড়তে আরম্ভ করেছে।

ওপাশ থেকে শোনা যাচ্ছে রবিনের চিৎকার, 'পিটার, শুনুন আমার কথা। দরজাটা খুলুন কষ্ট করে। আবার হাসপাতালে নিয়ে যাব আপনাকে। শুনছেন?'

'না, যাওয়া লাগবে না,' জবাব দিল পিটার, 'আমি ভাল আছি।'

শার্টের হাতায় মুখ মুছল সে। ঠাণ্ডা পানির কলটা খুলে দিল। মনে হলো পানিতে অনেকটা আরাম হবে। হলেই ভাল। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে যন্ত্রণা।

আঁজলা ভরে পানি এনে চোখে-মুখে ছিটাতে শুরু করল।

কয়েকবার ছিটিয়ে থেমে গেল। হাত দিয়ে চেপে ধরেছে মুখ। অসুস্থ লাগছে খুব। বেসিনের ওপর ঝুঁকে বমি করার চেষ্টা করল। কিছু বেরোল না।

শরীর গরম না বাথরুমের ভেতরটা গরম বুঝতে পারছে না। ওর মনে হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সহ্য করতে না পেরে শার্ট টেনে ছিঁড়ে ফেলল। কাঁধের আঁচড়গুলোতে ব্যাণ্ডেজ লাগানো। দেখতে পাচ্ছে না ক্ষতগুলো। কিন্তু ব্যথা টের পাচ্ছে। মনে হচ্ছে টকটকে লাল গরম ছুরি চেপে ধরা হয়েছে ওখানটাতে। ঘটছেটা কি ওর?

এটুকু বুঝল, যাই ঘটছে, সেটা ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বেসিনের কাছ থেকে সরে এসে সামনের দিকে বাঁকা করে ফেলল শরীর। সামান্য কম মনে হলো ব্যথাটা। আবার সোজা হতে গিয়ে পারল না। ঝটকা দিয়ে ওপর দিকে উঠে গেল মাথা। প্রচণ্ড ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপল সে।

চিৎকার করে উঠল। নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল শব্দটা। মানুষের চিৎকার নয়। জন্তুর গর্জন।

'পিটার!' চিৎকার করে ডাকল রবিন। 'কি হয়েছে? এমন করছেন কেন? আরে ভাই, খুলুন না দরজাটা!...মুসা, এসো তো

একটু এদিকে। টর্চটা ধরো। এই স্ক্রুটা খুলতে পারছি না।'

এখনও মোটামুটি চিন্তা করার ক্ষমতা আছে পিটারের। কি জবাব দেবে রবিনকে? কি করে বোঝাবে ওর ভেতরে কি ঘটে যাচ্ছে? এবং তারপরে চিন্তার ক্ষমতাও হারাল সে।

আয়নার দিকে চোখ পড়তেই হাঁ হয়ে গেল মুখ। পশুর চিৎকার বেরিয়ে এল গলা থেকে। মুখের ভেতর বড় বড় কুকুরে-দাঁত চোখে পড়ল।

দরজার অন্যপাশে শব্দ হচ্ছে। রবিন আর মুসার গায়ের গন্ধ পাচ্ছে এখন। লোভনীয় মনে হলো গন্ধটা। হাত বাড়িয়ে দিল জানালার পর্দার দিকে। ক্ষুরের মত ধারাল নখ দিয়ে চিরে ফালা-ফালা করল ভারি সুতির কাপড়।

গর্জে উঠল পিটার। মনে হলো আহত পার্বত্য সিংহ। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাওয়া হিংস্র জানোয়ার।

হাত মুঠো করে ফেলল সে। অবচেতন ভাবেই তাকাল সেদিকে। হাতের পিঠের চামড়া চিরে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

টুপ করে মেঝেতে খসে পড়ল চকচকে পাতলা চামড়ার এক টুকরো খোলস।

উনিশ

তীরবেগে ছুটছে জীপ। এর চেয়ে জোরে চালানো আর সম্ভব নয়। তবু কিশোরের মনে হচ্ছে জোরে চলছে না। আরও তাড়াতাড়ি করা দরকার।

রাত নেমেছে। মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে মনটানার পার্বত্যাঞ্চল। ম্যানিটো বেরোনোর সময় হয়ে গেছে। পিটার হুইটম্যান আর এখন মানুষ থাকবে না। ভয়াবহ জানোয়ারে পরিণত হবে।

জানোয়ার? হ্যাঁ, জানোয়ারই। ভূত ভাবতে পারছে না কিশোর। ওরকম অবাস্তব কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। বরং বলা যায় অজানা সাংঘাতিক কোন রোগে ভুগছে পিটার। এবং রোগটা ছোঁয়াচে। কোনখান থেকে বাধিয়ে এনেছিল হল। সে সংক্রামিত করেছে পিটারকে।

রিশের ঘরে 'ছোঁয়াচে' বলে শেরিফও রোগের ইঙ্গিতই দিয়েছেন। তারমানে তিনিও ভূত বিশ্বাস করেন না।

ব্ল্যাক মাউনটেনে যখন গিয়েছিল হল, নিশ্চয় তখন সুস্থ ছিল। ওখানে ওকে আক্রমণ করেছিল রোগাক্রান্ত কোন মানুষ বা পশু।

জখম করে রোগের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওর দেহে।

কিন্তু কারণ কি এ রোগের? ডাক্তার বেন তো রোগটা কি তাই ধরতে পারলেন না। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। মানুষের অজানা কত রোগ যে এখনও রয়ে গেছে তার হিসেব জানলে হয়তো চমকে যাবেন বড় বড় ডাক্তাররাও। এইডস আর ক্যান্সারও তো আগে অজানা রোগই ছিল। মানুষ ভুগত, ভুগে ভুগে মরত। ডাক্তাররা ধরতে পারত না। বুঝতে পারত না কিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে মানুষ।

পাহাড়ে গিয়ে কোন জানোয়ারের কাছ থেকে যদি রোগটা এনে থাকে হল, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভয়াবহ অনেক রোগই জন্তু-জানোয়ার আর অন্যান্য প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ায়। ইঁদুর ছড়ায় প্লেগ; পাগলা কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে, কায়োট এ সবের কামড়ে হয় জলাতঙ্ক। মাছি আর মশা যে কত মারাত্মক রোগের কারণ, সে-তো সবাই জানে।

ম্যানিটোও নিশ্চয় কোন রোগ। এই এলাকায় বহুকাল আগে থেকেই ছিল। ইনডিয়ানরা এ রোগে ভুগে মারা যেতে দেখেছে মানুষকে। ওরা এটাকে ভূতুড়ে কাণ্ড ভেবেছে। ভূতটার নাম দিয়েছে ম্যানিটো। বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক মানুষ যেমন ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত রোগী দেখলে বলে জিনের আসর হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশেই আছে রোগ নিয়ে এ ধরনের কুসংস্কার আর ভুল জানাজানি।

যতই ভাবছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে কিশোর। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, ম্যানিটো রোগটা ভয়াবহ রকম ছোঁয়াচে।

কোনমতে যদি পিটারের নখের আঁচড় লাগে রবিন কিংবা মুসার গায়ে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে ওর প্রিয় দুই বন্ধু। কোনভাবে রক্ষা করা যাবে না আর ওদের। ঘটবে নিশ্চিত মৃত্যু এবং মরবে ভুগে ভুগে। বুড়ো ইনডিয়ান রিশের ভাষায়—ভয়াবহ যন্ত্রণা পেয়ে।

তাগাদা দিল কিশোর। শেরিফকে আরও জোরে গাড়ি চালাতে অনুরোধ করল।

অবশেষে র‍্যাঞ্চের গেটে পৌঁছল জীপ। লাফ দিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে পাল্লা খুলে দিল সে। জীপটা ঢোকার সময় লাফ দিয়ে পাদানীতে উঠে পড়ল।

সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গাড়ি থামিয়ে দিলেন শেরিফ।

'আরি, থামলেন কেন?'

'গেটটা বন্ধ করতে হবে।'

'জাহান্নামে যাক গেট! চালান। দেরি করলে মারা পড়বে ওরা!'

জবাব না দিয়ে নিজেই লাফিয়ে নামলেন শেরিফ। গেটটা বন্ধ করে দিয়ে এসে আবার সীটে বসলেন।

এ কাজটা কেন করলেন দয়া করে বলবেন?' রেগে গেছে কিশোর।

'খোলা রাখলে ভেতরের সমস্ত গরু-ছাগল বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় ঝামেলা করত,' শেরিফ বললেন। 'মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড খরচ হয়েছে। এমন কোন ক্ষতি হয়নি তাতে। গরু-ছাগলগুলো বাঁচল। এই এলাকায় জন্মাওনি তো, তাই জানো না—এখানে সব সময় গেট বন্ধ রাখা নিয়ম। অভ্যাস হয়ে গেছে। গেট বন্ধ না করে স্বস্তি পাই

না।'

গরু-ছাগল বাঁচাতে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের ফেরেই যে মুসা আর রবিনের প্রাণ শেষ হয়ে যেতে পারে, বলতে গিয়েও বলল না কিশোর। তর্ক করতে ইচ্ছে করল না।

ওই কয়েক সেকেণ্ড পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই যেন রেসিং-কারের খেপা ড্রাইভারের মত গাড়ি ছোটালেন শেরিফ। কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে পৌঁছে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন। টায়ারের আর্তনাদ তুলে কয়েক গজ পিছলে গেল গাড়ির চাকা, তারপর থেমে গেল।

ওদের ভাড়াটে গাড়িটাকে বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দমে গেল কিশোর। এর অর্থ ঘরের ভেতর পিটারের সঙ্গে রয়েছে মুসা আর রবিন। দানবের সঙ্গে।

পুরো বাড়িটা অন্ধকার। কোথাও কারও কোন সাড়াশব্দ নেই।

বুক কাঁপছে কিশোরের। অবস্থা সুবিধের নয়।

*

হলওয়েতে নব খোলার চেষ্টা চালাচ্ছে রবিন। অতি সামান্য একটা ছুরি দিয়ে খোলা খুব কঠিন কাজ। টর্চ ধরে রেখেছে মুসা। বাথরুম থেকে বিকট শব্দ আসছে এখন।

কি হয়েছে পিটারের?

শেষ পর্যন্ত আর না বলে পারল না মুসা, 'রবিন, চলো পালাই এখান থেকে। আমার মোটেও ভাল্লাগছে না। ভূত হয়ে গেছে পিটার!'

বিরক্ত হয়ে রবিন বলল, 'তোমার আসলে কোনদিনই

আর…আহ্, ঠিকমত ধরো টর্চটা।'

আবার গর্জন করে উঠল পিটার। মুসার মনে হলো, কুগারটা কোনভাবে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এখন বাথরুমে ঢুকে পড়েছে। চিৎকারটা ওই রকমই।

আলগা হয়ে গেল স্ক্রু। ধরার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। ফসকে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়ুক। ওটা নিয়ে ভাবনা নেই। ফোকর থেকে নবটা বের করে আনার জন্যে টান দিল।

কিন্তু সুযোগই পেল না। কানফাটা গর্জন শোনা গেল বাথরুম থেকে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল পাল্লা।

কি থেকে কি ঘটে গেল বুঝতেই পারল না রবিন। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। দেয়ালে ঠুকে গেল মাথা। তারপর সব অন্ধকার।

পলকের জন্যে মুসার চোখে পড়ল বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ভয়াল জন্তু। পরক্ষণে ওর হাতের টর্চে কিসের বাড়ি লেগে পড়ে গেল টর্চটা। নিভে অন্ধকার হয়ে গেল।

*

লাফ দিয়ে জীপ থেকে নামলেন শেরিফ আর কিশোর। শেরিফের হাতে একটা শটগান। জিজ্ঞেস করলেন, 'পিস্তল চালাতে জানো?'

'জানি।'

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে গুঁজে দিলেন কিশোরের হাতে।

নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। কোনরকম গোলমালের চিহ্ন নেই। উদ্বিগ্ন চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল দুজনে। বড় বেশি শান্ত।

আর কিছু না হোক, অন্তত র‍্যাঞ্চের প্রাণীগুলোর শব্দ করার কথা। কায়োট। পেঁচা। পোকামাকড়। কেউ করছে না। যেন প্রাণের ভয়ে সবাই গিয়ে গর্তে লুকিয়েছে। মৃত অঞ্চল।

জিম করবেট আর কেনেথ এনডারসনের শিকার কাহিনীতে পড়েছে কিশোর, মানুষখেকো বাঘ যে পথ দিয়ে যায়, সেখানকার সমস্ত জানোয়ার এ রকম স্তব্ধ হয়ে যায়। ভয়ে রা করে না। এখানেও যেন সেই অবস্থা। হওয়ারই কথা। এখানকার মানব-জন্তুটা বাঘের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'আপনি পেছন দিকে চলে যান। আমি এদিক দিয়ে ঢুকি।'

বারান্দায় উঠে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। ছিটকানি লাগানো নেই। ভেজানো ছিল। আস্তে ভেতরে পা রাখল কিশোর।

অন্ধকার।

আলো জ্বালার জন্যে সুইচ টিপল।

জ্বলল না। বিদ্যুৎ নেই।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার চোখে সইয়ে নেয়ার জন্যে। টর্চ আছে, প্রয়োজন না হলে জ্বালবে না। আলো জ্বাললে এবং পিশাচটা কাছাকাছি থাকলে ওকে দেখে ফেলবে।

একটা জানালার খড়খড়ি দিয়ে পাতলা একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। মুসা বা রবিনকে চোখে পড়ল না। পিটারও নেই। কোন রকম গণ্ডগোলের চিহ্নও দেখা গেল না। সব কিছু জায়গামত ঠিকঠাক আছে। শান্ত ঘর। কিন্তু নীরবতাটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ভীষণ সতর্ক কিশোর। টান টান হয়ে গেছে স্নায়ু। ভাড়াটে গাড়িটা যেহেতু আছে বাইরে, রবিনরাও আছে এখানে কোনখানে। কিন্তু সাড়াশব্দ নেই কেন কারও?

আস্তে সামনে পা বাড়াল সে। প্রথমে নিচতলাটা দেখবে। একপাশ থেকে দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোল। হাতে উদ্যত পিস্তল।

মসৃণ কাঠের দেয়ালের একটা খাঁজে হাত পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে। একটা সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। তারপর টর্চ জ্বেলে মুহূর্তে দেখে নিল কি ঘটেছে। কাঠের গায়ে গভীর তিনটে আঁচড়ের দাগ।

আশেপাশে তাকাতে লাগল সে। কিছু চোখে পড়ল না। দেয়ালের দিক পিঠ দিয়ে পাশে হেঁটে সরে যেতে শুরু করল ওখান থেকে।

গোড়ালির ওপরের হাড়ে ঠক করে বাড়ি লাগল। ব্যথায় বিকৃত করে ফেলল মুখ। তবু কোন শব্দ করল না। আলো ফেলে দেখল কিসে বাড়ি লেগেছে।

একটা কাঠের ছোট টুল পড়ে আছে। চোখ আটকে গেল ওটাতে। টুলের কিনারে আটকে ঝুলছে একটুকরো চকচকে চামড়া।

বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটানো শুরু হলো যেন ওর। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল বাথরুমের দিকে। তারপর যা দেখল তাতে হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

খানিক দূরে পড়ে আছে রবিনের টর্চ। কিন্তু ওকে দেখা গেল না কোথাও। মুসাও নেই।

ডেভিড হুইটম্যানের ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত লাশটা চোখের

সামনে ভেসে উঠল ওর। অতি সাবধানে সরে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল টর্চটা। রবিনেরটাই কিনা ভালমত দেখে নিশ্চিত হলো। ফিসফিস করে ডাকল, 'রবিন! মুসা!'

বিশ

কোথায় ওরা?

হলের চতুর্দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। আলো ফেলে ভালমত দেখল মেঝেটা। সূত্র খুঁজল। শার্টের কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো, চুল, রক্ত—এমন কিছু, যাতে অনুমান করা যায় ওদের কি হয়েছে।

নিচু, একটা চাপা গরগর বরফের মত জমিয়ে দিল ওকে। জানা আছে, জানোয়ার যত বড় আর হিংস্র হয়, তত ভারি হয় গলার আওয়াজ।

যে শব্দটা শুনল, তাতে অনুমান করল সেটা পার্বত্য সিংহের চেয়ে বড় জানোয়ার। ওগুলোর চেয়ে যে অনেক বেশি শক্তিশালী তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তারমানে মারাত্মকও কুগারের চেয়ে অনেক বেশি।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে হলওয়ে ধরে এগোতে শুরু করল সে। রান্নাঘরের দরজায় পড়ল টর্চের আলো।

কিছু নেই।

আবার শোনা গেল গরগর। আগের চেয়ে জোরাল। এতটাই

ভারি মেঝে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কিশোরের মেরুদণ্ডে ঝাঁকি দিয়ে গেল যেন শব্দটা।

কাছেই আছে কোথাও ম্যানিটো। খুব কাছে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। মুসা আর রবিনকে খুঁজে বের করতে হবে। যে অবস্থাতেই থাকুক। জীবিত, কিংবা মৃত।

পা বাড়াল সে।

*

রান্নাঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। রহস্যময় সেই চাপা গর্জন কানে এল আরেকবার। ঠিক করে বলা মুশকিল কোনখান থেকে আসছে, কাকে নিশানা করেছে ওটা।

টর্চের আলোয় রান্নাঘরটা দেখতে লাগল সে। কাউন্টার, কেবিন, সিংক, রেফ্রিজারেটর, টেবিল, চেয়ার—সব ঠিক আছে। কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না।

তারপর আবার শোনা গেল গর্জন। জানোয়ার, সন্দেহ নেই। এ গর্জন মানুষের হতে পারে না। এতক্ষণে বুঝতে পারল কোনদিক থেকে আসছে। চট করে আলো ফেলল সেদিকে। ফেলেই ঘুরে দাঁড়াল পাক খেয়ে। পলকের জন্যে দেখতে পেল লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে একটা জানোয়ার দৌড়ে চলে গেল দরজার ওপাশে। মানুষের মত দুপায়ে হাঁটে। প্রায় ভালুকের মত রোমশ শরীর।

পিছন পিছন ছুটে গেল কিশোর। পিস্তলধরা হাতটা সামনে বাড়ানো। জানোয়ারটাকে অনুসরণ করে সিঁড়ির দিকে ছুটল সে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দ্রুত। ভীষণ সতর্ক। বিপদের এতটুকু সম্ভাবনা দেখলেও গুলি ছুঁড়বে। প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে

সঙ্গে মচমচ করে উঠছে কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় চোখের কোণে ধরা পড়ল বিরাট কালো একটা ছায়া।

কোন রকম ঝুঁকি নিল না সে। দেরি করল না একটা মুহূর্ত। গুলি করল ওটাকে লক্ষ্য করে।

সাড়া এল না কোন। যন্ত্রণাকাতর চিৎকার নেই। গুলি খেয়ে ব্যথায় গোঙাল না। মেঝেতে গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো না।

অবাক লাগল ওর। টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখল ছায়াটাকে। হাঁ করা মুখে হলদে রঙের বিশাল শ্বদন্ত। থাবা দেয়ার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে রেখেছে সামনে। পিস্তলের গুলিতে চোয়ালের অনেকখানি উড়ে গেছে স্টাফ করা মরা ভালুকটার।

আবার কানে এল সেই রোমখাড়াকরা ভয়াবহ চাপা গর্জন। ঝড়ের সময় বজ্রপাতের আগে যেমন গুড়ুগুড়ু মেঘ ডাকে, তেমনি শব্দ। ওপরতলা থেকে আসছে। একেবারে নিশ্চিত।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে আবার। দোতলায় উঠে থেমে কান পাতল। সাবধানে এগোতে লাগল শব্দটা যেদিকে শোনা গেছে। অবাক হয়ে ভাবছে, রবিন আর মুসার তো কোন সাড়া নেই, শেরিফেরও নেই। গেল কোথায় সব? কি করছে? বেঁচে আছে তো? নাকি তিনজনকেই খতম করে দিয়েছে দানবটা?

দোতলার হলওয়েটা সমান লম্বা ওর ডানে-বাঁয়ে। অর্থাৎ হলওয়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে। দুদিকেই ঘন অন্ধকার। চাঁদের আলো আসারও কোন ফাঁক নেই। আবার দাঁড়িয়ে গেল সে। কান পাতল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের লাফানোর শব্দও

স্পষ্ট কানে আসছে যেন। কোন্ দিকে যাওয়া উচিত? কোনখানে লুকিয়ে আছে ম্যানিটো?

ডানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কয়েক কদম যেতে না যেতে সামনে থেকে একটা ছায়ামূর্তি ছুটে এসে সাঁড়াশির মত শক্ত আঙুলে ওর হাত চেপে ধরল। টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গেল পাশের একটা অন্ধকার ঘরে।

ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলতে গেল কিশোর।

'গুলি কোরো না!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আমি!'

আরেকটু হলেই ট্রিগার টিপে দিয়েছিল কিশোর। সময়মত সামলে নিল নিজেকে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নইলে আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল, জানোয়ার নয়, ওর হাত চেপে ধরেছে একজন মানুষ। মুসাকে জীবন্ত দেখে খুশি হলো সে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'রবিন কোথায়?'

'আছে। ভাল আছে। ওকে সরিয়ে ফেলেছি আমি।'

'তোমার কি অবস্থা?'

'আমিও ঠিকই আছি।'

'জন্তুটা আঁচড়ে দেয়নি তো?'

'না। কেন?'

মুসার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জানতে চাইল কিশোর, 'কি হয়েছিল রবিনের?'

'বুঝলাম না। বাথরুমের মধ্যে ঢুকল পিটার। খানিক পর ভেতরে একটা জানোয়ার চিৎকার শুরু করল। হঠাৎ দরজা ভেঙে বেরিয়ে

এসে ধাক্কা মারল রবিনকে। দেয়ালের ওপর পড়ে গেল ও। মাথা ঠুকে যাওয়ায় বেহুঁশ হয়ে গেল। টর্চটা ছিল আমার হাতে। বাড়ি লেগে ওটাও পড়ে নিভে গেল। তোলার চেষ্টা না করে রবিনের দিকে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম বেহুঁশ হয়ে গেছে। ওদিকে জানোয়ারটা গর্জন করছে। বুঝলাম, বাঁচতে হলে সরে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি রবিনকে তুলে নিয়ে উঠে এলাম দোতলায়। একটা ঘরে শুইয়ে রেখেছি ওকে। শক্ত বাড়ি খেয়েছে মাথায়। এখনও হুঁশ ফেরেনি।'

'ভাল আছে যখন, থাক। পরে দেখব। আগে জানোয়ারটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' কিশোর বলল। 'দোতলায় উঠেছে। এই খানিক আগে গর্জন শুনলাম। চলো, দেখি কোথায় আছে?'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সঙ্গে চলল মুসা।

দোতলার প্রতিটি ঘর খুঁজে দেখতে লাগল ওরা। বেশির ভাগই অন্ধকার। কোন কোনটায় চাঁদের আলো ঢোকার জায়গা পাচ্ছে। সেগুলোতে ফ্যাকাশে অন্ধকার। আসবাবপত্রগুলোকে লাগছে ঘাপটি মেরে থাকা নানা রকম বিচিত্র জানোয়ারের মত। ভূতুড়ে লাগছে।

কয়েকটা ঘর দেখে এসে একটা বেডরুমে ঢুকল ওরা। বোধহয় পিটারের ঘর। ওটাতে নেই সে।

পাশে আরেকটা বেডরুম পাওয়া গেল। সেটা নিশ্চয় ওর বাবার ঘর। পিটারের সাইজের একটা জানোয়ার লুকিয়ে থাকতে পারে, এমন কোন জায়গাই বাদ দিল না, সবখানে খুঁজে দেখল। বড় আলমারিগুলোও বাদ দিল না। বাথরুমগুলো তো দেখলই।

হঠাৎ শোনা গেল নিঃশ্বাসের শব্দ। ভারি, খসখসে। দম ফেলতে যেন কষ্ট হচ্ছে কারও।

মুসার কানে এল প্রথমে। ঘুরে তাকাল হলওয়ের শেষ মাথার একটা দরজার দিকে।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল দুজনে।

ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা। বাইরে দাঁড়িয়ে কান পাতল ওরা। পরিষ্কার শুনতে পেল কষ্টকর দম ফেলার আওয়াজ।

আস্তে করে ঠেলা দিল কিশোর।

ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কব্জাগুলো।

দোতলার অন্যান্য ঘরের মত এটাও অন্ধকার। পিস্তল হাতে ভেতরে পা রাখল কিশোর। পেছনে মুসা। টর্চের সুইচ টিপল। একটা অফিসঘর। দরজার কাছাকাছি পাতা একটা ডেস্ক আর একটা চেয়ার। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা জানালা। তার পাশে দরজা। দুটোতেই পর্দা টানানো। দরজাটা দিয়ে সম্ভবত ব্যালকনিতে যাওয়া যায়—অনুমান করল কিশোর। বুকশেলফ আছে কয়েকটা। আর আছে জানোয়ার এবং পাখির স্টাফ করা দেহ। এ জিনিস দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছে ওরা। এত মৃত প্রাণীর মাঝখানে কি করে বাস করতেন হুইটম্যান, ভেবে অবাক লাগল কিশোরের।

দুজন দুদিকে সরে গিয়ে খুঁজতে শুরু করল। দেখার চেষ্টা করল অন্ধকারে কোনখানে ঘাপটি মেরে আছে ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা।

খুঁজতে খুঁজতে ফিরে এসে আবার এক জায়গায় মিলিত হলো। কোথাও দখতে পেল না জানোয়ারটাকে। অন্ধকারে জ্বলতে দেখা গেল না ওটার টকটকে লাল চোখ।

তবে আছে ওটা কোনখানে। কোথায়?

একুশ

নিজের অস্তিত্ব নিজেই জাহির করল ওটা। বিদ্যুৎ গতিতে আক্রমণ চালাল। কানফাটা ভয়ানক গর্জন শোনা গেল ওদের পেছনে।

ঘুরতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে বসল মুসা আর কিশোর। টর্চের আলোয় যে জীবটাকে দেখল ওরা, কোন দুঃস্বপ্নেও এত ভয়াবহ জীব দেখেনি। রোমশ শরীর। চেহারাটা না মানুষ, না নেকড়ের—কোন কিছুর সঙ্গেই পুরোপুরি মেলানো যায় না। টকটকে লাল চোখ। থাবার আঙুলের মাথায় বাঁকা বড় বড় নখ।

টর্চটা এখন মুসার হাতে। গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলতে গেল কিশোর।

অবিশ্বাস্য গতিতে ধেয়ে এল জন্তুটা। লাফ দিয়ে পড়ল ওর সামনে। পিস্তলে থাবা দিয়ে ফেলে দিল ওটা। আবার থাবা তুলল নাকমুখ চিরে দেয়ার জন্যে।

ঠিক ওই মুহূর্তে গর্জে উঠল বন্দুক। বদ্ধ ঘরে গুলি ফোটার বিকট শব্দ, মনে হলো কামানের গোলা ফাটল।

শক্তিশালী গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেল জন্তুটা। ওখান থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। শব্দ হলো ধপ করে। কয়েক

মুহূর্ত ছটফট করে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দা। ফিরে তাকাল দরজার দিকে। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন শেরিফ। চেম্বার থেকে বের করে ফেলে দিলেন কার্তুজের খালি খোসাটা। মুখ তুলে তাকালেন গোয়েন্দাদের দিকে। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আঁচড়ে দেয়নি তো গায়ে?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'একেবারে সময়মত এসেছেন। নইলে গেছিলাম আজ।'

'তোমাদের আরেকজন কোথায়?' ঘরে ঢুকলেন শেরিফ।

'আছে,' মুসা বলল। 'ভালই আছে...'

'হ্যাঁ, ভালই আছি,' শেরিফের পেছনে দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠল রবিন। 'ঘটনাটা কি বলো তো? গুলির শব্দ শুনলাম? আমিই বা দোতলায় এলাম কি করে?'

'আমি নিয়ে এসেছি,' মুসা জানাল।

দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা কালো দেহটার ওপর আলো ফেললেন শেরিফ আর মুসা।

কিন্তু কোথায় ম্যানিটো! পড়ে আছে পিটার। খানিক আগেও যেটা ভয়ঙ্কর এক দানব ছিল—তিন জোড়া চোখ একসঙ্গে দেখেছে, ভুল হতেই পারে না—সেটা এখন অতি সাধারণ এক মানুষের লাশ। বুকে মস্ত এক গর্ত করে দিয়েছে শটগানের গুলি।

'খাইছে!' তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে।

রবিনও অবাক।

কি দেখতে পাবে জানা ছিল কিশোর আর শেরিফের, তাই ওরা অবাক হয়নি।

'সর্বনাশ! একি করেছেন?' বলে উঠল রবিন। 'এ বেচারাকে গুলি করে মারলেন! বাথরুমে ঢুকেছিল ও। অসুস্থ হয়ে বমি করছিল আর থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছিল...একসময় তো আমার মনে হলো জানালা দিয়ে বুঝি বাথরুমে ঢুকে ওকে আক্রমণ করে বসেছে খাঁচার কুগারটা...'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'ভাগ্য ভাল, আমার কিছু করতে পারেনি, তাই দুজনে বেঁচেছি আজ। কুগার নয়, রবিন, ভয়ঙ্কর এক ভূত ছিল ওটা! ম্যানিটো...'

চোখ কুঁচকে মুসার দিকে তাকাল রবিন, 'আবার সেই এককথা—ভূত, ভূত!'

'অনেক কথাই জানো না তুমি, রবিন,' কিশোর বলল, 'একেবারে ভুল বলেনি মুসা।'

আরও অবাক হয়ে গেল রবিন। 'তুমিও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলে?'

'না, আমি ভূত বিশ্বাস করছি না। তবে পিটার যে ম্যানিটো হয়ে গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমি একা দেখিনি যে চোখের ভুল হবে। মুসা দেখেছে, শেরিফ দেখেছেন। বাথরুমের দরজা ভেঙে তোমাকে আক্রমণ করেছিল ওই ম্যানিটো। এখানে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এসেছিল। ভাগ্যিস শেরিফ চলে এসেছিলেন! নইলে কি যে হতো আজ...'

'হতো আর কি, একজনও বাঁচতাম না,' কিশোরের কথাটা পুরো করে দিল মুসা।

'কুগারটা খাঁচায় আটকে আছে এখনও,' শেরিফ বললেন, 'সুতরাং ওটার নয়, বাথরুমে পিটারের চিৎকারই শুনেছ তুমি। অসুখটা তখন আক্রমণ করেছে ওকে। ম্যানিটো রোগ।'

*

পরদিন সকালে ট্রেগো ট্রাইবাল পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। তদন্তের রিপোর্ট লিখে ফাইল করে দিয়ে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। ধূসর হয়ে আছে। বৃষ্টি নামবে।

শেরিফও বেরিয়ে এসেছেন ওদের সঙ্গে। এগিয়ে দেয়ার জন্যে। ওদেরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বরাবরের মত ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল মুসা। রবিন আর কিশোর বসল পেছনে। কিশোরের পাশের দরজাটা লাগিয়ে দিলেন শেরিফ।

জানালা দিয়ে মুখ বের করল কিশোর, 'শেরিফ, টিরানা তো এলো না এখনও। খবর দিয়েছিলেন?'

'রাতেই দিয়েছি।'

'তাহলে? এল না কেন?'

'এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছে সে। কাল রাতে পিটারের খবরটা শোনার পর পরই ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছ? জবাব দিল, ব্ল্যাক মাউনটেইনে। কেন? বলল, ভাইয়ের অসুখের

কারণ খুঁজতে। আর কোন কথা না বলে চলে গেল সে। আজ সকালে রিশের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সেও নেই। পুল হলে গিয়ে জানলাম, কাল রাতে নাকি টিরানার সঙ্গে ওকেও পর্বতের দিকে যেতে দেখা গেছে।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা।

নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। 'মুসা, স্টার্ট বন্ধ করো।'

'কেন?'

'করো। এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না আমরা।'

'মানে?' রবিনও অবাক।

জবাব না দিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল কিশোর। 'শেরিফ, তিনটে ঘোড়ার ব্যবস্থা করা যাবে?'

'যাবে? কেন?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন শেরিফ।

'ব্ল্যাক মাউনটেইনে যাব আমরাও। এ রহস্যের যেখানে উৎপত্তি, সেটা না দেখে ফিরে যেতে পারি না আমরা, কি বলেন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। ধীরে ধীরে সমান হলো কুঁচকানো কপাল, আগের জায়গায় ফিরে গেল ভুরু দুটো। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। 'জানতাম, শুনলেই তুমি যেতে চাইবে। গত কয়েকদিনে তোমাকে চেনা হয়ে গেছে আমার। টিরানার কথাটা তাই ইচ্ছে করে বলিনি। জিজ্ঞেস করলে যখন...যাকগে, তিনটে নয়,আসলে চারটে ঘোড়া লাগবে আমাদের।'

'আপনিও যাচ্ছেন?'

'তোমরা না গেলেও আমি যেতাম। তোমাদের বিদেয় করে দিয়েই রওনা হতাম। কোন্ বিপদে গিয়ে পড়ে টিরানা আর রিশ, কে জানে। এখানকার নাগরিকদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যেই শেরিফ বানানো হয়েছে আমাকে।'

বাইশ

'হুঁ,' সামনের ফাইলটা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালেন হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। 'ডক্টর মুনই তাহলে নাটের গুরু। ফ্যানটাসটিক স্টোরি। ক্লোনিং নিয়ে গবেষণা। মানুষের জিন বদলে দেয়া। সাংঘাতিক একটা ছবি হবে। কোন্ গ্রুপে ফেলা যায় বলো তো? গোস্ট স্টোরি তো নয়। সাইন্স ফিকশন?'

'ডিটেকটিভ কাম অ্যাডভেঞ্চার কাম ফ্যান্টাসি কাম সাইন্স ফিকশন কাম হরর কাম...'

'হরর!' হাত তুললেন পরিচালক। 'যা যা বললে সবই আছে কাহিনীটায়। তবে অত লম্বা নাম তো আর দেয়া যাবে না। বরং শেষ শব্দটাই নিলাম— রর। হরর ফিল্ম।'

'কিংবা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন টু,' মুসা বলল।

'না, হররই ঠিক আছে। কোন একটা ছবি হিট হয়ে গেলে সেটার সীকোয়াল বানানো এই টু-থ্রীগুলো আমার ভাল লাগে না। শুনতেও ভাল না নামগুলো।'

পরিচালকের অফিসে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

মায়ানেকড়ের কেস শেষ করে কাহিনী লিখে নিয়ে এসেছে রবিন। সেটা নিয়েই আলোচনা।

'ঠিক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলা যাবে না একে। তবে মনস্টার, তাতে সন্দেহ নেই,' পরিচালক বলছেন। 'এ ধরনের ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। হিটলারের স্যাডিস্ট ডাক্তারদের গবেষণাগারে ইঞ্জেকশন দিয়ে মানুষকে আধাজন্তু বানিয়ে দেবার ঘটনা ঘটেছে অনেক। মনটান্যার ঘটনাটায় একটা ব্যাপারই নতুন, সেটা হলো ডক্টর মুনের ওষুধের প্রভাবে শরীরে রোগ তৈরি হয়ে যাওয়াটা। এবং সেটা ছোঁয়াচে। আরও আশ্চর্য, রোগী আক্রান্ত হয় রাতের বেলা। দিনরাতের তাপমাত্রার সঙ্গে নিশ্চয় কোন সম্পর্ক আছে এই রোগের। একেবারে বাস্তব ড্রাকুলা। সত্যি, ডেঞ্জারাস! তবে রাতের বেলা রোগ বাড়ে, যে কোন রোগই হোক, এটাও ঠিক।' রবিনের দিকে তাকালেন পরিচালক, 'কাহিনীটা গুছিয়েই লিখেছ। কিন্তু ডক্টর মুনের পরিচয় দাওনি। কোন দেশের লোক, সে আসলে কে, গবেষণাগারে মানুষ নিয়ে গবেষণাটা তার ব্যক্তিগত আগ্রহ, নাকি কেউ হিটলারের মত খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে দিয়ে এ সব করিয়েছে, লেখনি।'

জবাবটা দিল কিশোর, 'আসলে ওসব আমরাও জানি না। সে ধরা পড়লে হয়তো জানা যেত। গেল তো পালিয়ে। আমাদেরকে ধরে যখন অপারেশন টেবিলে শুইয়ে ইঞ্জেকশন দিতে এসেছিল, তখন কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম। বুড়ো রিশ আর তার ইনডিয়ান সঙ্গীরা সাহায্য না করলে কি যে অবস্থা হতো আমাদের, বলা মুশকিল। হয়তো হল আর অন্য আরও অনেকের মত আমাদেরকেও

ম্যানিটো বানিয়ে ছাড়ত।

'যাই হোক, লোকটার চেহারা দেখে মনে হয়েছে এশিয়ান। নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, ডক্টর মুন। নামটা ছদ্মনাম, নিজেই নিয়েছে। এই নাম নেয়ার ব্যাপারে নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা আছে তার। চাঁদ যেমন শান্ত, স্নিগ্ধ আলোয় অন্ধকার সরিয়ে মানুষের উপকার করে, তেমনিভাবে বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে সেও চায় মানুষের উপকার করতে। বিজ্ঞানের গবেষণায় জীবনপাত করার ইচ্ছে। জন্তু-জানোয়ারের ক্লোনিং করার পদ্ধতি সে ডক্টর ইয়েন উইলমেটের অনেক আগেই আবিষ্কার করে বসে আছে। প্রচারের ভয়ে কাউকে জানায়নি। তার উদ্দেশ্য আরও অনেক বড়। জীবন তৈরি করতে চায়। বাঁচিয়ে তুলতে চায় মরা মানুষকে।'

'মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে এ সব করার কি দরকার ছিল?'

'ছিল। কারণ ওর গিনিপিগ হলো মানুষ। জানিয়ে-শুনিয়ে এ সব করতে গেলে কোন দেশের সরকারই অনুমতি দিত না। বরং বাধা দিত যতটা সম্ভব।'

'অতএব গোপনে...বুঝলাম।' এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আর একটা কথা। হলের নখের আঁচড়ে ম্যানিটোর বিষ ঢুকেছিল পিটারের শরীরে। হলের গায়ে লেগেছিল কার নখ?'

'ডক্টর মুনের ইনজেকশনে আক্রান্ত হওয়া এক মানব-গিনিপিগের। ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রক্তের নেশায়। সামনে পেয়ে যায় হলকে। আক্রমণ

করে বসে। ঠিক ওই সময় এসে হাজির হয় ডক্টরের প্রহরীরা। আর কোন উপায় না দেখে ডক্টর মুনের আবিষ্কৃত একধরনের সাইলেন্ট গান দিয়ে খুন করে দানবটাকে। প্রাণে বেঁচে যায় হল। মুখোশ পরা প্রহরীদের দেখে হল ভাবে ওরা আকাশ থেকে নেমে আসা প্রেতাত্মা। যারা নীরব অস্ত্র দিয়ে সহজেই মায়ানেকড়ের মত ভয়ঙ্কর জন্তুকেও মেরে ফেলতে পারে। এ যে মানুষের কারসাজি, কল্পনাই করতে পারেনি সে।'

'এর জন্যে দায়ী অবশ্য কুসংস্কার আর ইনডিয়ান মিথলজি। কিন্তু ম্যানিটো যে রোগ, তোমার সন্দেহ হলো কেন?'

'ভূতে বিশ্বাস করি না বলে। আরও একটা ব্যাপার; সন-তারিখও মিলছিল না। সেজউইক স্টোকসের লেখায় বছরের হিসেবে দেখা যায়, প্রতি আট বছর পর পর মায়ানেকড়ে জন্ম নেয়—যদিও কথাটা কতখানি বাস্তব, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। তারপরেও সূত্র যা পেয়েছি, তাতে পরিষ্কার বোঝা গেছে মায়ানেকড়ে জাতীয় কোন জীবই হামলা চালিয়েছে র‍্যাঞ্চে। সেই সঙ্গে আরেকটা খটকাও লেগেছে, জীবটা আট বছরের জীবন-চক্র ফলো করেনি। ওই অঞ্চলে শেষ মায়ানেকড়ের হামলার কথা বলা হয়েছে চুরানব্বই সাল। মানুষের ভূতে বিশ্বাসকে সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে যদি জ্যান্ত হয়ে ওঠেও কোন মায়ানেকড়ে, তাহলে হওয়ার কথা দুহাজার দুই সালে। অত আগে মাত্র তিন বছর পরে সাতানব্বইতে কেন?

'মায়ানেকড়ে যে ভূত, এ কথাটা একবারও বিশ্বাস করিনি আমি। আমি সন্দেহ করেছিলাম, পাহাড়ে ভালুক জাতীয় জানোয়ারের এ রোগ হয়। সেগুলোতে আঁচড়ে দিলে মানুষের দেহেও ঢুকে যায় মারাত্মক জীবাণু। কিন্তু পাহাড়ের গুহায় ল্যাবরেটরি বানিয়ে যে সত্যিকারের মায়ানেকড়ে সৃষ্টি করে বসেছিল ডক্টর মুন, কে ভাবতে পেরেছিল!'

'তবে যাই বলো,' মিস্টার ক্রিস্টোফার বললেন, 'লোকটার মেধা আছে। সত্যিই যদি মানুষের উপকারের জন্যে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকে, কোন্ দিন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসবে।'

'কিংবা সৃষ্টি করবে মায়ানেকড়ের চেয়েও ভয়াবহ কোন দানব, যেটা তাকে তো ধ্বংস করবেই, দুনিয়ার প্রতিও হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।'

গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালেন, 'তা বটে। সে সম্ভাবনাটাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। দেখা যাক। অপেক্ষা করতে থাকি। খবর একদিন না একদিন পাওয়া যাবেই।'

***

তিন গোয়েন্দা

প্রেতাত্মার প্রতিশোধ

রকিব হাসান

কবর থেকে উঠে এসেছে এক ভয়ঙ্কর পিশাচ!
এবার কে ওর শিকার? মুসা, না রবিন?
হাজার বছর ধরে টিকে থাকা ওই
ভয়াল প্রেতকে মারতে হলে চেতনার গভীরে
ডুব দিতে হবে কিশোরকে;
জানতে হবে কি করলে
চিরতরে ধ্বংস হবে ওই বিভীষিকা,
আর কোনদিন জ্বালাতে আসবে না মানুষকে।

নিজের মন থেকে একটা জবাবই খুঁজে পেল সে—আত্মহত্যা।
নিজেকে ওর শেষ করে দেয়া ছাড়া
ওটাকে ধ্বংস করার আর কোনই উপায় নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তিন গোয়েন্দা
প্রেতাত্মার প্রতিশোধ
রকিব হাসান
সেবা

প্রেতাত্মার প্রতিশোধ
রকিব হাসান

কিশোর থ্রিলার • তিন গোয়েন্দা

এক

'নাহ্, কিছুই হচ্ছে না!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ইনস্ট্রাক্টর হু-ইয়ান। হাত নেড়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন দুজন ছাত্রকে। রিঙের বাইরে তাকিয়ে ডাকলেন, 'চুং, এসো তো, দেখিয়ে দাও কিভাবে করতে হয়।'

হাসিমুখে এগিয়ে গেল একটা কিশোর বয়েসী ছেলে। চীনাদের মত ছোট নাক, ছোট চোখ; আমেরিকানদের মত উঁচু কপাল, সোনালি চুল। মা চীনা, বাবা আমেরিকান, সেজন্যেই অমন হয়েছে। চুলগুলো পেছনে লম্বা বেণি করে বাঁধা। কুংফু ফাইটারদের মত। এটা ওর গর্ব।

রিঙের মাঝখানে গিয়েই ইআহ্-শি করে লম্বা তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে লাফ মারল চুং। শূন্যে উঠে পড়ল। ওপরে থাকতেই হাত-পা ছুঁড়ল কারাতিদের কায়দায়। ব্রুস-লীর ভঙ্গি নকল করতে চাইছে। তারপর নিঃশব্দে নেমে এল মাটিতে। পেছনে সাপের লেজের মত ঝাঁকি খেল লম্বা বেণি।

চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রদের দিকে হাসিমুখে তাকালেন হু-ইয়ান। 'দেখলে তো, কিভাবে লাফ দিতে হয়?'

মুখ বাঁকাল কিশোর। মনে মনে বলল, 'তা তো দেখলাম! কিন্তু আমার যদি ফাইটার হতে ইচ্ছে না করে তো ব্যাঙের বিদ্যে শিখতে যাব কোন্ দুঃখে?'

ওর দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর রবিন। ওদেরও নজর রিঙের দিকে।

গরম লাগছে খুব। বদ্ধ জিমনেশিয়াম। আবহাওয়া যতটা না গরম তারচেয়ে বেশি লাগছে। ভাপসা করে তুলেছে অনেক মানুষের ভিড়।

স্কুল ছুটি। রকি বীচ আর আশপাশের কয়েকটা শহরের স্কুলের ছেলেরা একটা বিশেষ ক্যাম্পিঙের আয়োজন করেছে। সেটা অনুষ্ঠিত হবে রকি বীচের বাইরে রকহিল কলেজের ক্যাম্পাসে। নানা রকম খেলাধুলা, নাটক, নাচগানের প্রতিযোগিতা হবে। প্রতি বছরই এ সময়টায় হয় এই ক্যাম্পিং।

এবারও হবে। রকি বীচ স্কুল থেকে আরও অনেকের সঙ্গে তিন গোয়েন্দাকেও বাছাই করা হয়েছে। কারাত আর জু-জিৎসুতে প্রতিযোগিতার জন্যে নেয়া হয়েছে কিশোর, মুসা আর রবিনকে। কিশোরের এ সব ভাল লাগছে না এবার, তবু বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। স্কুলের ফিজিক্যাল ইন্‌স্ট্রাকটর মিস্টার হু-ইয়ানের অনুরোধে। লিস্টে কিশোর আর রবিনের নাম দিলেও ভরসা করছেন তিনি চুং আর মুসার ওপর। বিশেষ করে চুং।

গরমে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। একটা কোকটোক কিছু না খেলে আর পারব না।'

'দাঁড়াও, আমিও আসছি,' হাত ধরে থামাল ওকে মুসা। রিঙে গিয়ে ঢুকল। মিস্টার হু-ইয়ানের কানের কাছে গিয়ে কিছু বলল। ঘাড় কাত করে অনুমতি দিলেন তিনি।

রবিনও বেরোল ওদের সঙ্গে। তিনজনে এসে বসল জিমনেশিয়ামের ভেতরের একটা কফিশপে। এয়ারকন্ডিশনড ঘর। রিঙ থেকে এখানে এসে যেন বেঁচে গেল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'বড় বেশি অহঙ্কার হয়েছে চুঙের,' মুসা বলল। 'ভাবখানা দেখলে, কেমন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকাচ্ছিল?'

'পারে যখন অহঙ্কার তো হবেই,' রবিন বলল।

চোখ সরু করে ওর দিকে তাকাল কিশোর, 'ওর ভক্ত হলে কবে থেকে?'

'কারও প্রশংসা করলে তার ভক্ত হওয়া লাগে নাকি? একটা কথা তো স্বীকার করবে, চুং লাফ দিতে পারে খুব ভাল। কুংফু ফাইটারদের জন্যে এটা প্রয়োজন।'

'আধা-চীনা,' মুসা বলল, 'রক্তের মধ্যেই আছে-কুংফুত্ব। পারবেই তো...'

'আধা-চীনা না আধাবুনো!' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রবিন, 'তোমার আজ হয়েছে কি, কিশোর? এমন ভাবে তো সমালোচনা করো না কারও...'

ওয়েইটার এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে। আলোচনায় বাধা পড়ল। বীফ বার্গার আর কোকের অর্ডার দিল মুসা। রবিন চাইল ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর চকোলেট শেক।

একটা মুহূর্ত চুপ করে ওয়েইটারের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমার জন্যে মটরশুঁটির স্যুপ।'

তাজ্জব হয়ে গেল মুসা আর রবিন। যে জিনিসটা দুচোখে দেখতে পারে না কিশোর, সেটাই খেতে চাইছে।

ওয়েইটার চলে গেলে রবিনের প্রশ্নটা করল এবার মুসা, 'তোমার আজ হয়েছে কি কিশোর, বলো তো? শরীর খারাপ?'

শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর, 'কেন, মটরশুঁটির স্যুপ খেতে চাইলেই কি শরীর খারাপ হয়ে যায় নাকি?'

'দেখো, তোমাকে আমরা চিনি···তোমার স্বভাবের মধ্যে···'

'আসছি,' উঠে দাঁড়াল রবিন, 'এক মিনিট।' বাথরুমের দিকে চলে গেল সে।

সেদিক থেকে মুসার দিকে চোখ ফেরাল কিশোর, 'আমার স্বভাবের মধ্যে কি?'

'দেখো, তোমার কিছু একটা হয়েছে। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

কয়েক সেকেন্ড উসখুস করল কিশোর। 'মুসা, সত্যি তোমাদের ফাঁকি দিতে পারব না। আমার কিছু একটা হয়েছে। থেকে থেকে মাথার মধ্যে কেমন করে ওঠে। খুন চেপে যায়। মনে হয়···মনে হয়···'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। বোঝার চেষ্টা করছে কি বলতে চায় কিশোর।

মুসার কব্জির দিকে চোখ পড়ল কিশোরের। শুকিয়ে এসেছে

আঁচড়টা। ওহাতে সেরাতে টর্চ ধরা ছিল মুসার। থাবা মেরে ফেলে দিয়েছিল মায়ানেকড়ে হয়ে যাওয়া পিটার। সামান্য আঁচড় লেগেছিল শুধু। রক্ত বেরোয়নি। তবু ভয়টা যায়নি ওদের। ওদের মানে কিশোর, মুসা আর রবিনের। ভয়ে ভয়ে ছিল, মুসাও না মায়ানেকড়েতে পরিণত হয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আর হবে বলে মনে হয় না। ভয় তবু যায় না ওদের।

'কি মনে হয়?' জানতে চাইল মুসা।

'মনে হয়···নাহ্, বলে বোঝাতে পারব না···কদিন থেকে খালি পিটারের কথা মনে পড়ছে। শুধু মনে পড়ছে না, রাতে দুঃস্বপ্নও দেখি। থেকে থেকে মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়···'

উদ্বেগ ফুটল মুসার চোখে, 'কিন্তু তোমাকে তো মায়ানেকড়েতে আঁচড়ায়নি!'

'তা আঁচড়ায়নি। তবু কেন যেন খালি ওকথাই মনে হয়···' মুসার দাগটার ওপর হাত রাখল কিশোর, 'তোমার কি অবস্থা? খারাপ-টারাপ লাগে?'

'তা লাগে না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা, 'তবে ভয়টা যায় না কোনমতেই। রাতে কখনও যদি কোন কারণে একটু শরীর খারাপ লাগতে থাকে, ভয় পেয়ে যাই। মনে হয় আমি মায়ানেকড়ে হয়ে যাচ্ছি।'

'হুঁহ! আর কিছু পারুক আর না পারুক, আমাদেরকে মানসিক রোগী বানিয়ে ছেড়েছে পিটার। তবে তোমার আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অনেক দিন তো হলো। এখনও যখন মায়ানেকড়ে হওনি, আর হবেও না। তা ছাড়া পিটারের আঁচড়ে তোমার তো আর

রক্ত বেরোয়নি। রক্তের মধ্যে ঢুকতে পারেনি বিষ। তবু কতবার বললাম, রক্তটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নাও, সাবধান থাকা ভাল...'

'সত্যি কথাটাই বলি, ভয় লাগে। যদি অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায় রক্তের মধ্যে?'

বাথরুম থেকে ফিরে এল রবিন। দুজনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার? এখনও চুন্ডের আলোচনা করছ?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল মুসা, 'মায়ানেকড়ে...'

ওর কথা শেষ করার আগেই ট্রে হাতে এসে দাঁড়াল ওয়েইটার। খাবারগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বার্গারে কামড় বসাল মুসা। টুকরোটা মুখে রেখেই দুই ঢোক কোক দিয়ে ভিজিয়ে চিবাতে শুরু করল।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাইতে টমেটো কেচাপ ঢালল রবিন। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের মায়ানেকড়ে?'

'কেন মনটানার কথা ভুলে গেলে? আরেকটু হলেই তো প্রাণটা গেছিল তোমার।'

'না, ভুলিনি। কিন্তু মায়ানেকড়ের কথা হঠাৎ করে এখন কেন?'

ওদের কথায় কান নেই কিশোরের। তাকিয়ে আছে বাটির সবুজ থকথকে আঠাল তরল পদার্থটার দিকে। ওর মনে হচ্ছে নড়ছে ওটা। ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে মাঝখানটা। ফেঁপে উঠতে উঠতে বাটির কিনার ছাড়িয়ে উপচে পড়তে শুরু করল টেবিলক্লথে। সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে চলে গেল কিনারে। মাটিতে পড়ল। এঁকেবেঁকে সবুজ সাপের মত হয়ে এগোতে লাগল ওর পায়ের

দিকে। জুতো বেয়ে উঠতে শুরু করল। পেঁচিয়ে ধরল গোড়ালি...

চিৎকার করে উঠল সে।

'কি হলো!'

'এমন করছ কেন!'

উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল মুসা আর রবিন।

চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। দেখল যেখানকার স্যুপ সেখানেই আছে। গরম ধোঁয়া উঠছে আগের মতই। বিমূঢ়ের মত দুই বন্ধুর দিকে তাকাতে লাগল সে।

ওর কাঁধ চেপে ধরল মুসা, 'চলো, খাওয়ার দরকার নেই। বাড়ি চলো। তুমি অসুস্থ।'

দুই

গোধূলির ধূসর আলোয় ব্ল্যাক ফরেস্ট গোরস্থানের সারি সারি কবর-ফলকগুলোর দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের, যেটা সাধারণত হয় না ওর। গোস্ট লেনের বাড়িতে রবিনকে নামিয়ে দিয়ে রকি বীচে ফিরে চলেছে। গাড়ি চালাচ্ছে মুসা।

রাস্তার পাশের পুরানো বড় বড় গাছগুলোর ছায়া পড়েছে কবরস্থানের ওপর। ঝপ করে যেন তাপমাত্রা নেমে গেল কয়েক ডিগ্রি। পুরো ব্যাপারটা তার কল্পনাও হতে পারে। শরীর খারাপ বলেই হয়তো এমন লাগছে।

'কিশোর,' সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল মুসা, 'বিষটা যদি এখনও থেকে থাকে আমার রক্তে?'

'উঁ!...' কবরস্থানের দিক থেকে চোখ ফেরাল কিশোর। 'না, নেই। থাকলে এতদিনে যন্ত্রণা শুরু হত।'

'কি করে বুঝব?'

'রক্ত পরীক্ষা ছাড়া আর কি ভাবে? তুমি তো রাজি হচ্ছ না।'

'ওই যে বলি, ভয় লাগে। যদি সত্যিই থেকে থাকে...'

'তাহলে চিকিৎসা করাতে হবে। এটা কোন ভূতুড়ে ব্যাপার নয়। ডক্টর মুনের ওষুধের বিক্রিয়া। বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। সারানোর উপায় নিশ্চয় বের করে ফেলতে পারবেন ডাক্তাররা। অত ভাবছ কেন? বরং পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াটাই কি ভাল নয়?'

'যদি ডাক্তার বলে দেন এই বিষ দূর করা যাবে না?'

'বড় বেশি "যদির" ফাঁদে পড়েছ। এ রকম করলে তো রোগ সারাতে পারবে না...কেন, তোমার কি আসলেই মনে হচ্ছে রোগটা ধরেছে তোমাকে? কিছু ফিল করছ নাকি?'

বড় একটা গাছের নিচে ঢুকল গাড়ি। মুসার চেহারাটা অস্পষ্ট হয়ে গেল। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, 'কিছু বুঝিটুঝি না...এককে সময় মনে হয়...জোরে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে...ইচ্ছে করে বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি...'

'ইচ্ছেই করে কেবল, কাঁদো তো আর না।'

'না, কাঁদি না।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল মুসা, 'কিশোর, এমন যদি হয়, পিটারের মত মায়ানেকড়ে হয়ে যাই আমিও, তোমাকে আর রবিনকে...উফ্, ভাবতেও পারি না সেকথা!'

'থাক, ভাবার দরকারও নেই। তুমিও মায়ানেকড়ে হবে না, আমাদেরও ভয় নেই। অতএব এ সব দুশ্চিন্তা বাদ।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বোঝার চেষ্টা করছে, সত্যি সত্যি মুসার মধ্যে শয়তান ঢুকেছে কিনা।

কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। এ ভাবে অবশ্য যায়ও না।

রাস্তার পাশে গাছপালার ছায়া বড় হচ্ছে। পুরোপুরি রাত নামার আগেই অন্ধকার করে ফেলছে।

ভাবনাটা দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েও পারল না কিশোর। বিষের ক্রিয়া যদি আরম্ভই হয়ে যায়, তাহলে মুসার মায়ানেকড়ে হতে আর কতদিন? যদি আজই শুরু হয়? আর কতক্ষণ লাগবে হতে?

দূর! কি যা-তা ভাবছে! জোর করে ভাবনাটা তাড়ানোর চেষ্টা করল সে।

ইয়ার্ডের গেটের সামনে কিশোরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল মুসা।

ভেতরে ঢুকল কিশোর। রাত হয়েছে। ইয়ার্ডের কাজকর্ম শেষ। বোরিস আর রোভারের ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয় টেলিভিশন দেখছে ওরা।

মেরিচাচীর অফিসটা অন্ধকার। আরেকটু এগোতে রান্নাঘর থেকে ভেসে এল ফ্রাই করা মুরগীর মাংসের সুবাস।

বারান্দা পেরিয়ে হলঘরে ঢুকল সে। সিঁড়ির দিকে এগোল। গোড়ার একপাশে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে একগাদা কাপড়-চোপড়। ধোপার কাছ থেকে ধোলাই হয়ে এসেছে।

উবু হয়ে নিজের কাপড়ের বান্ডিলটা তুলে নিল সে। উঠে এল নিজের ঘরে। দরজা দিয়ে ঢুকতে জানালার দিকে চোখ পড়ল। ধোয়া নতুন সাদা পর্দা লাগিয়ে দিয়ে গেছেন চাচী। খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার আলো ঢুকছে। বাতাস আসছে। পর্দা উড়ছে।

বিছানার দিকে চোখ পড়ল ওর।

নিজের অজান্তে কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট চিৎকার। হাত থেকে খসে পড়ল কাপড়ের বান্ডিল।

ওর বিছানায় চাদরে ঢেকে চিত করে ফেলে রাখা হয়েছে একটা মানুষের লাশ। লাশ যে সেটা বোঝা গেল বিকৃত, থেঁতলানো মুখটা দেখে। মাথাটা বেরিয়ে আছে চাদরের বাইরে।

কিশোরের চোখ বিছানার দিকে। লক্ষই করল না নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে আলমারির দরজা।

'এপ্রিল ফুল!'

চিৎকারটা শুনে ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। ঝট করে ফিরে তাকাল।

হাসতে হাসতে আলমারি থেকে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। সাত-আটের বেশি হবে না বয়েস। কিশোর তাকাতেই আরও জোরে হেসে উঠল।

'কে তুমি?'

জবাব না দিয়ে ছেলেটা বলল, 'নিজেকে নাকি খুব চালাক ভাবো? অনেক বড় গোয়েন্দা? কেমন বোকাটা বনলে।'

মেঝেতে পড়ে যাওয়া কাপড়ের বান্ডিল ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। কঠোর কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

'ডন।'

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল কিশোর, 'ডন মানে?'

'ডন মানে ডন। তোমার কোন নাম নেই?'

'কিশোর…'

'জানি আমি। ওরকমই আমার নামও ডন। অ্যারিজোনা থেকে এসেছি।'

'খুব ভাল করেছ। ধন্য করে দিয়েছ আমাকে। এ সবের মানে কি?'

'মানে, বোকা বানানো।' সুইচ কোথায় জানা আছে ডনের। আলো জেলে দিল। কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে কুটিকুটি। 'তুমি যে এতটা ভীতু হবে, কল্পনাও করিনি। কত কথাই না শুনেছি তোমার নামে। তোমার মত দুঃসাহসী নাকি…'

'আমি ভয় পাইনি…'

'নিশ্চয় পেয়েছ,' হাত তুলে কাপড়ের বান্ডিলটা দেখাল ডন, 'ওটাই তার প্রমাণ।'

'বেশ, পেয়েছি। তাতে কি? মানুষমাত্রই ভয় পায়।'

'তা ঠিক। কত বড় বড় বাহাদুর দেখলাম। সবাইকেই ভয় দেখিয়েছি আমি। আমার এক চাচা, আফ্রিকায় গিয়ে হাতি-গণ্ডার মারার গপ মারে। একদিন এমন ভয় দেখালাম…'

'কি দিয়ে বানিয়েছ ওটা?' বিছানার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।

ওর আগেই ছুটে গিয়ে মাথাটা তুলে নিল ডন। চাদরের নিচে কোলবালিশ রেখে দিয়েছে। মাথাটা আলগা ভাবে লাগিয়ে রেখেছিল ওটার সঙ্গে।

'দেখি, কি দিয়ে বানিয়েছ?' হাত বাড়াল কিশোর।

দিল না ডন, 'না, নষ্ট করে ফেলবে। অনেক পরিশ্রম হয়েছে

আমার। কাগজ, আঠা, রঙ, স্কচ টেপ…স্কুলের ক্লাসে টেবিলে কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। কাপড় তুলে আর্ট ক্লাসের ম্যাডাম তো আরেকটু হলেই চোখ উল্টে পড়ে যাচ্ছিল…'

বুঝিয়ে দিল সে, ট্রাকের চাকায় চাপা পড়া মানুষের মাথা। একটা কান নেই। ছিঁড়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে ডনের হাতের জিনিসটা দেখছে কিশোর। ভালই বানিয়েছে। প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু রাগটা এখনও যায়নি, তাই ব্যঙ্গ করল, 'তা এটা বানানোর জন্যে কোন্ গ্রেড দিল ম্যাডাম? ক.'

'গাধা নাকি। আর্ট ক্লাসের গ্রেড থাকে না জানো না?'

'গাল দেবে না!' কঠোর স্বরে বলল কিশোর, 'মুখ খারাপ করা একদম পছন্দ নয় আমার।'

'গাল দিলাম কোথায়? গাধা কি গাল? ওটা তো কথা। বোকাদের বলে।'

'আমি বোকা নই।'

'বোকা তো বটেই, ভীতুও; একটু আগেই বোঝা হয়ে গেছে আমার সেটা।'

ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল কিশোর। ছেলেটা খুব চালাক। উপস্থিত বুদ্ধিও খুব। মুখে ধারাল জবাব যেন তৈরিই হয়ে থাকে। ওকে ঘাঁটানোর সাহস পেল না আর। কোন্টা বলে আবার কোন কথা শুনতে হয়। সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'বেশ, আমি বোকা-ভীতু সবই, যাও। কিন্তু তুমি মানুষটা কে?'

'বললাম না ডন।'

'আরে বাবা ডন তো বুঝলাম। কি পরিচয়, কোথায় থাকো,

এখানে কি করছ...'

'নাহ্, তুমি গোয়েন্দা হওয়ার একেবারে অনুপযুক্ত। কেন যে তোমাকে বড় গোয়েন্দা বলে! বুঝলাম, বাড়ানো কথা শুনেছি...যাকগে, কয়েক মিনিট আগেই তো বললাম অ্যারিজোনা থেকে এসেছি। এর মধ্যেই ভুলে গেলে? এত তাড়াতাড়ি কোন কথা কিন্তু ভোলে না শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারো।'

'পড়ে ফেলেছ ওদের গল্প!' অবাক হলো কিশোর। 'এত অল্প বয়েসে?'

'সাত বছর আট মাস হয়েছে আমার বয়েস,' মাথা উঁচু করে জবাব দিল ডন। 'এত অল্প বয়েস দেখলে কোথায়? হ্যাঁ, বাবার র‍্যাকে যতগুলো কোনান ডয়েল আর আগাথা ক্রিস্টি আছে, সব পড়া হয়ে গেছে আমার।'

আরও সাবধান হলো কিশোর। এ ছেলে শুধু বুদ্ধিমানই নয়, পড়ুয়াও। জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমার বাবা ভদ্রলোকটি কে?'

'মস্ত বিজ্ঞানী। মেরিখালা যদি তোমার চাচী হন, সম্পর্কে আমার বাবা তোমার চাচা হন। আইব্রাম হেনরি স্টোকার। তাই বলে ড্রাকুলার লেখক ব্রাম স্টোকারের আত্মীয় ভেবে বোসো না আবার...'

'তুমি হেনাচাচার ছেলে! আগে বলবে তো!'

'বলার সুযোগটা দিলে কোথায়? যেভাবে হাসানো আরম্ভ করলে আমাকে...'

হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। 'হাত মেলাও, জলদি! হেনাচাচা কোথায়? আর ভিকিআন্টি?'

'আব্বা-আম্মা কেউই আসেনি। আমাকে বাসে তুলে দিয়ে বলল, যেতে পারবি? বললাম, পারব না মানে? স্পেসশিপে তুলে দিলে মঙ্গলেও চলে যেত পারব। চলে এলাম, একাই। তোমাদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে।'

'কিন্তু বসন্তের ছুটি তো প্রায় শেষ হয়ে এল।'

'সারাটা ছুটি মরুভূমিতে গিয়ে কাটিয়েছি আব্বার সঙ্গে। বাড়ি ফিরে ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না। জেদ শুরু করলাম, যে কদিন সময় আছে সে-কদিনই মেরিখালার কাছে থাকব। রকি বীচের সৈকত দেখার আমার অনেক দিনের শখ। বাধ্য হয়ে শেষে আম্মা বাসে তুলে দিল...'

'চলে এসে খুব ভাল করেছ...'

'সত্যি বলছ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের চোখের দিকে তাকাল ডন। অন্তরের অন্তস্তলটা পর্যন্ত যেন দেখে নিচ্ছে। একেবারে বাবার চোখ পেয়েছে ছেলেটা। সেরকমই বুদ্ধিদীপ্ত। কুচকুচে কালো।

'মিথ্যে বলব কেন?'

মিটিমিটি হাসছে ডন। 'যে ভয়টা দেখালাম...'

'বুদ্ধিমান ছেলেদের ভাল লাগে আমার...'

'আমারও। আর যারা রসিকতা বোঝে তাদের তো আরও বেশি,' এতক্ষণে হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়াল ডন।

তিন

সে-রাতে চাঁদের নীলচে আলো যখন ধুয়ে দিচ্ছে কিশোরের শোবার ঘর, জানালা দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে এসে ভেতরে ঢুকল পিটার হুইটম্যান। আগের মতই বিষণ্ন ফ্যাকাসে চেহারা। হাসি নেই মুখে। পানিতে সাঁতার কাটছে যেন, এমনি ভঙ্গিতে বাতাসে ভাসতে ভাসতে এসে নামল বিছানার পাশে। ঝুঁকে তাকাল কিশোরের মুখের দিকে।

স্বপ্ন দেখছি আমি—ভাবল কিশোর।

কই, স্বপ্ন তো মনে হচ্ছে না? একেবারে বাস্তব।

কিন্তু পিটার মরে গেছে। নিজের চোখে ওর কফিন কবরে নামাতে দেখেছে। উঠে আসে কিভাবে? হুইটম্যানের র‍্যাঞ্চে প্রথম যেদিন দেখেছিল ওকে, সেই একই পোশাক পরনে।

'পিটার, এখানে এলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঠোঁট নড়ল পিটারের। কোন শব্দ বেরোল না।

'এত মন খারাপ কেন আপনার?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

আবার পিটারের ঠোঁট নড়ল। শব্দ বেরোল না। চাঁদের আলোয় রক্তশূন্য, নীলচে দেখাচ্ছে ওর ঠোঁট, কফিনে শোয়ানোর পর যেমন দেখা গিয়েছিল। চুলগুলো নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো। একটা চুলও এদিক সেদিক নেই।

উঠে বসে ওকে ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। কিন্তু নিঃশব্দে ভেসে সরে গেল পিটার।

আরেকটু সামনে ঝুঁকল কিশোর। আবার হাত বাড়াল। ছুঁতে পারল না এবারও। ওর নাগালের বাইরে সরে গেল পিটার।

চাঁদের নীল আলোটা এখন ঘুরতে আরম্ভ করেছে ওদের ঘিরে। যেন একটা আলোর ঘূর্ণাবর্ত। নিঃশব্দ, শীতল।

'পিটার, কি চান আপনি?' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর। 'স্পষ্ট করে বলুন। নইলে বুঝব কিভাবে?'

ঠোঁট নড়ল পিটারের। শীতল চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ কিশোরের চোখে। কিছু একটা বলতে চাইছে। বুঝতে পারছে না সে।

'কেন এসেছেন? কি বলতে চাইছেন? জোরে বলছেন না কেন?'

আরেকটু এগিয়ে এল পিটার। চাঁদের নীল আলোটা ঘুরছেই। দ্রুত হচ্ছে ঘূর্ণিপাক।

'আপনাকে খুব বিষণ্ন লাগছে,' কিশোর বলল। 'কি হয়েছে আমাকে বলুন। আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব আমি।'

আস্তে হাতটা তুলে নিজের চুল খামচে ধরল পিটার। টান দিল জোরে। ওপর দিকে টানটান হয়ে গেল চুলগুলো। গলার ওপর

থেকে খসে গেল মাথাটা।

'না না! এ-কি করছেন!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

চুল ধরে ছেঁড়া মাথাটা বুকের কাছে নামিয়ে আনল পিটার। আরেক হাতের আঙুল সোজা করে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে ওটা দেখিয়ে বোঝাতে চাইল কিছু।

'আরে কি করছেন আপনি? পাগল হয়ে গেলেন নাকি?' চিৎকার করে বলল কিশোর। তাকাতে পারছে না বীভৎস দৃশ্যটার দিকে।

ভাল করে দেখানোর জন্যে আরেকটু এগিয়ে এল পিটার। ছেঁড়া মাথাটা বাড়িয়ে ধরল কিশোরের নাকের কাছে। যাতে খুলির ভেতরে কি আছে দেখতে পারে।

'কি দেখাতে চান?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

খুলিটার দিকে তাকাল সে। চমকে গেল। খুলির গভীরে কিলবিল করে নড়ছে কি যেন।

আরেকটু কাত করে ধরল পিটার। চাঁদের আলো যাতে ভেতরে পৌঁছতে পারে।

কি আছে দেখতে পেল এবার কিশোর।

তেলাপোকা!

রাশি রাশি তেলাপোকা গাদাগাদি করে থেকে কিলবিল করছে। বেরোনোর চেষ্টায় বার বার একে অন্যের পিঠে চড়ে বসছে। ওগুলোর কাঁটাওয়ালা পা আর ডানা ঘষার খড়খড় শব্দও কানে আসছে।

তেলাপোকাকে ভয় পায় না কিশোর। কিন্তু ছেঁড়া মুণ্ডের মধ্যে কুৎসিত প্রাণীগুলোকে ভয়ঙ্কর লাগছে। জোরে চিৎকার করে সামনে থেকে সরানোর জন্যে বলতে গেল পিটারকে। স্বর বেরোল না...

ঘুম ভেঙে গেল ওর। দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে। চিৎকার করে ডাকতে গেল আবার, 'পিটার...'

কিন্তু দেখতে পেল না আর ওকে। নীল আলোর ঘূর্ণিটাও নেই। ঘরের মধ্যে এখন শুধু চাঁদের স্বাভাবিক সাদাটে-নীল জ্যোৎস্না।

ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। 'কি দেখলাম!' জোরে জোরে নিজেকে প্রশ্ন করল সে। ঝাড়া দিয়ে মগজের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করল। 'পিটারকে দেখলাম কেন? অন্য কেউ আসতে পারল না স্বপ্নের মধ্যে!'

গায়ের কাঁপুনি থামার অপেক্ষা করল সে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পানি খাওয়ার জন্যে নামতে গেল বিছানা থেকে।

পা ফেলতেই পায়ের নিচে পড়ল কি যেন। নড়ে উঠল। পটাস করে বিশ্রী একটা শব্দ তুলে ফুটল ওটা।

ঝট করে পা'টা তুলে নিয়ে এল আবার ওপরে। পায়ের নিচে কি পড়েছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ভয়ে ভয়ে গলা বাড়িয়ে তাকাল নিচের দিকে।

এ-কি! হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ তেলাপোকা কিলবিল

করে নড়ে বেড়াচ্ছে কার্পেটের ওপর। বিছানার ধার বেয়ে উঠে আসছে।

তেলাপোকাকে কোনকালে ভয় পায় না সে। কিন্তু এখন পেল। হঠাৎ কি যেন কি ঘটে গেল মাথার মধ্যে। জীবনে যে কাজটা করেনি, সেটাই করে বসল। ভীষণ আতঙ্কে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দৌড় দিল দরজার দিকে।

পোকাগুলোও তাড়া করল ওকে। পেছন পেছন ছুটল। পা বেয়ে উঠতে শুরু করল। ঢুকে যেতে লাগল পাজামার মধ্যে।

'চাচা! চাচা!' চিৎকার করতে লাগল সে, 'জলদি এসো! আমাকে মেরে ফেলল!'

বিছানা থেকে দরজাটাও যেন বহুদূর। পৌঁছতে অনেক সময় লাগছে। পায়ের নিচে পড়ে পটাস পটাস করে ফাটছে অসংখ্য তেলাপোকা। বিশ্রী দুর্গন্ধ। বমি আসছে ওর।

ছুটে দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'চাচা! চাচী!'

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রাশেদ পাশা। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'চাচা...' কথা বলতে পারছে না কিশোর। থরথর করে কাঁপছে।

'কি?' এগিয়ে এলেন রাশেদ পাশা।

মেরিচাচীও বেরিয়ে এসেছেন। তিনিও এগোলেন কিশোরের দিকে।

কাছে এসে দাঁড়ালেন রাশেদ পাশা। কিশোরের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিলেন। 'অমন করছিস কেন?'

'চাচা! তেলাপোকা!' পোকাগুলোর কিলবিলে কাঁটাওয়ালা পায়ের শিরশিরে খোঁচা এখনও অনুভব করছে যেন পাজামার নিচের চামড়ায়।

'তেলাপোকা?'

'তেলাপোকা!'

'আর তাতেই তুই ভয়ে কাবু হয়ে গেছিস?' খুবই অবাক হলেন রাশেদ পাশা। ওঁর ভাতিজা, কিশোর পাশা, তেলপোকার ভয়ে রাতদুপুরে এমন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। 'তেলাপোকাকে তুই ভয় পাস...'

রাশেদ পাশার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। কিশোরকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তোর কি হয়েছে? অসুখ করেনি তো?' স্বামীর দিকে তাকালেন, 'ডাক্তারকে খবর দেবে নাকি?'

আস্তে করে চাচীর হাত ছাড়িয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল কিশোর। বেডরুমের দিকে হাত তুলে বলল, 'তেলাপোকা!'

আবার স্বামীর দিকে তাকালেন মেরিচাচী। শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'ওর তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে, দেখছ না! ডাক্তারকে ফোন করো!'

রাশেদ পাশা বললেন, 'চল্ তো দেখি, কোথায় তোর তেলাপোকা?'

আগে আগে হেঁটে চলল কিশোর। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত

তুলে ঘরের মধ্যে দেখাল, 'ওই দেখো। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পোকা কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।'

দরজা দিয়ে উঁকি দিলেন রাশেদ পাশা। 'কই? কোথায় তোর তেলাপোকা? একটাও তো দেখছি না।'

মেরিচাচীও উঁকি দিলেন। তেলাপোকা দেখলেন না।

'নেই?' বিমূঢ়ের মত বলল কিশোর। সে-ও উঁকি দিল। 'তাই তো!'

একটা পোকাও নেই। সব চলে গেছে।

পেছন থেকে তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'কি হয়েছে? বাড়িতে ডাকাত পড়ল নাকি? চেঁচামেচি করে আমার ঘুম ভাঙানোর কারণ কি?'

ফিরে তাকালেন মেরিচাচী। ধমক দিয়ে বললেন, 'পাকামো রাখ! তুই কিছু করে রাখিসনি তো? কিশোরকে ভয় দেখানোর জন্যে?'

'আমি ভয় দেখাতে যাব কেন?'

'তোর তো স্বভাবটাই ওরকম। আজই তো একবার দেখালি।'

'তারপর তো সব মিটমাট হয়ে গেছে। ওর বন্ধু হয়ে গেছি। বন্ধুর সঙ্গে শয়তানি করি না আমি। তেলাপোকার কথা শুনলাম? কি হয়েছে?'

ঘরের ভেতর উঁকি দিল ডন। কিছু চোখে পড়ল না। ভেতরে ঢুকল।

আলো জ্বেলে দিলেন রাশেদ পাশা।

কিশোরের বিছানার পাশে একটা মরা তেলাপোকা পড়ে

থাকতে দেখল ডন। পায়ের চাপে ভর্তা হয়ে গেছে। হা-হা করে হেসে উঠল সে, 'এক তেলাপোকার ভয়েই এত হাঁকডাক। হায়রে আমার কপাল!' বড়দের ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল সে। 'এই তাহলে বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা কিশোর পাশা, যার বীরত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা।'

ডনের ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন রাশেদ পাশা। কিশোরের উদ্দেশে বললেন, 'এত এত হাতি-গণ্ডার-জাগুয়ারের সঙ্গে হাতাহাতি করে শেষে তেলাপোকা মেরে এই কাণ্ড!'

'দেখো, হাসবে না!' মুখ কালো করে বললেন মেরিচাচী, 'এতে হাসির কিছু নেই। আমার ছেলেকে আমি চিনি। ওর কিছু হয়েছে।' কিশোরের দিকে তাকালেন, 'এত মানা করি, বেশি মাথা খাটাবি না, খাটাবি না; পাগল হয়ে যাবি কোন্দিন! হলি তো এখন?' আবার তাকালেন স্বামীর দিকে, 'তুমি ফোন করবে নাকি ডাক্তারকে?'

'দাঁড়াও, আগে বুঝে দেখি,' কিশোরের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা, 'ঘরের মধ্যে তেলাপোকা কিলবিল করছে, এ কথা কেন মনে হলো তোর?'

'দেখলাম যে...' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'পায়ের নিচে পড়ে পটাপট ফাটতে লাগল ওগুলোর শরীর...'

'মরল তো মোটে একটা। এত এত দেখলি কোথায়? দুঃস্বপ্ন দেখিসনি তো?'

'অ্যাঁ!' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, তা দেখেছি। পিটারকে দেখলাম...নিজের হাতে ওর মাথাটা ছিঁড়ে নিল ও...খুলির মধ্যে

অনেক তেলাপোকা...'

'হুঁ, এই তো ভেদ হয়ে গেল রহস্য...নে, শুয়ে পড়। শোয়ার আগে মাথায় ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আয়।'

'হুঁ, যাচ্ছি,' স্বাভাবিক হয়ে এল আবার কিশোরের কণ্ঠস্বর। বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

চার

'এসে গেছি,' জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলল কিশোর।

রক হিল কলেজের ক্যাম্পাসে ঢুকল বাস।

'দারুণ জায়গা তো!' পেছন থেকে বলে উঠল চুং। 'ইঁটের বাড়িগুলোকে যে ভাবে আইভি লতায় ছেয়ে আছে, মনে হচ্ছে সিনেমার সেট সাজানো হয়েছে।'

কিশোরের পাশে বসেছে রবিন। ওর ওপর দিয়ে ঝুঁকে জানালায় মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কিন্তু মানুষ কই? কেউ তো নেই।'

'থাকবে কোত্থেকে,' সামনের সীট থেকে মুসা বলল। 'ছুটি না এখন কলেজ।'

'অত আফসোসের কিছু নেই,' বলল মুসার পাশে বসা তিন গোয়েন্দার বন্ধু টমাস মার্টিন। খেলার লিস্টে তারও নাম আছে। 'একটু পরেই দেখবে সব ভরে গেছে। হাঁটার জায়গাও পাবে না তখন।'

গম্বুজওয়ালা বিশাল জিমনেশিয়ামের পাশ কাটিয়ে এসে একটা ইঁটের বাড়ির সামনে বাস থামাল ড্রাইভার। এটা ডরমিটরি। এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে খেলোয়াড়দের। বদ্ধ ঘরে কারও থাকতে

মন না চাইলে ক্যাম্পাসে তাঁবু খাটিয়েও থাকা যেতে পারে, বাধা নেই।

এটা বনবাদাড় নয় যে বাইরে থাকলে প্রকৃতি দেখা যাবে, তাই ডরমিটরিতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। ওদেরকে থাকার জায়গা দেখিয়ে দিল ডরমিটরির কেয়ার-টেকার।

ঘরটা সুন্দর। বিশাল জানালা দিয়ে ক্যাম্পাসের অনেকখানি চোখে পড়ে। দেয়ালে হালকা সবুজ রঙ, ছাতের রঙ উজ্জ্বল হলুদ। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটার সঙ্গে আরেকটা লাগিয়ে জোড়া দিয়ে রাখা আছে দুটো ডেস্ক। তৃতীয় আরেকটা ডেস্ক রয়েছে দেয়াল ঘেঁষে দুটো ড্রেসারের মাঝখানে।

জানালার ধারের সরু বিছানাটায় ব্যাকপ্যাক ছুঁড়ে দিয়ে রবিন বলল, 'দখল করলাম। এটাতে আমি শোব। জানালাটা আমার খুব দরকার।'

উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা দোতলা খাট—বাঙ্ক বেড বলে এগুলোকে। মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কোন্‌টা নেবে, ওপরেরটা না নিচেরটা?'

'একটা হলেই হলো। ওপরেরটাই নিই। লাফ দিয়ে ওপরে উঠতে আমার কোন অসুবিধে নেই।'

'আমারও নেই,' হাসল কিশোর। 'তা থাকো ওপরে। আমি নিচেই থাকব। ঘুমাতে পারলেই হলো।'

'ক্যাম্পাসটা কিন্তু অনেক বড়,' জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল রবিন। 'এতটা ভাবিনি।' ঘাসে ছাওয়া বিশাল এক চতুর্ভুজকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে আরও কয়েকটা ডরমিটরি।

'ওই যে আসতে আরম্ভ করেছে,' রবিনের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'খানিক পর কিলবিল করতে থাকবে ছেলেমেয়েরা...পনেরোটা স্কুল, সোজা কথা!'

'তোমার তেলাপোকাদের মত,' হেসে বলল রবিন।

'থাক্, আর মনে কোরো না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'যে ভয় পেয়েছিলাম কাল রাতে, উফ্! এমন কাণ্ড জীবনে হয়নি আমার।'

বাসে আসতে আসতে গতরাতের দুঃস্বপ্নের কথা দুই সহকারীকে খুলে বলেছে সে।

'একটা স্বপ্নবৃত্তান্তের বইতে পড়েছি আমি,' বিছানায় বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল মুসা, 'পরিচিত কেউ যদি রাতে স্বপনে দেখা দেয় তো বুঝতে হবে সে কিছু বলতে এসেছিল।'

ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি বলতে এসেছিল মরা পিটার? তেলাপোকার কথা? সাবধান করতে চেয়েছিল পোকায় পোকায় ছেয়ে যাবে আমাদের ইয়ার্ড? এমনিতেও কি কম আছে নাকি? জঞ্জালের ভেতর থেকে তেলাপোকা দূর করা অসম্ভব।'

দুহাতের তালু উল্টে ঠোঁট বাঁকাল মুসা, 'তা জানি না। তবে কিছু একটা বলতে এসেছিল...'

দরজায় থাবা পড়ল।

উঠে গিয়ে খুলে দিল রবিন। 'ও, চুং। কি ব্যাপার?'

কালো জিনস আর সবুজ টি-শার্ট পরেছে চুং। বিশাল দুই স্যুটকেস হাতে ঘরে ঢুকল। ভারের চোটে দুকাঁধ ঝুলে পড়েছে। হাত থেকে ওগুলো মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল

রবিনের বিছানাটায়। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'উফ্, মরে গেছি!'

দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল রবিন, 'মরার আবার কি হলো?'

'তোমাদের সঙ্গে থাকা যাবে?' লম্বা বেণিটা কাঁধের ওপর সোজা করে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল চুং।

'মানে?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'টম আর রুদলাম যেটাতে উঠেছে, ওটাতে আমার জায়গা হলো না। আমি স্যুটকেস খোলার আগেই দুটো ড্রেসার দখল করে ফেলল ওরা। দেখছ না কত মালপত্র আমার,' স্যুটকেস দুটো দেখাল সে। 'ওরা দুজনে একটা ড্রেসার নিয়ে বাকি দুটো যদি আমাকে দিয়ে দিত, তাহলে কোনমতে ঠেসে ঠেসে ভরতে পারতাম।'

'থাকব তো মোটে সাতদিন, অত জিনিস আনতে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল মুসার। করল না।

'তোমাদের ঘরটা বেশ বড়,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল চুং। 'এখানে ছাড়া আর কোন ঘরেই আমার এত জিনিস ধরবে না।'

'কিন্তু, চুং...' বলতে গেল মুসা।

'দেখো না,' ওর কথা যেন কানেই যায়নি চুং-এর, 'আমি বললাম নিচে শুতে পারি না, ওপরের বিছানাটা আমাকে দাও, দিল না টম। আমি নিচে থাকলে আর ওপরে কেউ শুয়ে থাকলে আমার বড় ভয় লাগে। একটু নড়লেই মনে হয় এই বুঝি ভেঙে পড়ল। ঘুম তো দূরের কথা, স্বস্তিতে শুতেও পারি না। কতভাবে বুঝিয়ে বললাম ওকে, শুনলই না।'

'কিন্তু ওঘরেও নিশ্চয় আরেকটা বিছানা আছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওটাতে শুতে আপত্তি কিসের?'

'আছে,' রেগে উঠল চুং, 'ওটাও দিল না আমাকে। রুদলাম দখল করে নিল। বলল জানালার কাছে ছাড়া রাতে দম নিতে পারে না ও। আমাকে সাফ বলে দিল, থাকলে বাঙ্ক বেডের নিচেরটাতেই থাকতে হবে।'

'তা তোমার এখন ইচ্ছেটা কি?' জানতে চাইল রবিন।

'আমি তোমাদের এখানে জায়গা চাই।'

'কিন্তু এখানেও তো তিনটেই বিছানা,' কিশোর বলল। 'চারজন তো জায়গা হবে না।'

'এই ঘরগুলো তৈরিই করা হয়েছে তিনজনের উপযোগী করে,' কিশোরের সঙ্গে সুর মেলাল মুসা। 'তিনটে ডেস্ক, তিনটে ড্রেসার, তিনটে বেড।'

আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল চুং। কালো করে ফেলল মুখ। বলল, 'ইচ্ছে করলে তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারো। ওদের ঘরে যদি একজন চলে যাও, আমি এখানে থাকতে পারি।'

'আমি যাব না,' বলে দিল মুসা। চুং ওর মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। নিজের সমস্ত সুবিধেগুলো এত বড় করে দেখবে কেন একজন মানুষ? অত স্বার্থপর হবে কেন?

'দোহাই তোমাদের, প্লীজ!' অনুনয় করে বলল চুং। 'তোমরা সাহায্য না করলে আমি কোথাও থাকতে পারব না। আমার ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে। নিচের বাঙ্কে আমি কিছুতেই শুতে পারব না। সত্যি বলছি, আমার ভীষণ ভয় লাগে।'

কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাতে লাগল সে।

অবশেষে রবিন বলল, 'ঠিক আছে, তোমার এতটা অসুবিধেই যদি হয়...'

'সত্যি হবে! বিশ্বাস করো।'

'বেশ, আমার বিছানাটা নিয়ে নাও,' বলল রবিন। 'আমি বরং ওদের ঘরে চলে যাচ্ছি...'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল চুং-এর মুখ। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্যুটকেস রবিনের বিছানায় তুলে এনে খুলতে শুরু করল। সৌজন্য দেখিয়ে একটা ধন্যবাদও দিল না।

ওর ওপর মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেল মুসার। কিন্তু কিছু বলল না।

কি ভেবে ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর, 'অ্যাই, আমাদের দেরি হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয়া দরকার। দুটোর সময় জিমনেশিয়ামে যেতে হবে, মনে নেই?'

'তাই তো,' লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রবিন। নিজের ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

'জিমনেশিয়ামটা কোথায়?' বিছানার ওপর জামাকাপড় সব ছড়িয়ে ফেলেছে চুং।

'লাল ইঁটের বড় বাড়িটা, গম্বুজওয়ালা,' কিশোর বলল, 'বাসে আসার সময় দেখোনি?'

'ও, ওটা।...ইস্, টমরা অনেক দেরি করিয়ে দিল আমাকে। এখন জিনিসপত্র খুলে গোছাব, না রেডি হব...একেবারে সময় পাব না। তোমরা কোন ড্রেসারটা নিয়েছ?'

মুসার জবাব দিতে ইচ্ছে করল না।

হাত তুলে দেখিয়ে দিল কিশোর, 'ওটা। একটাতেই হয়ে গেছে আমাদের। বাকি দুটো নিয়ে নাও তুমি। কিন্তু সময়মত যেতে চাইলে জলদি করো। যে রকম ঢিলেমি আরম্ভ করেছ...'

'কি করব, বলো? সময়টা তো টমরাই খেয়ে নিল। এক কথায় যদি বিছানাটা দিয়ে দিত তাহলে...আচ্ছা, প্র্যাকটিসের সময়ও কি ব্যাজ পরে যেতে হবে নাকি আমাদের?'

'না গেলে অন্যেরা বুঝবে কি করে আমরা কোন্ স্কুলের?'

'তা বটে। দেখো, আমরাই জিতব। কেউ পারবে না আমাদের সাথে।'

'আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল,' শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর।

'কিশোর, আমার একটা উপকার করবে?' একটা জিনসের প্যান্টের মোড়ক খুলতে খুলতে বলল চুং, এটা নিয়ে তৃতীয়টা খুলল।

এতগুলো এনেছে কেন মাথায় ঢুকল না কিশোরের। কয়েক বছর ধরে বাস করতে এলেও তো এত কাপড় লাগার কথা নয়। জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'বাথটাবে গরম পানিটা একটু ছেড়ে দেবে?'

অনুরোধ শুনে তাজ্জব হয়ে গেল কিশোর। 'কি বললে?'

'বাথটাবে পানি। বাসে আসতে গিয়ে একেবারে ঘেমে গেছি। আঠা লাগছে। গোসল না করে পারব না। এদিকে জিনিসপত্রগুলোও গোছানো দরকার। ক'টা করব? সব একসঙ্গে করতে গেলে সময়মত জিমনেশিয়ামে যেতে পারব না। দাও না, প্লীজ!'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। নীরবে মুখ ভেঙচাল মুসা।

'পারব না' বলতে গিয়েও কি ভেবে বলল না কিশোর। 'ঠিক আছে, দিচ্ছি।' কোণের বাথরুমের দিকে রওনা হলো সে।

'তুমিও রবিনের মতই ভাল,' পেছন থেকে ডেকে বলল চুং। আড়চোখে তাকাল মুসার দিকে। স্পষ্ট করেই যেন বুঝিয়ে দিল মুসা ভাল নয়।

আশ্চর্য! মনে মনে রেগে গেছে কিশোর। ছেলেটার ধৃষ্টতার প্রশংসা করতে হয়! নিজেকে কি ভাবে ও? রাজকুমার?

সাদা প্লাস্টিকের শাওয়ার কার্টেনটা ঠেলে সরাল কিশোর। পানি ছেড়ে দিল। কিছুটা পানি জমতে উবু হয়ে হাত দিয়ে দেখল গরম ঠিক আছে কিনা। HOT লেখা চাবিটা মোচড় দিয়ে আরেকটু বাড়িয়ে দিল গরম। বেরিয়ে এসে বলল, 'দিয়ে এসেছি।'

'থ্যাংকস,' এই প্রথমবার একটা ধন্যবাদ দিল চুং, তা-ও দায়সারা গোছের। মেয়েদের মত প্রচুর কসমেটিকস এনেছে, বিশেষ করে চুলের জন্যে। সেগুলো বের করে সাজিয়ে রাখতে লাগল ড্রেসারের ওপর।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'বসে আছ কেন? তাড়াতাড়ি করো।'

'কাণ্ড দেখছি,' না বলে আর পারল না মুসা। তাকালও না চুং-এর দিকে। কিছু মনে করলে করুকগে। বিছানা থেকে উঠে রওনা হলো বাথরুমের দিকে। কিশোরকে বলল, 'আসছি, এক মিনিট।'

দ্বিতীয় স্যুটকেসটা থেকে জিনিস বের করছে তখন চুং।

বেরিয়ে এল মুসা।

তৈরি হয়েই আছে কিশোর। মুসার তিরিশ সেকেন্ডের বেশি

লাগল না।

বেরোনোর আগে চুং-এর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'দেরি কোরো না কিন্তু। তাহলে সময়মত আসতে পারবে না।'

'না না, যাও। আমি ঠিকমতই চলে আসব। সময়ের ব্যাপারে আমার কখনও হেরফের হয় না।'

রেগে উঠতে যাচ্ছিল মুসা, অঘটন ঘটানোর ভয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল কিশোর। বাইরে বেরিয়ে হলওয়ে ধরে এলিভেটরের দিকে এগোল।

হঠাৎ নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল মুসা, 'এহ্হে, ব্যাজটা আনতে ভুলে গেছি! ওই বদমাশটা মেজাজই খারাপ করে দিয়েছে! দাঁড়াও, একদৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসি।'

মুসাকে বিশ্বাস নেই। যে রকম খাপ্পা হয়ে আছে, চুং কোন বেফাঁস কথা বললে এখন মেরে বসতে পারে। সঙ্গে চলল কিশোর।

দরজার নবে কেবল হাত রেখেছে মুসা, ভেতর থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

থমকে গেল দুজনে।

আবার শোনা গেল চিৎকার। চুং! এ রকম চিৎকার করছে কেন ও?

পাঁচ

মুসাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে নবে মোচড় দিল কিশোর। খুলল না। ভেতর থেকে লক করে দিয়েছে চুং।

চাবির জন্যে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিল কিশোর। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'চুং! কি হয়েছে, চুং!'

হাত কাঁপছে ওর। তাড়াহুড়োয় চাবিটা খসে পড়ে যাচ্ছিল, খপ করে লুফে নিল। ঢুকিয়ে দিল ফুটোতে।

দরজা খুলে হুড়মুড় করে যখন ঘরে ঢুকল ও, দেখে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে চুং। বড় লাল রঙের একটা তোয়ালে জড়ানো শরীরে। পানি পড়ছে ভেজা গা থেকে। কিশোরকে দেখেই ওর দিকে একটা আঙুল তুলে পিস্তলের মত নিশানা করে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি করে পারলে, বলো তো? পারলে কি করে?'

'কি হয়েছে, চুং?' বোকা হয়ে গেছে কিশোর।

'কি হয়েছে?' ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুসাও জিজ্ঞেস করল।

'কি করে পারলে!' মাথা খারাপ হয়ে গেছে যেন চুং-এর। 'আমাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে!'

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা।

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের, 'বলো কি!'

'উফ্, এত গরম পানি, টগবগ করে ফুটছিল! না জেনে তার মধ্যে ঢুকে গেলাম...আমি বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে!'

'কিন্তু, চুং...'

'দেখো, আমার পায়ের অবস্থা দেখো!' চিৎকার করে উঠল চুং। 'আরেকটু হলেই সেদ্ধ হয়ে যেতাম!'

ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে চামড়া। 'অসম্ভব!' নিজেকেই যেন বলল সে। 'এ হতে পারে না। নিজে হাত চুবিয়ে দেখেছি। অত গরম তো ছিল না পানি।'

জ্বলে উঠল চুং-এর চোখ। 'তবে কি মিথ্যে কথা বলছি আমি? পায়ের চামড়ার অবস্থা দেখছ না? আমি...আমি...তোমাকে...'

'হতে পারে কিশোর বেরিয়ে আসার পর পানিটা অতিরিক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল,' মুসা বলল।

'তা-ও হওয়ার সম্ভাবনা নেই,' কিশোর বলল। 'বেরোনোর আগেই আমি পানি ছুঁয়ে দেখেছি।'

তোয়ালেটা গায়ে আরও শক্ত করে পেঁচাল চুং। জবাব দিল না।

'দেখো, তোমাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে ছিল না আমার, বিশ্বাস করো,' কিশোর বলল।

'ডাক্তার ডাকব?' মুসা বলল, 'ওষুধ-টষুধ লাগলে...'

মাথা নাড়ল চুং। 'লাগবে না। অতটা পোড়েনি। আসলে ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম।'

'আমি সত্যি দুঃখিত,' কিশোর বলল। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না

এতটা গরম হলো কিভাবে? আমি বেরোনোর সময় তো অতটা ছিল না।'

কাঁধ ঝাঁকাল চুং। 'কি জানি! আমার কাছেই বোধহয় বেশি গরম লেগেছে।'

'সত্যি বলছ ওষুধ লাগবে না?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, লাগবে না,' ঘুরে আবার বাথরুমে ঢুকে গেল চুং।

'আমরা যাচ্ছি,' চিৎকার করে বলল মুসা। 'তোমার দেরি হলে মিস্টার হুয়াংকে বলব কেন হচ্ছে।'

'কিন্তু হলো কি করে এ রকম?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'বেরোনোর আগেও ছুঁয়ে দেখেছি পানি...'

ব্যাজটা বের করে নিল মুসা। 'চলো।'

বাইরে বেরিয়ে হলওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'অদ্ভুত! সত্যি অদ্ভুত!'

আসলেই অদ্ভুত। মনে মনে স্বীকার না করে পারল না কিশোর।

হঠাৎ মনে পড়ল, ও বেরিয়ে আসার পর বাথরুমে গিয়েছিল মুসা। সে গরম পানির চাবিটা বাড়িয়ে দেয়নি তো? চুংকে শায়েস্তা করার জন্যে?

জিমনেশিয়ামে পৌঁছে দেখল সবাই হাজির। ওরাই দেরি করেছে। সারি দিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে বাঁশি বাজালেন মিস্টার হুয়াং।

তীক্ষ্ণ শব্দটা ভাল লাগল না কিশোরের। বড় বিরক্তিকর। কানের পর্দায় লাগে। মাথার ভেতরটা কেমন এলোমেলো করে দেয়।

সারি দিয়ে দাঁড়ানোর পর মিস্টার হুয়াং লক্ষ করলেন, চুং নেই।

ও কোথায়, জানতে চাইলেন।

কি ঘটেছে, জানাল মুসা।

শুনে বিরক্ত হলেন ইন্‌স্ট্রাকটর। কিশোর আর চুং, দুজনের ওপরই।

প্র্যাকটিসের পর এতটাই ক্লান্ত বোধ করল কিশোর, একটা মুহূর্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না জিমনেশিয়ামের ভেতর। গরমও লাগছে সাংঘাতিক। দম আটকে আসছে। মুসা বা রবিন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এল সে।

শেষ বিকেলের শীতল বাতাস জুড়িয়ে দিল শরীর। নির্জন ক্যাম্পাস। বেশির ভাগ ছাত্র এখন জিমনেশিয়ামের ভেতর। রকহিল কলেজের কয়েকটা ছেলে সাইকেল নিয়ে এসেছে। মাঠের মধ্যে সাইকেল চালিয়ে ব্যায়াম করছে। কেউ তাকাল না ওর দিকে।

ডরমিটরির কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। এলিভেটরের দিকে রওনা হলো। মার্বেলের মেঝেতে ঘষা লেগে টিক টিক শব্দ তুলছে ওর স্নীকারের তলা। নীরব, নির্জনতার মাঝে ওই সামান্য শব্দও বেশি হয়ে কানে লাগছে। কান্ট্রি মিউজিক বাজছে কোথাও। ভয়ানক অস্বস্তির মাঝে সামান্য স্বস্তি।

ঘরে গিয়ে অনেক সময় নিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে গোসলের আরামের কথা ভেবে চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে। এলিভেটরে করে উঠে এল ছয় তলায়। লম্বা করিডর। গাঢ় রঙের কার্পেট। হেঁটে চলল নিজের ঘরের দিকে। হাঁটার সময় কোন শব্দ হলো না। জুতোর শব্দ হতে দিচ্ছে না কার্পেট।

কিন্তু আরেকটা কাণ্ড ঘটল। কার্পেটে আটকে যেতে শুরু করল

ওর জুতো।

ঘটনাটা কি? থেমে গিয়ে নিচের দিকে তাকাল সে।

মনে হলো নড়ে উঠল কার্পেটটা। পানিতে ঢেউ তোলার মত ঢেউ তুলল।

'আরি!' চোখ মিটমিট করল কিশোর। বন্ধ করে আবার খুলল। একবার। দুবার। ভাবল, বাইরের আলো থেকে এসে চোখে উল্টোপাল্টা দেখছে।

আবার পা বাড়াতে গেল। তুলতে পারল না। আঠাল আঠায় আটকে গেছে যেন জুতোর তলা। কার্পেটটা দুলছে। আগের চেয়ে বড় বড় ঢেউ তুলছে। গাঢ় খয়েরি রঙের একটা ছোটখাট সাগর যেন দুলছে ওর চোখের সামনে।

'পা তুলতে পারছি না কেন! আমি পা তুলতে পারি না কেন!' চিৎকার করে উঠল সে। 'অ্যাই, কেউ আছ! শুনতে পাচ্ছ?'

কেউ সাড়া দিল না।

আবার পা তোলার চেষ্টা করল সে। পারল না। মনে হলো ঘন আলকাতরা উঠে আসছে ওর পা বেয়ে। দেবে যাচ্ছে গোড়ালি।

টেনে নিয়ে যাবে নাকি আমাকে? চোরআলকাতরার তলায়!

নড়তে পারি না কেন?

এত আঠা এল কোত্থেকে?

টানছে…টানছে…

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

'কি হয়েছে?'

ফিরে তাকাল কিশোর।

অবাক হয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে রবিন। ঝপ করে পাশে বসল। একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। 'কিশোর, কি হয়েছে তোমার?'

'উফ্, এত আঠা,' এখনও ঘোর কাটেনি কিশোরের, 'কিছুতেই পা ছাড়াতে পারছি না!'

'কোথায় আঠা? কি হয়েছে?'

কার্পেটের দিকে তাকাল কিশোর। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল এখনও ঢেউ উঠছে কিনা।

নিথর হয়ে আছে কার্পেট। ঢেউ তো দূরের কথা, সামান্যতম কাঁপছেও না।

দুহাতে চোখ ডলল সে। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে ডাকল, 'রবিন?'

কিশোরের ওপর স্থির হয়ে আছে রবিনের দুই চোখ। হাত সরায়নি কাঁধ থেকে। 'মেঝেতে বসে আছ কেন এমন করে? পড়ে গিয়েছিলে নাকি?'

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। মাথা নাড়ল। 'না। টেনে নামিয়ে নিতে লাগল আমাকে।'

হাঁ হয়ে গেল রবিন। 'কি বলছ তুমি, আমার মাথায় তো কিছু ঢুকছে না!'

'কার্পেটটা দুলতে আরম্ভ করল। ঢেউ উঠতে লাগল। আলকাতরার মত ঘন আঠাল কি যেন বন্যার পানির মত ফুলে উঠতে শুরু করল। গোড়ালি দেবে গেল আমার। এত আঠা, কিছুতেই পা তুলতে পারছিলাম না।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন। আবছা আলোতেও ওর চোখের উৎকণ্ঠা আর অবিশ্বাস দেখতে পেল কিশোর।

ওর একটা হাত চেপে ধরল রবিন, 'চলো, ঘরে চলো। তুমি অসুস্থ।'

'কিন্তু স্পষ্ট যে দেখতে পেলাম...'

'থাক, আর কথা বলার দরকার নেই। ঘরে চলো।'

ছয়

সে-রাতে আবার পিটারকে স্বপ্ন দেখল কিশোর।

ঝলমলে সাদা স্লীপিং স্যুট পরে জানালা দিয়ে উড়ে এসে ঘরে ঢুকল সে। ওর বিছানার চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল।

'পিটার!' ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

এগিয়ে এল পিটার।

কিশোর ওকে ছোঁয়ার চেষ্টা করতেই নিঃশব্দে সরে গেল।

'পিটার, আবার কেন এসেছ?'

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিটার। জবাব দিল না।

'দোহাই তোমার, পিটার, চুপ করে থেকো না! কিছু একটা বলো!'

ঠোঁট নাড়ল পিটার। শব্দ বেরোল না।

'পিটার, অমন মন খারাপ করে রেখেছ কেন? কষ্টটা কি তোমার?'

কিশোরের ওপর শূন্যে ভেসে রইল পিটার। তাকিয়ে আছে ওর চোখের দিকে। তারপর আগের বারের মতই চুল চেপে ধরল।

টেনে ছিঁড়ে আনল মাথাটা। কাত করে ধরল কিশোরের দেখার জন্যে।

তাকাল না কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'না না, পিটার, আমার দেখার দরকার নেই...আমি দেখতে চাই না...'

চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। কিন্তু বেশিক্ষণ বন্ধ রাখতে পারল না। ভেতরে কি আছে দেখার প্রচণ্ড কৌতূহল আবার চোখ মেলতে বাধ্য করল ওকে।

এবার আর তেলাপোকা নয়, তারচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস কিলবিল করছে খুলির ভেতর। মারাত্মক বিষাক্ত ছোট ছোট বাদামী সাপ গায়ে গায়ে পেঁচিয়ে থেকে ফুঁসছে, ফণা তুলছে, হাঁ করে দেখিয়ে দিচ্ছে বাঁকা বিষদাঁত, ছোবল মারার চেষ্টা করছে।

এক এক করে খুলি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল সাপগুলো। কানের ফুটো, নাকের ফুটো, গলার ছেঁড়া অংশ—যে যেদিক দিয়ে পারছে বেরোচ্ছে। ফোঁসফোঁসানি বেড়ে গেছে ওগুলোর। শীতল কালো ভয়ঙ্কর চোখ মেলে দেখছে কিশোরকে। ঝরে পড়তে শুরু করল ওর গায়ের ওপর।

চিৎকার দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। লেজ ধরে ছুঁড়ে ফেলল একটাকে।

ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে তখন সকাল হচ্ছে। কালচে-ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কেটে গিয়ে আরও ফর্সা হয়ে যাবে একটু পরেই।

বিছানায় উঠে বসল সে। বুকের মধ্যে যেন ঢাক পিটাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা।

তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল।

'আসলে আমিই চিৎকার করছি! স্বপ্নের মধ্যে!' মনে মনে নিজেকে বলল সে। ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি। বেখাপ্পা শোনাচ্ছে শব্দটা। ওর চিৎকার কি এমন?

চোখ মিটমিট করল সে। অপরিচিত ঘর। চিৎকারটা যে ওর নয় এটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

চিৎকার করছে আসলে চুং।

'চুং, কি হয়েছে! অ্যাই, চুং!'

কিন্তু চেঁচিয়েই চলল চুং। থামছে না।

বিছানা থেকে নামার জন্যে পা বাড়াল কিশোর। ওর আগেই ওপর থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল মুসা। ভোরের আবছা আলো চুইয়ে ঢুকছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। সেই আলোয় দেখা গেল বিছানায় বসে আছে চুং। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

এগোল কিশোর। ঘোর কাটেনি এখনও পুরোপুরি। পিটারের চেহারা ভাসছে চোখে। পা ফেলতে ভয় লাগছে। সাপের ছোবলের ভয়।

দুহাতে ঘাড়ের কাছটা চেপে ধরে আছে চুং।

'কি হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এত চিৎকার করছ কেন?'

কোলের দিকে তাকিয়ে আছে চুং।

'খারাপ স্বপ্ন দেখেছ নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

'আমার চুল!' ককিয়ে উঠল চুং।

'চুল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চুল, চুল, চুল!'

ভাল করে দেখার জন্যে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল কিশোর।

সে আর মুসা দুজনেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

চুং-এর বেণিটা নেই।

'আমার চুল! আমার বেণি!' দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল চুং।

'কোথায় গেল...' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর।

'কে-কে-কেটে ফেলেছে!' তোতলাতে আরম্ভ করল মুসা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে চুং-এর কোলের দিকে।

মুখ থেকে হাত সরাল না চুং। ফোঁপাতে শুরু করল।

'কে করল এ কাজ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এ ঘরে তো আমরা ছাড়া...'

ঝট করে মুখ তুলল চুং। একটানে কোলের ওপর থেকে কাটা বেণিটা তুলে বাড়িয়ে ধরল। চিৎকার করে বলল, 'না, তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই! তোমরাই কেউ করেছ...তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ!'

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল সে। আহত বাঘের মত ধকধক করে জ্বলছে চোখ। 'কে করেছ? কার কাজ?' মুসার মুখের ওপর ঠেসে ধরতে গেল বেণিটা, 'তুমি?' তারপর ধরতে গেল কিশোরের মুখে, 'নাকি তুমি?'

'না!' পিছিয়ে গেল কিশোর। 'আমি কেন তোমার বেণি কাটব?'

'আমিও কাটিনি!' বলে বিমূঢ়ের মত কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

'তাহলে কে? কে? কে?' উন্মাদের মত চিৎকার শুরু করে দিল চ্যাং। বেচারার অত সাধের চুল। আবার ফোঁপাতে শুরু করল। 'তোমরাই কেউ করেছ। এ ঘরে আর কেউ নেই। প্রথমে আমাকে গরম পানিতে সেদ্ধ করে মারতে চাইলে। এখন দিলে বেণি কেটে...'

'আমরা কাটিনি,' কিশোর বলল। 'অত খারাপ আমরা নই, চুং, বিশ্বাস করো।' সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখতে গেল সে।

ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল চুং। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। বেণিটা না থাকায় চেহারাটা কেমন বদলেও গেছে।

'এ রকম একটা বাজে কাজ কেন করতে যাব আমরা?' বোঝানোর চেষ্টা করল মুসা। 'তোমার সঙ্গে কি আমাদের শত্রুতা আছে?'

'আছে!' খেঁকিয়ে উঠল চুং। 'তোমরা আমাকে সহ্য করতে পারো না! আমাকে ঈর্ষা করো!' হাতের তালুতে রেখে কাটা বেণিটা দেখল সে।

মরা ইঁদুরের মত লাগছে, ভাবল কিশোর। না না, মরা সাপ। সাপের বাচ্চা।

'চুং...'

'বললাম তো, তোমরা দুজনেই আমাকে ঈর্ষা করো! তোমরা জানো রকি বীচ স্কুলে কুংফুতে আমিই সেরা। তোমরা আমার তুলনায় কিছু না।'

'দেখো, অত বাহাদুরি কোরো না!' রেগে গেল মুসা। 'দুচারটে কায়দা ভাল দেখাতে পারলেই ভাল হয়ে যায় না। এতই যদি ওস্তাদ, এসো দেখি হয়ে যাক...' পা ছড়িয়ে দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে কারাতে ফাইটারের ভঙ্গিতে।

মুসাকে চেনে কিশোর। যত বাহাদুরি করুক চুং, যতই লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে যাক, মারামারি করতে গেলে মুসার সঙ্গে পারবে না। খেলা আর ফাইট এক জিনিস নয়। মুহূর্তে নাকমুখ ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে দেবে মুসা। এক লাফে সামনে এসে দাঁড়াল দুজনের। চুংকে বলল, 'রকি বীচে তুমি নতুন এসেছ। আমাদের এখনও চিনে উঠতে পারোনি। বড় বড় কথা বোলো না। মুসার সঙ্গে ওস্তাদি করতে গেলে কপালে দুঃখ আছে তোমার...'

রাগে জ্বলে উঠল চুং-এর চোখ। 'সে তো বুঝতেই পারছি। আরও একটা কথা বুঝে গেছি, তোমরা আমার শত্রু। আমাকে দল থেকে বের করে দিতে চাও। সেজন্যে আমাকে ভয় দেখিয়ে...'

'না!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল কিশোর। ওর এই আচমকা রেগে যাওয়া অবাক করল মুসাকে। 'তোমার কথা মোটেও ঠিক না...'

'একটা কথা সাফ সাফ বলে দিচ্ছি, আমি যাচ্ছি না। কোন ভাবেই আমাকে বিদেয় করতে পারবে না। আমি থাকব, এবং

তোমাদের দেখিয়ে দেব!'

গটমট করে গিয়ে ড্রেসারের ওপর কাটা বেণিটা রাখল চুং। এত আস্তে, যেন ব্যথা পাবে ওটা। গজগজ করতে লাগল, 'চুল কামিয়ে আমাকে যদি ন্যাড়াও করে দেয়া হয়, দল ছাড়ছি না আমি, মনে রেখো...' রাগ দেখিয়ে হ্যাঁচকা টানে ড্রয়ার খুলল সে। টান দিয়ে দিয়ে কাপড় বের করতে লাগল। 'ভেবেছ এত সহজে ছেড়ে দেব? কাটা বেণিটা নিয়ে গিয়ে দেখাব মিস্টার হু-ইয়ানকে...'

'চুং, শোনো...' বলতে গেল কিশোর।

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল চুং। চিৎকার করে উঠল, 'তোমাদের কোন কথাই শুনতে চাই না আমি!'

মুসার রাগ পড়েনি। বলল, 'আরে দূর, কি ওকে সাধাসাধি করছ! যাক না, যা পারে করুক গিয়ে। আমাদের বাদ দিয়ে যদি শুধু ওকে নিয়ে হু-ইয়ান দল চালাতে পারে, খুব চালাক।'

কাপড় পরতে লাগল চুং।

মেজাজ এতই খারাপ হয়ে গেছে মুসার, কোন কথাই বলল না। জানালার কাছে গিয়ে একটানে সরিয়ে দিল পর্দাটা। গরম হয়ে আছে গাল। ঠাণ্ডা করার জন্যে চেপে ধরল জানালার শীতল কাঁচে।

ঘরে ঢুকল ভোরের কনকনে হাওয়া। শীত করছে কিশোরের। বিছানায় উঠে কম্বলটা টেনে দিল পায়ের ওপর। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে। আশঙ্কাটা বাড়ছে আরও।

ঘরে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজা ভেতর থেকে

লাগানো ছিল। তাহলে চুং-এর বেণি কাটল কে? নিজের বেণি নিশ্চয় নিজে কেটে ওদের ওপর দোষ চাপায়নি সে? তারমানে মুসাই কেটেছে। চুং-এর ওপর আক্রোশটা তার বড় বেশি। ঘুমের মধ্যে কেটে দিয়েছে বেণিটা।.

এটা কোনও স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তবে কি পিটারের রোগটা এতদিনে ধরতে আরম্ভ করেছে মুসাকে? কথায় কথায় রেগে যাওয়া, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি করা, এ সবই রোগের লক্ষণ। তারপর আসবে খুনের নেশা, রক্তপিপাসা...

দরজার শব্দে ভাবনা কেটে গেল কিশোরের। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে চুং। আপনাআপনি নজর চলে গেল ড্রেসারের ওপর। কাটা বেণিটা নেই। নিয়ে গেছে চুং, মিস্টার হু-ইয়ানকে দেখানোর জন্যে।

ফিরে তাকাল মুসা। 'আর শোব না। ঘুম আসবে না। তারচেয়ে কাপড় পরে ফেলি।'

'পরে কি করব?'

কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল মুসা। অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল, 'কিশোর, আমি কাটিনি ওর বেণি, সত্যি। কাটলে আমার মনে থাকত, তাই না?'

ওর কণ্ঠে ভয়। কিশোরের কাছ থেকে নিশ্চয়তা চাইছে যে ওর কিছু হয়নি। ম্যানিটো হলে মানুষ যে সব অঘটন ঘটায় সব ভুলে যায়, পরে আর মনে করতে পারে না।

কিন্তু জবাব দিল না কিশোর। ওর আশঙ্কা দূর করার জন্যে কিছু বলল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

'তুমি কি ভাবছ, বুঝতে পারছি আমি, কিশোর,' মুসা বলল। জবাবের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। 'প্লীজ, কিছু একটা বলো! বলো যে আমি ওকাজ করিনি!'

মুসার চোখ থেকে নজর সরিয়ে নিল কিশোর। মেঝের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না!'

যা বোঝার বুঝে নিল মুসা। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে কাপড় পরতে শুরু করল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'খানিকটা দৌড়ানোর পর নাস্তা করতে যাব। ক্যাফেতে দেখা হবে।'

'আচ্ছা,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।

মুসা বেরিয়ে গেলে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। হাত-পা টানটান করল। আড়মোড়া ভাঙল শরীরের। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে কিভাবে ঘটনা ব্যাখ্যা করছে চুং, মিস্টার হু-ইয়ানের চেহারা কেমন বদলে যাচ্ছে। সাংঘাতিক রেগে যাবেন তিনি, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

তারপর কি করবেন?

ওকে আর মুসাকে বের করে দেবেন দল থেকে?

আনমনে ভ্রূকুটি করল কিশোর। নেমে পড়ল বিছানা থেকে। ঘুম আর ওরও আসবে না। কাপড় বের করার জন্যে ড্রেসারের ড্রয়ার খুলল। খুলেই চক্ষু স্থির। বাড়ানো হাতটা থেমে গেল মাঝপথে।

ওর একটা পরিষ্কার শার্টের ওপর রাখা আছে একটা কাঁচি। এবং কাঁচিটা ওর।

কাঁপা হাতে তুলে নিল ওটা।

চোখের সামনে নিয়ে এল পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। কয়েক গাছি চুল লেগে আছে ওতে।

চুং-এর চুল। তারমানে এই কাঁচি দিয়েই বেণিটা কাটা হয়েছে।

সাত

এককোণে একটা টেবিলের একধারে বসে আছে কিশোর। সামনে কর্ন ফ্লেকের বাটি। চুপচাপ তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। চামচ তুলতেও ইচ্ছে করছে না। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ডাইনিং হল। হই-হট্টগোল, হাসাহাসি করে খাচ্ছে ছেলের দল।

ও যেটাতে বসেছে, সেটাকে ঘিরে বসেছে আরও তিনজন—মুসা, রবিন এবং টম। হাপুস-হুপুস করে খেয়ে যাচ্ছে ওরা। মুহূর্তে প্যানকেকের গাদা শেষ করে ফ্রেঞ্চ টোস্টগুলো সাবাড় করে ফেলল মুসা। তারপর টেনে নিল সিয়ারলের বাটি। চামচের পর চামচ মুখে পুরতে লাগল। টম আর রবিনও বেশ দ্রুতই খাচ্ছে। কথা বলছে অনর্গল। খানিক আগে শোবার ঘরে কি ঘটেছে, বেমালুম ভুলে গেছে যেন মুসা। দৌড়ে এসে মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গেছে।

দরজার দিকে মুখ করে বসেছে কিশোর। তাই চুং-এর সঙ্গে মিস্টার হু-ইয়ানকে প্রথম চোখে পড়ল তার। ইন্‌স্ট্রাকটরের গায়ে ধূসর গেঞ্জি। পরনে হাফপ্যান্ট। পায়ে কেডস। তারমানে দৌড়াতে বেরিয়েছিলেন। খুঁজে বের করে তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছে চুং।

ওদের টেবিলের দিকে চোখ পড়ল চুং-এর। হাত তুলে দেখাল মিস্টার হু-ইয়ানকে। চেয়ার আর টেবিলের মাঝের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করলেন তিনি। পেছনে চুং।

মনে মনে মহাসমস্যায় পড়ে গেল কিশোর। মিস্টার হু-ইয়ান এসে জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে? বলবে, ওর কাঁচিটা নিয়ে রাতে ঘুমের মধ্যে চুং-এর বেণিটা কেটে দিয়েছে? তাতে অনেক বড় শাস্তি হয়ে যাবে মুসার। ওকে চিরকালের জন্যে কারাতের ক্লাস থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন মিস্টার হু-ইয়ান।

নাকি বলবে, ইচ্ছে করে কাটেনি মুসা; অদ্ভুত এক রোগে ধরেছে ওকে—মনটানায় এক র‍্যাঞ্চে ম্যানিটোতে আক্রান্ত এক রোগীর নখের আঁচড় লেগে রোগটা সংক্রামিত হয়েছে ওর মধ্যেও? বিশ্বাস করবেন? যদি করেন, তাহলে আপাতত নাম কাটা পড়া থেকে বেঁচে যাবে মুসা, কিন্তু সে নিশ্চিত হয়ে যাবে রোগটায় ধরেছে ওকে। মুহূর্তে থেমে যাবে হাসি। খাওয়া। শুরু হবে ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা।

খেতে বসেই চুং-এর বেণি কাটার কথাটা রবিন আর টমকে জানিয়েছে কিশোর। ওদের দিকে তাকিয়ে এখন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল মিস্টার হু-ইয়ান আসছেন।

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দুহাত আড়াআড়ি বুকের ওপর রেখে মুসা আর কিশোরের দিকে তাকাতে লাগলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমাদের বিরুদ্ধে সিরিয়াস অভিযোগ করেছে চুং। শুনে তো আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এমন কাণ্ড করতে পারবে...স্রেফ ঈর্ষার বশে এত নিষ্ঠুরতা...'

চুপ করে আছে কিশোর আর মুসা। কোন কথা বলছে না।

'তোমাদের দুজনকেই আমি ভালমত চিনি,' আবার বললেন মিস্টার হু-ইয়ান। 'ভাল ছেলে বলে সুনাম আছে। অন্য কেউ করলে এতটা অবাক হতাম না, কিন্তু তোমরা...নাহ্, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না!'

কেউ কিছু বলছে না। টম আর রবিনও চুপ। তাকিয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে। ও কি বলে শুনতে চাইছে।

কি জবাব দেবে কিশোর? দম আটকে আসছে ওর। আশেপাশের টেবিল থেকে ওদের দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছে ছেলেরা।

'কারও চুল কেটে দেয়া সিরিয়াস অপরাধ,' কর্কশ হয়ে উঠল মিস্টার হু-ইয়ানের কণ্ঠ। চোখের পাতা সরু। 'খুব খারাপ কাজ!'

নিজের হাতের দিকে তাকাল কিশোর। মনে হলো বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে মুঠো করে ফেলল আঙুলগুলো। শক্ত হয়ে তালুতে চেপে বসল নখ।

'আমার জানা দরকার,' কঠিন কণ্ঠে বললেন মিস্টার হু-ইয়ান, 'কে করেছ এ কাজ! নইলে দুজনকেই শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না আমার জন্যে।'

বলার জন্যে মুখ তুলল কিশোর। ও কিছু বলার আগেই মুসা বলে উঠল, 'আমি কেটেছি, স্যার।'

'তুমি!'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল মুসা, 'হ্যাঁ।'

প্রায় হাঁ হয়ে গেলেন হু-ইয়ান। এত সহজে স্বীকার করে

ফেলবে মুসা, আশা করেননি।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

চোখের ইশারায় কিশোরকে চুপ থাকতে বলল মুসা। ও ভাবছে, কিশোর এ কাজ করেছে। সেজন্যে ওকে বাঁচাতে নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে নিচ্ছে। মিথ্যে বলতে গিয়ে আসলে সত্যি কথাটাই বলে ফেলেছে, জানে না এখনও। রোগাক্রান্ত অবস্থায় ঘোরের মধ্যে অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে।

'না, মিস্টার হু-ইয়ান,' কিশোর বলল, 'মুসা নয়, আমি বেণি কেটেছি।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল হু-ইয়ানের। শীতল দৃষ্টিতে মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে আঙুল নেড়ে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

দরজার বাইরে একটা হলওয়েতে নিয়ে এলেন ওদেরকে। জায়গাটা কোলাহলমুক্ত।

আচমকা থেমে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। চেহারায় রাগ। 'আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই। একে অন্যকে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে বলছ তোমরা। আসলে কে করেছ কাজটা?'

'আমি করেছি,' বলেই চট করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বলল।

'না,' চুপ থাকল না কিশোর, 'কথাটা ঠিক নয়!'

'তাহলে তুমি কেটেছ?' কিশোরের মুখোমুখি হলেন হু-ইয়ান। এতটা সামনে চলে এলেন, তাঁর মুখ থেকে বেরোনো কফির গন্ধও নাকে আসছে কিশোরের।

'না,' ভারি দম নিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। সত্যি কথাটা, মুসার রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথাটা বলে দেবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। নইলে ওরা যে ভাবে কথা বলছে তাতে আরও রেগে যাচ্ছেন হু-ইয়ান। তা ছাড়া, রোগের শিকার যে হয়েছে এটা মুসার কাছে গোপন না রেখে বরং জানিয়ে দেয়া উচিত। সতর্ক হতে পারবে। প্রয়োজনে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কিংবা ঘরে আটকে তালা দিয়ে রাখতে হবে যাতে রাতে বাইরে বেরিয়ে কোন অঘটন ঘটাতে না পারে। 'আসল কথাটা হলো...'

'হ্যাঁ, আসল কথাটা কি?' অধৈর্য হয়ে উঠেছেন হু-ইয়ান। 'জলদি বলো!'

'আমরা কেউই কাজটা করিনি,' জবাব দিল কিশোর। 'হয়েছে কি...'

'থামো!' ধমকে উঠলেন হু-ইয়ান। 'চুপ করো!' এক হাতের আঙুলের ফাঁকে আরেক হাতের আঙুল ঢুকিয়ে হাত দুটো তুলে আনলেন পেটের কাছে। শক্ত হয়ে গেছে আঙুলগুলো। 'তোমাদের ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব। তবে এখানে নয়, রকি বীচে ফিরে।'

'মিস্টার হু-ইয়ান...' বলতে গেল কিশোর।

বলতে দিলেন না ইন্‌স্ট্রাকটর। হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। 'রকি বীচে গিয়ে আমি ভালমত তদন্ত করব,' প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ধারণের দুজন বিচারককে আসতে দেখে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেললেন তিনি। 'তোমরা যে এ রকম একটা কাণ্ড করে বসবে...নিজের দলের খেলোয়াড়ের সঙ্গে...' মাথা নাড়তে লাগলেন, 'উফ্, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'মিস্টার হু-ইয়ান, আমি সত্যি দুঃখিত,' নরম হয়ে বলল মুসা।

'থাক, আর মাপ চেয়ে কাজ নেই,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল হু-ইয়ানের গলা, 'যা ঘটার ঘটেছে। আমি আশা করব, এখানে যতদিন থাকব আর কিছু ঘটবে না।...সত্যি আমি অবাক হয়ে গেছি। তোমাদের মাথায় যে কি ঢুকল বুঝলাম না...'

কি যে ঢুকেছে, সেটাই তো বলতে চাইছিলাম—ভাবছে কিশোর—কিন্তু আপনি তো শুনলেন না!

আর দাঁড়ালেন না হু-ইয়ান। ঘুরে দাঁড়ালেন। রাগত ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলে গেলেন করিডর ধরে।

মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'কি বলব...আমি...'

'আমার খুব খারাপ লাগছে! এত অপমান...'

'বুঝতে পারছি।'

'আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের সুযোগ দেবেন মিস্টার হু-ইয়ান। রকি বীচে গিয়ে বের করে দেবেন দল থেকে। তাঁর যা ভাব-নমুনা দেখলাম, কিছুতেই রাখবেন না আর। তাহলে লাভটা কি এখানে থেকে কষ্ট করে? জাহান্নামে যাক না দল। চুংকে দিয়েই কাজ চালানগে মিস্টার হু-ইয়ান।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। বলল, 'জায়গাটা আমারও যেন কেমন লাগছে...ঠিক বলে বোঝাতে পারব না, খুব বাজে একটা অনুভূতি...'

হঠাৎ যেন বিস্ফোরিত হলো হলওয়েটা। নাস্তা সেরে প্রায় একসঙ্গে দল বেঁধে বেরোতে আরম্ভ করল ছেলের দল। হই-

হট্টগোল, হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি করতে করতে। জিমনেশিয়ামে যাবে এখন প্র্যাকটিস করতে।

নাস্তা শেষ হয়নি মুসা আর কিশোরের। আবার রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। টম আর রবিন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে ওদের অপেক্ষায়।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি হলো? কি বললেন?'

মিস্টার হু-ইয়ান কি বলেছেন, জানাল কিশোর।

মুখ কালো করে ফেলল রবিন আর টম দুজনেই।

নাস্তা সেরে বেরিয়ে এল ওরা। উজ্জ্বল রোদ। নির্মেঘ আকাশ। সুন্দর সকাল। বাগানে ফুলের ওপর ভ্রমর উড়ছে। মন ভাল হয়ে গেল মুসা আর কিশোরের।

জিমনেশিয়ামে প্র্যাকটিস সেরে দুপুরের আগে ঘরে ফিরল ওরা। গোসল সেরে ক্যাফেতে গেল লাঞ্চ খেতে। সেখান থেকে আবার জিমনেশিয়ামে। সারাটা বিকেল প্র্যাকটিস করে কাটাল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অন্য স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে।

আট

সাতটার কয়েক মিনিট পর একসঙ্গে জিমনেশিয়ামে ঢুকল চারজনে। ঢুকেই উত্তেজনা টের পেল কিশোর। ব্যাপারটা স্বাভাবিক। আসার পর কেবল প্র্যাকটিস করেছে। এই প্রথম একটা প্রতিযোগিতা হতে যাচ্ছে। রিঙের চারপাশ ঘিরে আছে খেলোয়াড়রা। নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন বিচারকমণ্ডলী। যার যার দলকে শেষবারের মত জ্ঞান দান করছেন ইন্‌স্ট্রাকটররা।

আজ প্রথমে হবে দৈহিক কসরতের প্রতিযোগিতা। আলোচনা আর ভবিষ্যদ্বাণীর ঝড় বইছে। কেউ বলছে রকি বীচ জিতবে—রকি বীচের চুং, কারও ধারণা হোমারভিলের ও'কনর।

সকালবেলায়ই গিয়ে নাপিতের দোকান থেকে চুল ঠিক করে এসেছে চুং। বেণি কাটার পর উদ্ভট লাগছিল বাকি চুলগুলো, কেটে একেবারে খাটো করে এসেছে—আর্মি ছাঁট। আগের চেয়ে বরং ভাল লাগছে ওকে এখন দেখতে।

দৈহিক কসরতের প্রতিযোগিতাটা হবে মূলত চুং আর ও'কনরের মাঝেই, তবু বাকিরাও চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

শেষ মুহূর্তে প্র্যাকটিস করে শরীরটাকে গরম করে নিচ্ছে কেউ

কেউ। তাদের মধ্যে টমও রয়েছে। জোরে এক লাফ দিতে গিয়ে জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেল ওর। বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে নিচু হয়ে ফিতে বাঁধায় মন দিল।

'শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটা ভালয় ভালয় শেষ হলেই বাঁচি,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর।

'কেন?' অবাক হলো মুসা।

'কি জানি, বুঝতে পারছি না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ যেন বেশি প্রখর হয়ে গেছে আমার। বার বার বলছে, একটা অঘটন ঘটবে।'

উদ্বিগ্ন চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'তোমার কি শরীর খারাপ? এখানে আসার পর থেকেই দেখছি কেমন যেন হয়ে গেছ!'

হয়ে তো গেছ আসলে তুমি—মনে মনে বলল কিশোর। গোলমালটা তোমার দেহে, সেজন্যে আর সবাইকে অন্য রকম লাগছে।

বাঁশি বাজালেন রেফারি। নীরব হয়ে গেল জিমনেশিয়াম। সোনালি চুলের একজন তরুণ বিচারক মাইক্রোফোনে দুই দলের ক্যাপ্টেনকে রিঙের মাঝখানে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হোমারভিলের ক্যাপ্টেন ও'কনর নিজেই। সে গিয়ে দাঁড়াল রিঙের মাঝে। রকি বীচের ক্যাপ্টেনের নাম মার্কি। মুসার সমান লম্বা, সুদর্শন একটা ছেলে। হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়াল ও'কনরের পাশে।

কে আগে খেলবে, সেটা ঠিক করার জন্যে পয়সা টস করলেন রেফারি। হোমারভিল জিতল। শিস আর হাততালি পড়ল হোমারভিলের পক্ষ থেকে। ও'কনর দাঁড়িয়ে রইল রিঙের মাঝখানে। হাসিমুখে হাত নাড়ল নিজের দলের দিকে ফিরে। সরে

এল মার্কি।

'কি মনে হয় তোমার?' কিশোরের দিকে কাত হয়ে নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কে জিতবে?'

বিড়বিড় করে অদ্ভুত একটা জবাব দিল কিশোর, 'ও'কনরকে অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে! অপার্থিব!'

অবাক হয়ে গেল মুসা। ভুরু কোঁচকাল। কিছু বলল না।

ও'কনরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। রীতিমত ঈর্ষা হচ্ছে, যা জীবনে কখনও, কারও ব্যাপারে, কোন কারণে হয়নি ওর। ভাবছে, ও'কনরের যদি কোন একটা ক্ষতি হত, ভাল হত।

পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল, চুং-এর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে রবিন। এতেও ঈর্ষান্বিত হলো কিশোর। ওই ছেলেটার সঙ্গে ওর অত খাতির কিসের?

কি যা তা ভাবছে! নিজেকে ধমক দিল কিশোর। কিন্তু ঈর্ষা আর রাগ কোনটাই দমাতে পারল না।

মাইক্রোফোনে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলেন তরুণ বিচারক।

খেলা শুরুর বাঁশি বাজালেন রেফারি।

সবার নজর এখন রিঙের মাঝখানে। একটা স্পট লাইট স্থির হয়ে আছে ও'কনরের ওপর। দাঁত বের করে হাসল সে। উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত। পরক্ষণে লাফ দিল। মনে হলো আটকে রাখা স্প্রিঙ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চোখের পলকে শূন্যে উঠে পড়ল ও'কনর। শূন্যে থাকতেই শরীরটাকে ঘুরিয়ে এক

ডিগবাজি খেয়ে এসে নিঃশব্দে নামল পায়ের ওপর।

হাততালি দিল হোমারভিলরা।

তারপর লাফাতেই থাকল ও'কনর। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে। পয়েন্ট গুনছেন বিচারকমণ্ডলী। হাততালির ধুম পড়ে গেছে হোমারভিলদের মধ্যে।

পাঁচ মিনিট পর সরে গেল ও'কনর। এবার চুং-এর পালা।

মঞ্চের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল চুং। অনুভূতিটা কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে কিশোরের। তাকিয়ে আছে চুং-এর দিকে। নিজের দলের লোক। ও জিতুক, এটাই আশা করছে রকি বীচের সবাই। চিৎকার করে প্রেরণা জোগাচ্ছে অনেকে। কিশোর চুপ করে আছে। ভাবছে, ও জিতলে জিতুক না জিতলে নাই, আমার কি?

উদ্ভট ভাবনা। আবার নিজের মনকে ধমক লাগাল কিশোর।

চমৎকার খেলা দেখাল চুং। ও'কনরের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পাঁচ মিনিট পর সরে গেল।

আবার গিয়ে স্পটলাইটের নিচে দাঁড়াল ও'কনর। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই শরীরটাকে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। ডিগবাজি খেল। মাথা নিচু করে পড়ছে নিচের দিকে...পড়ছে...পড়ছে...একেবারে মেঝের কাছে পৌঁছে গেছে, তাও শরীর সোজা করার কোন লক্ষণ নেই...

অবাক হয়ে গেল দর্শকরা! কি করতে চায় ও?

মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল কি করতে চায়। আসলে কিছুই করার ছিল না ওর। অসহায় ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ল কাঠের মেঝেতে। কড়াৎ করে বিশ্রী একটা শব্দ হলো। দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে পড়ে

রইল ও। ওঠার চেষ্টা করছে না।

ভারী হয়ে উঠল জিমনেশিয়ামের নীরবতা। উজ্জ্বল স্পটলাইটটা স্থির হয়ে আছে ও'কনরের ওপর।

অবশেষে দুহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল ও'কনর। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতর থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে টকটকে লাল রক্ত।

কিশোরের কাছ থেকে অনেকটা দূরে বসে আছে সে। এখান থেকেও ওর ঠোঁটের কাটাটা দেখতে পেল কিশোর। সামনের ওপরের পাটির দুটো দাঁত ভাঙা। ঝকঝকে দাঁতগুলো রক্ত মেখে বীভৎস হয়ে গেছে।

একপাশে কাঁধের ওপর কাত হয়ে পড়ল ও'কনরের মাথাটা। সোজা রাখতে কষ্ট হচ্ছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে পোশাকের বুক।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পিনপতন নীরবতার পর হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠল সবাই। হুড়মুড় করে মঞ্চে ঢুকতে লাগল ওর দলের ছেলেরা। ইন্‌স্ট্রাকটর দৌড়ে গেলেন। রেফারি দৌড়ে এলেন। গুঞ্জনের মধ্যে চিৎকার করে উঠল একটা কণ্ঠ, 'জলদি ডাক্তারকে আসতে বলুন!'

তারপর একেকজন একেক কথা বলতে লাগল:

'ধরো ওকে!'

'দুটো দাঁতই তো শেষ!'

'আরে, রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না!'

'ঠোঁটটা গেছে, হায় হায়রে!'

'কি হয়েছিলে? এ ভাবে পড়ে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করল কে

যেন।

শোনা গেল ও'কনরের যন্ত্রণাকাতর গলা, 'ঘোরার চেষ্টা করেছিলাম! কে যেন আটকে দিল শরীরটা! কোনমতেই ঘুরিয়ে সোজা করতে পারলাম না!'

কান খাড়া করল কিশোর। ভুল শুনল না তো? কে আটকে দিল ও'কনরকে?

না, ভুল নয়। আবারও বলল ও'কনর, 'মনে হলো চেপে ধরে রাখল আমাকে অদৃশ্য কেউ...' ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে।

'থাক থাক, আর কথা বোলো না!' বলল আরেকজন।

ধরাধরি করে ও'কনরকে জিমনেশিয়ামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। স্পটলাইটের নিচে এখন প্রচুর রক্ত পড়ে আছে। এ রকম একটা ঘটনার পর আর খেলা জমবে না। সেদিনকার মত প্রতিযোগিতা বন্ধ ঘোষণা করলেন বিচারকমণ্ডলীর প্রধান।

রক্তের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। আস্তে করে মুখ ঘুরিয়ে মুসার দিকে তাকাল। কাউকে নাগালে পেলে ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে পারে ম্যানিটো। কিন্তু দূর থেকে ইচ্ছাশক্তির জোরেও কি কারও ক্ষতি করতে পারে? স্পষ্ট কানে বাজছে ও'কনরের বক্তব্য—মনে হলো চেপে ধরে রাখল অদৃশ্য একটা হাত!

মুসাও ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

নয়

পরদিন সন্ধ্যায় আবার প্রতিযোগিতায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে মুসা।

ড্রেসারের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে কিশোর।

চুং রয়েছে বাথরুমে। শাওয়ারের পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে।

মাথা নাড়তে নাড়তে মুসা বলল, 'আজকেও দেরি হয়ে যাবে আমাদের। এবার কি যে হলো, যেন কুফা লেগেছে। কোন কিছুই ঠিকমত ঘটছে না।'

'দেরি আর কই,' কিশোর বলল, 'আমার হয়ে গেছে। শার্টটা কেবল গায়ে দেব।'

'ডিনারে আজ কি খাওয়াবে জানো কিছু? কাল যা দিয়েছে না, উফ, জঘন্য! আজ চিলি দিলে নির্ঘাত মারা পড়ব। খাওয়ার পর মনে হয়েছে এক টন ভারী হয়ে গেছে শরীরটা।'

'তোমারই যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, আমাদের কি হয়েছিল বোঝো,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।

'আমি যাচ্ছি, তোমরা এসো,' বলে বেরিয়ে গেল মুসা। যাওয়ার আগে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

খুলে গেল বাথরুমের দরজা। গায়ে লাল একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল চুং। অতিরিক্ত গরম পানি দিয়ে গোসল করায় চামড়া থেকে বাষ্প উঠছে এখনও। খাটো চুল থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে।

'আজ রাতে জিতবই আমরা,' হেসে বলল সে। 'ও'কনর গেছে। আমার সঙ্গে পারার মত হোমারভিলে আর কেউ নেই।' বিছানায় বসে তোয়ালের একপ্রান্ত দিয়ে চুল মুছতে শুরু করল।

মাথার মধ্যে কি জানি কি ঘটে গেল কিশোরের। বিড়বিড় করে বলল, 'ও'কনর গেছে! আজ রাতে আর খেলতে আসবে না!'

'কেন, শোনোনি তুমি?' তোয়ালের নিচে মুখ এখনও চুং-এর, 'ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। দশটা সেলাই পড়েছে ঠোঁটে। মাঢ়ীতেও বেশ বড় রকমের অপারেশন লাগবে।'

'খুব খারাপ!' আবার বিড়বিড় করল কিশোর।

তোয়ালে ফেলে দিয়ে মোজা বের করল চুং। পরার জন্যে নিচু হলো। কিশোরের দিকে পিঠ। ওই ভঙ্গিতে থেকেই বলল, 'ও'কনর নেই, আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতও আর কেউ নেই হোমারভিলে। আমরাই জিতব।'

টান দিয়ে ড্রেসারের ওপরের ড্রয়ারটা খুলে নিল কিশোর। পোশাকের ভেতর হাতড়াতে শুরু করল। হাতে ঠেকল কাঁচিটা। হাতল দুটোকে চেপে ধরে বের করে আনল ড্রয়ার থেকে।

পিঠ বাঁকা করে নিচু হয়ে থেকে উত্তেজিত স্বরে বকবক করেই চলেছে চুং।

কাঁচিটাকে ছুরির মত করে তুলে ধরে এক পা এগোল কিশোর।

যা শুরু করেছিলাম, শেষ করার এটাই সুযোগ—ভাবল সে।

নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দাঁড়াল চুং-এর ঠিক পেছনে। একটুও সন্দেহ করেনি এখনও চুং।

আর কোন ঝামেলা রাখব না। ঈর্ষার কারণ রাখব না। আজই খতম করে দেব সব—আবার ভাবল কিশোর। গুড বাই, চুং।

একটা মোজা পরা শেষ করে মেঝে থেকে আরেকটা তুলে নিল চুং।

ওর ঘাড়টা কাঁধের সঙ্গে যেখানে যুক্ত হয়েছে, সেই নরম এবং দুর্বল জায়গাটা সই করে কাঁচি তুলল কিশোর। ঘ্যাচ করে বসিয়ে দেয়ার জন্যে নামিয়ে আনতে শুরু করল। মনে মনে বলছে, তুমি শেষ, চুং। তুমি শেষ।

ঠিক এই সময় দরজায় শব্দ হলো। খুলতে আরম্ভ করল পাল্লাটা।

চোখের পলকে কাঁচিটা কার্পেটে ফেলে এক লাথিতে খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিল কিশোর।

ঘরে ঢুকল মুসা। 'আজও ব্যাজ নিতে ভুলে গেছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। দৌড়ে এসেছে।

মুখ তুলে কিশোরকে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো চুং।

ঘাড়, কান গরম হয়ে গেছে কিশোরের। দ্রুত পিছিয়ে গেল। মোচড় দিয়ে উঠল পেট। বমি আসছে। দম আটকে ঠেকানোর চেষ্টা করল।

মাথা ঘুরছে বনবন করে। অসংখ্য লাল আলোর তারা ফুটছে

চোখের সামনে। কিছুক্ষণ ঝিলিক ঝিলিক করল ওগুলো। কালো হয়ে গেল লাল রঙ। আবার লাল। আবার কালো।

বমি বমি ভাবটা যায়নি। মুসার দিকে ফিরল সে। ড্রেসার হাতড়াচ্ছে মুসা।

হাত তুলে নিজেদের বিছানাটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'বাক্সটা বিছানার নিচে রেখেছ নাকি দেখো না। মনে পড়ছে ওখানেই কোথাও রেখেছিলে।'

বিছানার নিচে উঁকি দিল মুসা। বাক্সটা দেখতে পেল। বের করে এনে কিশোরের দিকে তাকাল, 'থ্যাংকস। তোমাদের এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'এই তো হয়ে গেছে আমার,' জবাব দিল চুং। 'শার্টটা গায়ে দিলেই শেষ।'

'আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে,' দুর্বলকণ্ঠে কিশোর বলল। 'যাব কিনা বুঝতে পারছি না।'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল মুসা।

'পেটের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। বমি আসছে। মাথা ঘুরছে।' ধপ করে বিছানার কিনারে বসে পড়ল কিশোর।

আবার চোখের সামনে ফুটে উঠল লাল তারাগুলো। কালো হয়ে গেল। আবার লাল। কানের ভেতর যেন ঝড় বইছে। ঘাড়ের চামড়ার নিচে জলপ্রপাতের স্রোত। গরম, আগুন হয়ে যাচ্ছে।

'ভাল না লাগলে যাওয়ার দরকার নেই,' মুসা বলল। 'শুয়ে থাকো। আমি মিস্টার হু-ইয়ানকে বুঝিয়ে বলব।'

বেরিয়ে গেল চুং আর মুসা।

শুয়ে পড়ল কিশোর। বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। আবার বমি ঠেলে উঠতে শুরু করল। এবার এতটাই জোরাল, কোনভাবেই নামাতে পারল না। বাথরুমে ছুটল। দুহাতে সিংকের দুই ধার চেপে ধরে মুখ নিচু করল। হাত সাংঘাতিক গরম। বরফের মত শীতল লাগল পোরসেলিনের সিংকটা।

ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল শরীর।

চোখের সামনে কালো তারা। লাল। তারপর কালো।

চোখ বন্ধ করল সে। কিন্তু তাতেও গেল না তারাগুলো। একই ভাবে ঝিলিক দিয়ে চলল।

কানের মধ্যে ঝড়ের গর্জন বাড়ছে।

হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল কে যেন। শয়তানিতে ভরা কুৎসিত হাসি। হাসিটা দূরে নয়...কাছে...অতি কাছে...একেবারে মগজের গভীরে...

আর সহ্য করতে পারল না। গলগল করে বমি করে ফেলল সিংকে। ভীষণ কষ্ট। ওয়াক ওয়াক করতে করতে পেট একেবারে খালি করে ফেলল।

আরও শক্ত করে সিংকের দুই ধার চেপে ধরে মুখ নামিয়ে হাঁপাতে লাগল।

ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল লাল-কালো তারকাগুলো। থেমে গেল কানের মধ্যে ঝড়ের গর্জন। শান্ত হয়ে এল মগজের ভেতরের উথাল-পাথাল অবস্থাটা।

প্রচণ্ড ক্লান্তি। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। টলতে টলতে ফিরে এল শোবার ঘরে। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

চোখ মুদে চুপচাপ কয়েক মিনিট পড়ে থাকার পর স্বাভাবিক হয়ে এল আবার চিন্তাশক্তি।

আরেকটু হলেই আজ দিয়েছিল চুংকে শেষ করে। সময়মত মুসা এসে না ঢুকলে কি যে হত, ভেবে শিউরে উঠল সে। পলকে মগজে খেলে গেল কতগুলো অস্বস্তিকর ভয়াবহ ভাবনা। বুঝে ফেলল, ঘোরের মধ্যে যত অঘটন সে-ই ঘটিয়েছে। বাথরুমে চুংকে গরম পানিতে সেদ্ধ করে মারার জন্যে কলের চাবি অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়ে রেখেছিল সে নিজে। বেণিও কেটেছিল সে। ওই দুটো ঘটনার কথা মনে করতে পারছে না। ঘোরের মধ্যে ঘটিয়েছে। কিন্তু আজকের ঘটনাটা ঘোরের মধ্যে নয়, পুরো সচেতন অবস্থায় ঘটাতে যাচ্ছিল। তারমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

ব্যাপারটা কি? মারাত্মক কোনও রোগে ধরল নাকি ওকে? মগজের রোগ? পাগল হলে অনেক সময় খুন করার ইচ্ছে জাগে মানুষের। এটা একধরনের রোগ। সে-ও কি ওরকম কোন রোগের শিকার?

তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ভয়ানক পরিস্থিতি এখন তার। ঘোরের মধ্যে অঘটন ঘটানো এক কথা, কিন্তু সচেতন অবস্থায়?

আর ভাবতে পারল না সে...

দশ

রকি বীচে ফিরে এসেছে কিশোর। রকহিল কলেজ ক্যাম্পাসের শেষ কটা দিন এখন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কিছু স্মৃতি মাত্র। কিভাবে কেটেছে দিনগুলো ভালমত মনেও করতে পারে না।

আজ শুক্রবার। নিজের ঘরে রয়েছে সে।

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে শোনা গেল মেরিচাচীর ডাক, 'কিশোর, কি করছিস?'

'শুয়ে আছি,' বালিশ থেকে মাথাটা সামান্য উঁচু করে জবাব দিল সে। দুপুরের খাওয়ার পর সেই যে এসে শুয়েছে, আর ওঠেওনি, বেরোয়ওনি। ভাবনার পর ভাবনা কেবল সাগরের ঢেউয়ের মত খেলে যাচ্ছে তার মনে। সবই উদ্ভট। যেন তার নিজের মনের নয়, কম্পিউটারে শেয়ারিং সেটআপের মত করে অন্য কোন মগজ থেকে ভাবনাগুলো পাচার করে দেয়া হচ্ছে তার মগজে।

'শরীর খারাপ নাকি?' জানতে চাইলেন মেরিচাচী। 'বিকেলবেলা এ ভাবে তো শুয়ে থাকিস না কখনও।'

'খুব ক্লান্ত লাগছে, চাচী,' অধৈর্য শোনাল কিশোরের কণ্ঠ,

'ক্যাম্পে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে তো...'

চাচীর পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতে শুনল সে। আবার মাথা রাখল বালিশে। কান চেপে ধরল। কানের মধ্যে আবার শুরু হয়েছে ঝড়ের গর্জন।

রকহিল ক্যাম্প। একটা জঘন্য সপ্তাহ।

অসুখটা আবিষ্কারের পর পরই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল, সে অসুস্থ। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। বাকি যে কটা দিন থেকেছে ওখানে, অঘটন ঘটানোর ভয়ে ঘর থেকেই আর বেরোয়নি। পারতপক্ষে কথা বলেনি টম, রবিন, কিংবা মুসার সঙ্গে। চুং-এর সঙ্গে তো নয়ই।

চিন্তিত হয়েছেন মিস্টার হু-ইয়ান। একজন ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন কিশোরকে দেখানোর জন্যে।

কোন রোগ খুঁজে পায়নি ডাক্তার।

রোগ পায়নি! হাহ্ হাহ্! হাসি পেল কিশোরের। তেতো হয়ে গেল মন। চুংকে খুনের চেষ্টার পর ডরমিটরিতে থাকতেই আরও কয়েকবার দেখা দিয়েছে রোগটা। কানের মধ্যে ঝড়ের গর্জন। চোখের সামনে লাল-কালো তারার ঝিলিক। তার পরের কিছুটা সময় অন্ধকার। বিস্মরণ ঘটেছে মনের। পরে ঘড়ি দেখে বুঝেছে অনেকটা সময় অন্ধকারে ছিল তার মন। ওই সময় কি করেছে, কোন কথা মনে করতে পারেনি। এখনও পারছে না।

ভয় পাচ্ছে সে। ভীষণ ভয়। নিজের জন্যে তো বটেই, আরও অনেকের জন্যে। বিশেষ করে বাড়িতে যারা আছে, কিংবা যারা ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নিয়মিত দেখা হয়, তাদের জন্যে। অসুখের ঘোরে

কাকে কখন খুন করে বসে ঠিক আছে কিছু!

কানের ভেতর বাড়ছে ঝড়ের গর্জন। আবার আসছে রোগের আক্রমণ। বুঝতে পারছে। আপনাআপনি আঙুলগুলো বিছানার চাদর খামচে ধরল। মনে হলো দুলতে আরম্ভ করেছে খাটটা। মাথার কিনারের তক্তাগুলো যেন খটাখট বাড়ি খেতে শুরু করল দেয়ালের সঙ্গে। চাদরটায় ঢেউ উঠতে লাগল। মেঝের কার্পেটও দুলতে লাগল ঢেউয়ের মত।

'থামো! বন্ধ করো ওসব!' চিৎকার করে উঠল সে।

থামল না কোন কিছুই।

আতঙ্কিত হয়ে বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ল সে। কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা পেল। কিছুতেই থামছে না কার্পেটের ঢেউ। প্রান্তগুলো মেঝেতে বাড়ি মারছে ছপাৎ ছপাৎ করে।

জানালার পর্দাগুলো যেন প্রবল ঝড়ে উড়তে শুরু করল। নিচের অংশ ধেয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। লম্বা হয়ে গিয়ে ওকে ছোঁয়ার চেষ্টা চালাল। ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে জানালাগুলো। বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে শার্সি।

'প্লীজ! দোহাই লাগে! বন্ধ করো!' আবার চিৎকার করে উঠল সে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা চিরুনি আর ক্রীমের কৌটাগুলো উড়তে শুরু করল বাতাসে। ফানুসের মত নিঃশব্দে উড়ে বেড়াতে লাগল ঘরময়। ছাতে বাড়ি লেগে বলের মত ড্রপ খেয়ে নেমে আসতে লাগল ওর দিকে।

জানালার পাল্লা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে জোরে জোরে। কিন্তু

কোন শব্দ নেই। কানের ভেতরের ঝড়ের গর্জন অন্য সমস্ত শব্দ যেন ঢেকে দিয়েছে। কার্পেটটাও যেন খেলা জুড়েছে ওকে নিয়ে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। খামচে ধরল ড্রেসারের কিনার। দপ করে জ্বলে উঠল যেন আয়নাটা। গলে গেল পরক্ষণে।

কোনদিকে তাকাল না আর সে। সোজা রওনা হলো দরজার দিকে। মনে হলো, বহুশত যোজন দূরে রয়েছে ওটা। কিছুতেই পৌঁছতে পারছে না ওটার কাছে। বার বার যেন হ্যাঁচকা টানে ওকে সরিয়ে নিয়ে আসছে দোলায়মান কার্পেট।

দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখের সামনে আবার সেই লাল-কালো তারকার ঝিলিক।

কোনমতে পৌঁছল গিয়ে দরজার কাছে। ছিটকানি খুলল। চিৎকার করে উঠল। কি যে বলল, নিজেই বুঝতে পারল না। দুঃস্বপ্নের ঘোরে চিৎকার করে কথা বলতে গেলে যেমন কিছু বোঝা যায় না, শব্দগুলো দুর্বোধ্য লাগল ওরকমই।

টেনে খোলার চেষ্টা করল দরজাটা। পারল না। হ্যাঁচকা টানে ওকে মেঝেতে ফেলে দিল যেন দুলন্ত কার্পেট।

একটা ছায়া দেখতে পেল। কেউ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

ভাল করে তাকাল।

'ডন!'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। নীল চোখে বিস্ময়। 'কিশোরভাই, কি হয়েছে তোমার? মাটিতে পড়ে আছ কেন?'

দুই হাতে কার্পেটের ধার খামচে ধরে জানোয়ারের মত চার হাতপায়ে ভর দিয়ে উঠতে গেল কিশোর।

'কি হলো তোমার? কুকুর কি করে হাঁটে সেটা বোঝার চেষ্টা করছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ডন।

'দুঃস্বপ্ন...' কোনমতে বলল কিশোর।

চোখের সামনে লাল তারকার ঝিলিক। কালো। আবার লাল।

কানের মধ্যে ঝড় আর জলপ্রপাতের মিলিত গর্জন।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল।

থেমে গেছে কার্পেটের ঢেউ। আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে সব কিছু।

ওর হাত ধরে টানল ডন। 'ওঠো।'

'কেন?'

'মনে হচ্ছে তোমার অসুখ করেছে। নিচে চলো। ডাক্তারকে ফোন করব।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। বোঁ করে উঠল মাথা। মনে হচ্ছে যেন কয়েক মন ওজন হয়ে গেছে। তুলে রাখতে পারছে না। কানের মধ্যে ঝড়ের গর্জন চিন্তাশক্তি গুলিয়ে দিচ্ছে।

লাল তারকা। কালো। আবার লাল।

পৃথিবীটা যেন শুধু দুই রঙা। কালো এবং লাল। আর কোন রঙ নেই।

'এসো!' হাত ধরে টানল আবার ডন।

হঠাৎ মাথার মধ্যে কি যেন কি ঘটে গেল। বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত ভয়ঙ্কর কুবুদ্ধি চাগিয়ে উঠল। হাত চেপে ধরে ডনকে টেনে নিয়ে

আসতে লাগল ঘরের ভেতর। এমনিতেও শক্তিতে ওর সঙ্গে পারার কথা নয় ডনের। তার ওপর এ মুহূর্তে যেন অসুর ভর করেছে।

ঘাবড়ে গেল ডন। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল। না পেরে চিৎকার করে উঠল, 'এই ছাড়ো! কি করছ! ব্যথা লাগছে তো!'

ঝড়ের গর্জনে কান ঝালাপালা। মনে হলো ঘরের সব কিছু কাঁপছে।

লাল তারকা। কালো। আবার লাল।

ডনকে ঘরে এনে কার্পেটের ওপর উপুড় করে ফেলে চেপে ধরল কিশোর।

মগজের গভীরে কুৎসিত অট্টহাসি শুরু হয়েছে। অবচেতন ভাবে টের পেল হাসিটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তার।

ডনের হাতটা মুচড়ে পেছনে নিয়ে এল সে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ডন।

বাহ্, খুব মজা তো! দ্বিতীয় হাতটাও চেপে ধরল। একই ভাবে মুচড়ে ওটাও নিয়ে এল পিঠের ওপর।

খুব সহজেই ভেঙে দিতে পারে হাত দুটো।

খুব মজা! খুব মজা! কানের মধ্যে গর্জন করছে ঝড়, মগজে অট্টহাসি।

কে যেন পরামর্শ দিচ্ছে ওকে—দাও ভেঙে! খুব সহজ!

চাপ বাড়াতে আরম্ভ করল কিশোর।

'আহ্, ছাড়ো না!' ককিয়ে উঠল ডন, 'ব্যথা লাগছে তো!' কিশোরের হাত থেকে হাত ছাড়ানোর শক্তি তার নেই।

একটা হাতকে ঠেলে আরও ওপরে তুলে দিচ্ছে কিশোর। হাড়

ভাঙার শব্দ শোনার অপেক্ষা করছে।

'উফ্! ছাড়ো!' চিৎকার করে বলল ডন।

হাতটাকে আরও খানিকটা ওপরে ঠেলে দিল কিশোর।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ডন।

শেষ মুহূর্তে হঠাৎ ওকে ছেড়ে দিল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'বেরোও! যাও এখান থেকে! জলদি!'

দরজার দিকে দৌড় দিল ডন। ওর নীল চোখ বিস্ফারিত। চেহারায় বিমূঢ় ভাব। বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল। 'কি হয়েছে তোমার, কিশোরভাই?'

'গেট আউট!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

দরজার বাইরে গিয়ে আবার দাঁড়াল ডন। 'আমার হাত ভাঙার চেষ্টা করলে…ধমক দিচ্ছ…হয়েছে কি তোমার? পাগল হয়ে গেছ?'

'বেরিয়ে যাও,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। স্বর অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। শরীর কাঁপছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল ডন।

ওর হাত ভাঙার চিন্তা মাথায় এল কেন?—আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। হঠাৎ করে মগজে শয়তান ঢোকে! আছে এখনও, যায়নি। ওই তো, হাসি শুনতে পাচ্ছে ওটার। শীতল, শুকনো, খসখসে হাসি। কাশির শব্দের মত।

স্পষ্ট কানে আসছে। অবচেতন ভাবে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কে হাসে দেখার জন্যে। কিন্তু ভালমতই জানে, দেখতে পাবে না, কারণ ওটা রয়েছে তার মগজের গভীরে।

বাড়ছে শব্দটা। নিষ্ঠুর হাসি যেন খুঁচিয়ে চলল তার মগজকে।

দুহাতে কান ঢাকল সে। চেপে ধরল জোরে। কানে ঢুকতে দিতে চায় না ভয়াবহ শব্দ। কিন্তু নিস্তার পেল না। হয়েই চলেছে শব্দ। ক্রমেই বাড়ছে।

'ছাড়ো আমাকে, ছেড়ে দাও!' অসহায় ভঙ্গিতে মগজের ওই অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে। নিজের কণ্ঠস্বরও অপরিচিত লাগল।

দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। কানের ওপর বালিশ চাপা দিল।

কিন্তু শীতল, কালো হাসিটাকে ঠেকাতে পারল না কোনমতেই।

এগারো

আবার দুঃস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে কিশোর। দেখল, ছোট একটা জাহাজে রয়েছে সে। হালকা ঢেউয়ে আলতো দুলছে ইয়ট। ঢেউয়ের তালে পায়ের নিচে ডেকের ওঠানামাও অনুভব করছে।

উজ্জ্বল, উষ্ণ, রোদ ঝলমলে একটা দিন। ঘন নীল রঙের নির্মেঘ আকাশ। পানিতে রোদ চকচক করছে। ইয়টের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ বাড়ি মারছে সোনালি রঙের ঢেউ।

দুলন্ত জাহাজের ডেকে পালিশ করা ধাতব রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে র‍্যাঞ্চারের পোশাক। আঠারোশো শতকের ওয়েস্টার্ন কাউবয়দের প্যান্ট, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে কাঁটা বসানো বুট।

স্বপ্নে যেন কাউবয় হয়ে গেছে সে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো—ওটা যে স্বপ্ন বেশ বুঝতে পারছে, অথচ মনে হচ্ছে সত্যি। বাস্তবে ঘটছে। আরও অদ্ভুত—কাউবয় হয়েছে, ঘোড়ায় চেপে থাকার কথা ছিল ওর, কিন্তু রয়েছে জাহাজে।

ডক্টর মুন সারেঙ। হুইল ধরে আছে। একধারে রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে পানির দিকে তাকিয়ে আছেন পিটারের বাবা ডেভিড

হুইটম্যান। আরেকধারে দাঁড়ানো পিটার।

শান্ত পানিতে তরতর করে ভেসে চলেছে ছোট্ট জাহাজটা।

গালে রোদ লাগছে। বেশ চড়া। তবে পানি ছুঁয়ে আসা বাতাসের জন্যে গরমটা তেমন অনুভূত হচ্ছে না।

হঠাৎ হল ব্ল্যাকভালচার আর তার বোন টিরানাকে দেখা গেল জাহাজের ডেকে। এতক্ষণ কোথায় ছিল ওরা, কোথা থেকে উদয় হলো, কিচ্ছু বোঝা গেল না। আরও মজার ব্যাপার, অনেক ছোট হয়ে গেছে ওরা, ছোট ছোট দুটো ছেলেমেয়ে।

'টিরানা, দেখো আমি কি করি,' বলে রেলিঙে পেট রেখে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল ছোট্ট দুরন্ত হল। সার্কাসের বাজিকরের মত খেলা দেখিয়ে মুগ্ধ করে দিতে চাইল বোনকে।

'নামো ওখান থেকে,' মৃদু ধমক দিল কিশোর। ধমক দেয়ার অধিকার রাখে যেন সে, কারণ সে এখন ওদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। 'পানিতে উল্টে পড়লে বুঝবে মজা।'

বাধ্য ছেলের মত নেমে গেল হল। কিন্তু দুষ্টুমি বন্ধ করল না। তাড়া করে গেল টিরানাকে। ডেকময় ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগল দুজনে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর।

আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে ডানে ঘুরে গেল ইয়ট। কাত হয়ে গেল অনেকখানি। সময়মত রেলিং আঁকড়ে না ধরলে পানিতেই পড়ে যেত সে।

আশ্চর্য! এ ভাবে কাত হয়ে গেল কেন ইয়টটা?

নিজেকেই নিজে জবাব দিল—স্বপ্নের মধ্যে অকারণেই অনেক

কিছু ঘটে। আরেকটা মন বলল, আসলে তো তুমি বাস্তবে রয়েছ, স্বপ্ন নয় এটা, সত্যি।

আবার ঝাঁকুনি খেল জাহাজ। কাত হয়ে গেল বাঁ পাশে। প্রাণপণে রেলিং আঁকড়ে ধরে আছে সে।

বনবন করে ঘুরতে আরম্ভ করল জাহাজ। যেন ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়েছে।

কি ঘটছে? রোদ গেল কোথায়? এ ভাবে ঘুরছে কেন জাহাজটা?

অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সূর্য। চতুর্দিকে কালো অন্ধকার। ঢেউ বেড়ে গেছে অনেক। জোরে জোরে বাড়ি মারছে জাহাজের গায়ে।

ভয় পেল কিশোর। মনে হলো যেন গরম কোনও তরল পদার্থের মত ভয়টা গড়িয়ে নামছে ওর সর্বশরীর বেয়ে। বরফের মত জমে গিয়ে জাহাজের একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে সে।

'কিশোর! বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছে হল আর টিরানা। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে ফিরে তাকালেন ডেভিড হুইটম্যান। হাতে বিশাল এক শটগান দেখা গেল এখন। হলকে লক্ষ্য করে তুললেন সেটা।

একহাতে ধরে আর সামলাতে পারছে না কিশোর, দুহাতে আঁকড়ে ধরল রেলিং। দেখল ওটা আর রেলিং নেই এখন। মোটা এক সাপে পরিণত হয়েছে।

মাথা তুলল সাপটা। হাঁ করে বিষদাঁত দেখাল। ফোঁস ফোঁস

করতে লাগল ভীষণ রাগে।

জাহাজটা এ রকম বেসামাল আচরণ করার কারণ বোঝা গেল। হুইল ছেড়ে দিয়েছে ডক্টর মুন। বড় একটা সিরিঞ্জ হাতে এসে দাঁড়াল কিশোরের সামনে। তাতে লাল রঙের ওষুধ। ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়ে হেসে বলল, 'ইনজেকশনটা দিয়েই দিই। তোমার মত বুদ্ধিমান মানুষদের ওপর কি রিঅ্যাকশন করে দেখা দরকার...'

সেই পুরানো কথা। ব্ল্যাক মাউনটেইনের ল্যাবরেটরিতে আটকে ফেলার পর যা বলেছিল।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। হাত চেপে ধরেছে পিটার। আবার মায়ানেকড়েতে পরিণত হয়েছে। টকটকে লাল চোখে আগুন। খসখসে গলায় বলল, 'তোমরা আমাকে গুলি করে মেরেছ। আমি তোমাদের ছাড়ব না। প্রতিশোধ নেব...মায়ানেকড়ে বানিয়ে দেব...'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'না না, আমাকে ছেড়ে দিন! আমাকে...'

জেগে গেল কিশোর।

ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেছে শরীর। বিছানায় উঠে বসে হাঁ করে দম নিতে লাগল। চোখ মিটমিট করল। দুহাতে রগড়াল। চোখের সামনে থেকে যেন দূর করতে চাইল ভয়ঙ্কর বিভীষিকা।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল নিজের ঘরেই রয়েছে। কোন রকম অস্বাভাবিকতা নেই।

অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতি জোরাল হয়ে গেঁথে আছে

মানসপটে। স্বপ্নটাকে এত বাস্তব মনে হয়েছে সে-জন্যে।

ঘড়ি দেখল। সাতটা তিরিশ। বাইরে আকাশের রং কয়লা-কালো।

বাপরে! কত সময় ঘুমিয়েছি!—ভাবল সে।

ভয়ানক দুঃস্বপ্নের ভয় কাটতে চাইছে না ওর। ঘূর্ণিপাকে পরা জাহাজের সঙ্গে যেন এখনও পাক খাচ্ছে শরীরটা। মাথা ঘুরছে।

বিছানার পাশে বসে পা নামাল মেঝেতে।

বড় করে হাই তুলল।

হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন আবার কানে এল ফোঁসফোঁসানি। সাপটার মত। ঢেকুরের সঙ্গে হেঁচকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল পেটে জমে থাকা বাতাস। ভয়াবহ দুর্গন্ধ। নিজের গন্ধ নিজের কাছেই অসহ্য লাগল।

মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করল। পারল না। আটকে গেছে চোয়াল।

অসহায় ভঙ্গিতে হাঁ করে বসে রইল সে। শরীরটা একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ওর। কিছুই করতে পারছে না। কোন অঙ্গই কথা শুনতে চাইছে না।

বমি বমি লাগছে। আবার গ্যাস জমা হয়েছে পেটে।

সব গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার পর মুখ বন্ধ করল। বমিটা ঠেকাল আপাতত।

মাথার মধ্যে কে যেন ডেকে বলছে, 'এ ভাবে চুপ করে বসে আছ কেন? অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের। ওঠো।' অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। মনে হলো পায়ের চাপে শুকনো পাতা খড়মড় করে ভাঙার মত।

'কাজ? কি কাজ?' মগজের কণ্ঠটাকে প্রশ্ন করল সে।

'কাজ তো একটাই,' জবাব দিল কণ্ঠটা, 'খুন করতে হবে কাউকে। আপাতত রবিনকে দিয়েই শুরু করা যাক।'

'না না, আমি পারব না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ও আমার বন্ধু!' খোলা মুখ দিয়ে ভসভস করে আবার বেরিয়ে এল তীব্র দুর্গন্ধ।

'কে বলল বন্ধু? ও তোমার শত্রু। ক্যাম্প গ্রাউন্ডে ও তোমার শত্রু চুঙের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। প্রতিশোধটা নেয়া উচিত।'

মুখ দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছেই। ঠেকানোর জন্যে একটা বালিশ তুলে নিয়ে মুখে চাপা দিল। থরথর করে কাঁপছে শরীর। ঘরের ভেতরটা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা।

'আমি পারব না!' আবার বলল সে।

খলখল করে হেসে উঠল কণ্ঠটা। মাথার ভেতর মটমট করে শুকনো ডাল ভাঙল যেন কয়েকটা। 'পারবে না? আমি তোমাকে পারাব। আমার ওপর ভরসা করো।'

'না!'

'তুমি এখন আমি। আমি যা বলব, তোমাকে এখন তাই করতে হবে।'

আবার হেসে উঠল কণ্ঠটা। চোখের সামনে কুয়াশা দেখতে পেল কিশোর। ঘন সবুজ কুয়াশা পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে ঘরের মধ্যে। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে ছাতের দিকে।

কাঁপুনি বেড়ে গেল শরীরের। পেট থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। বালিশ চাপা দিয়েও ঠেকাতে পারছে না। কোন্ ফাঁক দিয়ে যে

বেরিয়ে আসছে কে জানে। বালিশ ফেলে দুহাতে গলা চেপে ধরল সে। তাতেও বন্ধ হলো না গন্ধটা। মনে হচ্ছে পেট থেকে নয়, বাইরে থেকে আসছে ওই গন্ধ। সবুজ কুয়াশা ভেসে আসছে ওকে ঘিরে ফেলার জন্যে। একটানে বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে নিজের গলা, মুখ, মাথা পেঁচিয়ে ফেলল। কাজ হলো না তাতেও।

চাদর ফেলে চোখ মুদল। দুহাতে নাকমুখ চেপে ধরল।

ভারি কুয়াশা ভেসে এল মাথার ওপর। ঢেকে ফেলতে লাগল ওকে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়ে ওঠার পরও ঘুম ঘুম লাগল। ভেসে যাচ্ছে যেন সে। দূরে...বহুদূরে...সরে যাচ্ছে ঘরটা।

সবুজ কুয়াশা গ্রাস করল ওকে। তার সঙ্গে ভেসে ভেসে সে-ও যেন কোন সুদূরে রওনা হলো। ভাসছে...ভাসছে...ভাসছে... চতুর্দিকে এখন শুধু ধূসরতা...সব কিছু ধূসর...

হঠাৎ করে ফিরে এল বাস্তবে। যেন ধূসর মেঘলোক থেকে ধপ করে পড়ল মাটির পৃথিবীতে। স্পষ্ট হয়ে গেছে দৃষ্টিশক্তি। ঘরের সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আবার। সবুজ কুয়াশা নেই। বমি বমি ভাব নেই। বন্ধ হয়ে গেছে শরীরের কাঁপুনি।

বিছানা থেকে নামল সে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল রবিনকে।

কয়েক সেকেন্ড পর ওপাশ থেকে সাড়া এল রবিনের।

'আসতে পারবে?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জরুরী কথা আছে।'

'পারব।'

রিসিভার রেখে দিয়ে শার্ট বদলাল কিশোর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল। জুতো পরে নেমে এল নিচে। হলঘরে টেলিভিশনের সামনে বসে আছে ডন। কিশোরকে দেখে মুখ বাঁকাল। কথা বলল না। ওর হাত মুচড়ে দিয়েছিল বলে রেগে আছে।

মেরিচাচী রান্নাঘরে।

রাশেদ পাশাকে পাওয়া গেল তাঁর অফিসে। চাচাকে বলল, 'তোমার গাড়ির চাবিটা দাও।'

'কোথায় যাবি?'

'রবিনদের বাড়িতে।'

'পার্টি আছে নাকি?'

'নাহ্, এমনি নেব। মোটর সাইকেল চালাতে ইচ্ছে করছে না।'

বারো

দুহাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরেছে কিশোর। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে নীল অ্যাকর্ড। গাড়িটা নতুন কিনেছেন রাশেদ পাশা। নতুন মানে গাড়ি নতুন নয়, কেনা হয়েছে নতুন। অ্যাক্সিডেন্ট করা গাড়ি কিনে এনে মেরামত করিয়ে নিয়েছেন।

ব্ল্যাক ফরেস্টের দিকে চলেছে সে। এ হলো আরেক আজব নাম। শহরের নাম, অথচ শুনলে মনে হয় কোন বনের। অবশ্য বনটার নামেই শহরের নামকরণ হয়েছে, যেখানে নতুন বাড়ি কিনেছেন রবিনের বাবা। বাড়িটা যে গলিতে, সেটার নাম আরও অদ্ভুত, গোস্ট লেন—ঢাকায় যেমন আছে ভূতের গলি।

ছুটছে আর ভাবছে কিশোর; রবিন, আমি আসছি! তোমাকে আমি শেষ করব!

হালকা একটা হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল তার ঠোঁটে। উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট চোখে পড়তে ক্ষণিকের জন্যে চোখ বুজে ফেলল।

রবিন এবং চুং মিলে ক্যাম্পে গ্রুপ করে খেলেছিল। বন্ধুত্ব করেছে দুজনে! ওর শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব। অতএব রবিনকে ছাড়া হবে

না।

চুং-এর সঙ্গে মিশতে ওকে মানা করেছিল কিশোর। রবিন শোনেনি। অবাক হয়ে তাকিয়েছে ওর দিকে। তর্ক করেছে। কিন্তু গ্রুপ থেকে সরেনি। কেন সেটা সহ্য করবে কিশোর? করার কোন কারণ নেই। ওর নিষেধ অগ্রাহ্য করে ক্যাম্পে চুং-এর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে রবিন, ক্যাফেতে একসঙ্গে বসে চা খেয়েছে, গল্প করেছে। অত বন্ধুত্ব কেন, কিশোরকে বাদ দিয়ে?

কিশোর নই, আমি অন্য লোক। কি নাম দেয়া যায়? ওয়ালি। হ্যাঁ, ওয়ালি।—নিজেকে ওয়ালি কল্পনা করতে শুরু করল সে। করতে ভাল লাগল। আরও বোঝাল, কিশোরটা একটা হাঁদা, পানসে জীব। ওয়ালি হলো আসল মানুষ। উত্তেজনার জন্যে মানুষের যা যা করা উচিত, সবই সে করতে রাজি আছে। খুন করতেও কোন দ্বিধা নেই। খুন তো মজার খেলা। পৃথিবীতে সবচেয়ে মজার। কোথায় লাগে এর সঙ্গে ক্রিকেট আর ফুটবল।

রবিন, তোমার কপাল সত্যি খারাপ। আর লোক পেলে না। শেষে বন্ধুত্ব করলে গিয়ে চুং-এর মত একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। এর জন্যে শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। ওয়ালি তোমাকে শাস্তি দেবেই।

সামনে একটা স্টেশন ওয়াগন বোঝাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে। ওটাকে পাশ কাটানোর জন্যে গতি বাড়িয়ে দিল সে। সাঁ সাঁ করে পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে রাস্তার লাইট পোস্টগুলো। মারাত্মক গতিতে পাশ কাটাল ওটার। ওর দিকে তাকিয়ে হই-হই করে উঠল ছেলেমেয়ের দল। নিজেদের

ড্রাইভারকে গতি বাড়িয়ে ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে বলল।

সামনে একটা ট্রাফিক পোস্ট। লাল আলো জ্বলছে। দাঁড়াতে হলো ওকে। সবুজ বাতি জ্বলতে আবার চাপ দিল গ্যাস পেড্‌লে। কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতে অযাচিত ভাবে পড়ে গেল ট্র্যাফিক জ্যামে।

ফোনে রবিন জানিয়েছে, একটা মার্কেটে যাচ্ছে সে—ব্ল্যাক ফরেস্ট মল, মা একটা বাজারের ফর্দ দিয়েছেন, জিনিসগুলো কিনতে হবে। সেদিকে যাওয়ার জন্যেই মোড় নিয়েছে কিশোর। পড়ে গেছে একগাদা গাড়ির ভিড়ে।

একটা বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মুখোমুখি পার্কিং লটের একধারে রবিনের সঙ্গে দেখা করার কথা ওর। জায়গাটা অন্ধকার। নির্জন। ইচ্ছে করেই ওখানটাতে দেখা করার কথা বলেছে কিশোর। ওর সুবিধে হবে বলে। ওখানে যাওয়ার আরও পথ আছে। খানিকটা ঘুরে যেতে হবে। জ্যামে আটকে কচ্ছপের গতিতে এগুনোর চেয়ে বেশি ঘুরে যাওয়াও ভাল।

গাড়ি পিছিয়ে আনল সে। অন্য রাস্তা ধরে ছুটল। ঠিকই করল এসে। ভিড় নেই এ রাস্তায়।

মলের সামনে সেই ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মুখোমুখি পার্কিং লটের প্রান্তে এসে গাড়ি থামাল। একপাশে একটা সিনেমা হল। টিকেট কাউন্টারের সামনে স্কুলের দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাজার সেরে ঠেলাগাড়িতে করে জিনিসপত্র ঠেলে নিয়ে চলেছে এক মহিলা। চলে গেল পাশ দিয়ে। আর কোন লোক এল না এদিকে। পার্কিং লটে গাড়ি আছে কয়েকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সবই

মনে হলো মলের কর্মচারীদের।

লোকজনের ভিড় একেবারেই নেই এদিকটায়।

কিশোরের চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে রবিনকে।

হ্যাঁ, ওই তো দাঁড়িয়ে আছে। একটা লাইটপোস্টের হলদে আলোর নিচে। পকেটে দুই হাত। নিশ্চয় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

আহা, কি সহজ—ভাবল কিশোর—একেবারেই সহজ।

রবিনের দিকে গাড়ির নাক তাক করে গ্যাস পেড্‌লে চাপ বাড়িয়ে দিল সে।

গর্জন করে উঠল এঞ্জিন। খেপা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল।

অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল রবিন, দেখতে পায়নি প্রথমে। এঞ্জিনের শব্দে ফিরে তাকাল। হাঁ হয়ে গেল মুখ। ভয়ঙ্কর গতিতে নীল অ্যাকর্ড গাড়িটা ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে।

দারুণ মজা! আনন্দে দুলছে কিশোরের মন। কত সহজেই না শেষ করে দেয়া যায় একজন মানুষকে!

উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে সে। কাঁধে বাঁধা সেফটি বেল্টের ওপর প্রায় ঝুলে পড়েছে। জ্বলজ্বল করছে চোখ। হাসিতে ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁট।

দুটো হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো পড়েছে রবিনের মুখে। সাদা দেখাচ্ছে ওর চেহারা। আতঙ্কিত।

মারা যাচ্ছে যে বুঝতে পারছে ও—ভেবে আরও খুশি হয়ে উঠল কিশোরের মন। রবিনের আতঙ্কটা উপভোগ করছে। অনুভব করতে

পারছে যেন গাড়ির ধাক্কা লাগলে কিভাবে হাড়-মাংস ভর্তা হবে রবিনের, ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়বে শরীরে, দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে থাকবে। আহা, কি আনন্দ!

মরো, রবিন, মরো!

ধাক্কা লাগে লাগে এ সময় লাফিয়ে সরে গেল রবিন। চলে গেল আলোর সামনে থেকে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল একটা নিচু কংক্রীটে তৈরি ডিভাইডারে।

প্রচণ্ড গতিতে ডিভাইডারে আঘাত হানল নীল অ্যাকর্ড। ঝাঁকুনি খেয়ে মাতালের মত দুলতে দুলতে গিয়ে গুঁতো মারল একটা লাইটপোস্টে। রবারের চাকা আর গাড়ির ধাতব শরীর মিলে প্রতিবাদের ঝড় তুলল বিচিত্র শব্দে।

'উফ্!' করে একটা চিৎকার বেরিয়ে গেল কিশোরের মুখ থেকে। ভীষণ ঝাঁকুনিতে সামনে ছুটে যেতে চাইল ওর শরীরটা। বুক লক্ষ্য করে ধেয়ে এল স্টিয়ারিং হুইল। কিন্তু আটকে দিল কাঁধে বাঁধা সেফটি বেল্ট। বাঁচিয়ে দিল ওকে। ঝাঁকি খেয়ে শরীরটা ফিরে গেল আবার পেছন দিকে। ভয়ানক গতিতে সীটের হেলানের ওপরে হেডরেস্টে বাড়ি খেল মাথার পেছন দিক। ঝাঁকিটা আরেকটু জোরাল হলে ভেঙে যেত ঘাড়ের হাড় ভারটেব্রা। রবিনকে মারার পরিবর্তে শেষ হয়ে যেত সে নিজেই।

সামনের অন্ধকারের দিকে তার চোখ। শরীরে ছড়িয়ে পড়া ব্যথাটা কমার অপেক্ষা করছে।

নীরব হয়ে গেছে সবকিছু।

এঞ্জিন বন্ধ।

রবিন কোথায়? অবাক হয়ে ভাবল সে। অনেকটা অবচেতন ভাবেই সীটবেল্ট খুলতে শুরু করল তার আঙুলগুলো।

পালাল নাকি?

কমে আসছে ব্যথা।

গাড়ির চাকার নিচে চাপা পড়ল রবিন?

তেরো

টোকা পড়ল জানালার কাঁচে। নীরবতার মাঝে অনেক জোরাল শোনাল শব্দটা। চমকে ফিরে তাকাল কিশোর। রবিনের মুখটা দেখতে পেল। কিছুই হয়নি ওর। সুস্থ, স্বাভাবিক। দুচোখে উৎকণ্ঠা। ও মুখ ফেরাতেই জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কি হয়েছে তোমার? ব্যথা পেয়েছ?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। চেপে রাখা বাতাসটা ফুসফুস থেকে বের করে দিয়ে ঠেলে একপাশের দরজা খুলে নামল। 'নাহ্, আমি ঠিকই আছি।'

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল রবিন। 'আমি...আমি তো ভয়ে একেবারে...মনে হলো ইচ্ছে করেই যেন আমার গায়ে গাড়িটা তুলে দিতে চাচ্ছিলে তুমি।'

'অ্যাক্সিলারেটর আটকে গিয়েছিল,' মিথ্যে কথা বলল কিশোর। 'কিছুতেই গতি কমাতে পারছিলাম না।'

'আমিও তাই ভেবেছি!' কিশোরের হাত ধরল রবিন। 'তোমার কোথাও লাগেনি তো? লাইট পোস্টের গায়ে যে ভাবে গুঁতো মারলে।'

গাড়ির কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখতে লাগল কিশোর। সামনের বাম্পারের বাঁ দিকটা বাঁকা হয়ে দেবে এসেছে ভেতর দিকে। 'ইস্, তুবড়ে গেছে! চাচার মন খারাপ হয়ে যাবে।'

'মেরামত করলেই ঠিক হয়ে যাবে,' সান্ত্বনা দিল রবিন। 'তুমি যে বেঁচেছ এই বেশি। মাথায় লেগেছে? ঘাড়ে?'

'না, আমি ঠিকই আছি,' অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'তোমার কি অবস্থা?'

'আমার বুকের মধ্যে রেসের ঘোড়া দৌড়াচ্ছে এখনও।'

'ওঠো, গাড়িতে,' প্যাসেঞ্জার সীটের দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর। 'জরুরী কথা আছে।'

'গাড়িটা নেবে কি করে? টো ট্রাককে খবর দেয়া লাগবে।'

'মনে হয় না। শুধু তো বাম্পারটা বেঁকেছে। স্টার্ট নেয় কিনা দেখা যাক।'

'গাড়ি তোমার কপালে নেই। নিজে কিনলে তো যায়ই, অন্যের গাড়ি ধার আনলেও অ্যাক্সিডেন্ট করো। যতবার এনেছ, ভেঙেছ। এমন কেন, বলো তো?'

'কি জানি! ওঠো।'

'যেতে হবে নাকি কোনখানে? এই ভাঙা গাড়ির দরকার কি? আমারটা নিলেই পারি। তা কথাটা কি?'

'গাড়িতে ওঠো, তারপর বলছি,' হালকা রাগের আভাস কিশোরের কণ্ঠে। রবিনের অত প্রশ্ন সহ্য হচ্ছে না। 'অতদূর হেঁটে যেতে পারব না। কথা শেষ হলে তোমার গাড়ির কাছে নামিয়ে দেব।'

অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। 'কিশোর, তোমাকে আমার কেমন জানি লাগছে! স্বভাবই যেন বদলে গেছে তোমার...'

'মুসার জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে আমার,' কিশোর বলল। 'সে-ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার।' মাথা নিচু করে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সে। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল। আঙুলগুলো নাচাতে লাগল স্টিয়ারিং হুইলের ওপর।

গাড়ির পেছন ঘুরে এসে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল রবিন। চিন্তিত। জানতে চাইল, 'কি হয়েছে মুসার? আজকেও দেখা হয়েছে। সুস্থই তো মনে হচ্ছিল।'

জবাব দিল না কিশোর। চাবিতে মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পিছাতে শুরু করল গাড়ি। নামিয়ে আনল ডিভাইডার থেকে।

'ঠিকই আছে এঞ্জিন,' রবিন বলল। 'চেহারাটা কেবল নষ্ট হয়েছে। গ্যাস পেড়লের কি অবস্থা?'

'এখন তো ঠিকই আছে,' গীয়ার বদলে গেটের দিকে রওনা হলো কিশোর। 'আপনাআপনি ঠিক হয়ে গেল কি করে ভেবে অবাক লাগছে না?'

'লাগছে,' পাশ ফিরে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ।'

'সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম,' যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে গাড়ি চালাল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' সীট বেল্ট বাঁধতে শুরু করল রবিন।

'পুরানো মিলটার কাছেই যাই চলো। জায়গাটা খুব নির্জন। কথা বলতে সুবিধে।'

পছন্দ হলো না রবিনের। 'ওই ভাঙা মিল! ও তো একটা ধ্বংসস্তূপ।'

'কিন্তু শান্ত।' মনে মনে বলল কিশোর, 'তোমাকে খুন করার জন্যে সেরা জায়গা।'

'এখন তোমার শরীরের অবস্থা কেমন?' অন্ধকারে পাশ দিয়ে সরে যাওয়া ছায়া ছায়া গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'ক্যাম্প থেকে ফিরে আসার পরের কথা জানতে চাইছি। যা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম না আমি আর মুসা!'

'বিশ্রী একটা অবস্থা হয়েছিল, তাই না? কোন ধরনের ভাইরাসের শিকার হয়েছিলাম বোধহয়। জঘন্য ভাইরাস।'

'এখন গেছে তো?'

'মনে হয়। তবে দুর্বলতা কাটেনি পুরোপুরি। দুঃস্বপ্ন দেখি। আজ বিকেলে তো ভয়ানক অবস্থা হয়ে গিয়েছিল...ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেখি কি দেড়শো বছরের পুরানো এক স্বপ্ন। কি যে দেখেছি বললে বিশ্বাস করবে না।'

কিশোরের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রবিন। কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। তারপর বলল, 'তুমি যখন অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে ছিলে, চুং যা খেলা দেখাল না। ও'কনর ওর কাছে কিছু না। তুমি দেখতে পারছিলে না বলে দুঃখ হচ্ছিল খুব।'

মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর। কথা বলল না।

'মুসার কি হয়েছে?' এতক্ষণে আসল কথায় এল রবিন।

তাকিয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

'ওর জন্যে কিছু একটা করা দরকার,' নিচু স্বরে বলল কিশোর। 'খুব ভয় পাচ্ছি আমি।' মোড় নিয়ে খোয়া বিছানো একটা শাখাপথে নামল সে। গাছপালার ভেতর দিয়ে মিলের দিকে চলে গেছে পথটা।

'তুমি বলতে চাইছ...' ঠোঁট দুটো O অক্ষরের মত গোল হয়ে গেল রবিনের। ওভাবেই রইল।

মাথা ঝাঁকাল আবার কিশোর, 'হ্যাঁ, মায়ানেকড়ের আঁচড়ের বিষ।'

হেডলাইটের আলোয় ফুটে উঠল দোতলা নির্জন একটা কাঠের বাড়ি। একপাশে বিশাল এক চাকা। এঞ্জিন বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে, ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল কিশোর। 'নামো।'

খোয়া বিছানো পথ ধরে প্রায় শুকনো নালাটার দিকে এগোল সে, যেটার পানির স্রোতের সাহায্যে একসময় ঘোরানো হত চাকাটা। কাছাকাছি কোন মানুষ কিংবা আর কোন গাড়ি না দেখে খুশি হলো। ব্ল্যাক ফরেস্টের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় রাতে ক্যাম্পিং করতে আসে এখানে। আজ আসেনি কেউ।

বসন্তে কচি পাতা গজিয়েছে গাছে গাছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। ওগুলোকে নড়িয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ কানে আসছে। আবছা কালো আকাশের পটভূমিতে বিশাল এক ছায়া হয়ে সামনে মাথা তুলে আছে মিল হাউসটা। আকাশে চাঁদ আছে, কিন্তু আলো ছড়াতে পারছে না। কালো একটুকরো মেঘ অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে ওটার, মলিন করে দিয়েছে উজ্জ্বলতা।

'তুমি সত্যি বিশ্বাস করছ ম্যানিটো রোগের জীবাণু ঢুকে পড়েছে

মুসার শরীরে?' প্রশ্ন করল রবিন।

'হ্যাঁ,' অস্পষ্ট জবাব দিল কিশোর। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে, মাটিতে পড়ে থাকা কাঠের পাল্লা মাড়িয়ে পেরিয়ে এল ভাঙা গেট। ঢুকে পড়ল আঙিনায়।

'কি ভয়ঙ্কর কথা শোনালে! কি করা যায় বলো তো?' হাঁপাতে আরম্ভ করেছে রবিন। 'আরে অত জোরে হাঁটছ কেন? দাঁড়াও না।'

ওর অনুরোধ যেন কানেই ঢুকল না কিশোরের। হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। পড়ে থাকা ভাঙা তক্তা, ইঁট-পাথর আর অন্যান্য জঞ্জাল মাড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছে মিলের চাকাটার কাছে।

'কিশোর, কোথায় যাচ্ছ?' পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন। কিশোরের সঙ্গে পাল্লা দিতে রীতিমত দৌড়াতে হচ্ছে ওকে। 'কথা বলতে তো এসেছিলে? বলো না?'

'চাকাটা দেখো,' প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল কিশোর, 'দেখলেই ভয় লাগে, তাই না?' হাত বাড়িয়ে কাঠের তৈরি একটা স্পোক চেপে ধরল সে। নড়াতে পারল না। তালা লাগিয়ে রেখে গেছে মিলের মালিক।

গ্রীনহিলসেও পুরানো বাতিল মিল আছে। ছোটবেলায় চাকার ওপরে চড়াটা একটা মজার খেলা ছিল কিশোর, রবিন আর মুসার কাছে। কে আগে চাকার ওপর চড়তে পারে তার প্রতিযোগিতা করত। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে দুহাত দুদিকে বাড়িয়ে কোন কিছু না ধরে ভারসাম্য বজায় রেখে কে কতটা নিচে নেমে আসতে পারে সেই প্রতিযোগিতাও চলত। সুতরাং মিলের চাকায় চড়াটা কিছুই না

কিশোরের জন্যে, সেটা রাতেই হোক বা দিনে। ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

রবিন বলল, 'এই অন্ধকারে চাকার ওপর উঠছ! তোমার মাথা খারাপ হয়নি তো?'

ততক্ষণে অর্ধেক ওপরে উঠে গেছে কিশোর। আরও দ্রুত উঠতে লাগল।

'কিশোর, থামো...পাগলামি কোরো না...কালকের বৃষ্টিতে ভিজে আছে, পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙবে। ওখানে উঠছ কেন?'

জবাব দিল না কিশোর। চাকার একেবারে ওপরে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘাড় লম্বা করে চারপাশে তাকাতে লাগল। দৃশ্যটা বড়ই চমৎকার, মনে হলো তার। শুকনো নালা, মিলের পরিত্যক্ত আঙিনা, পড়ে থাকা তক্তা আর জঞ্জাল, সব চোখে পড়ছে। উঁচু বেড়ার ওপাশে তার গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। তারও ওপাশে গাছপালা আর অন্ধকার।

অন্ধকার! ছড়িয়ে আছে সর্বত্র! খুব সুন্দর। অন্ধকারই তো ভাল। আলো কে চায়?

নিচে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'গ্রীনহিলসের কথা মনে আছে? উঠে এসো। অনেকদিন পর আজ উঠতে ইচ্ছে করল। দেখে যাও, দারুণ দৃশ্য।'

কিশোরের কাণ্ডকারখানায় অবাক হচ্ছে রবিন। প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না। উঠতে শুরু করল। ও অর্ধেক উঠে আসার পর বসে পড়ে হাত চেপে ধরল কিশোর। উঠতে সাহায্য করল।

ভিজে আছে কাঠ। বসলে কাপড় ভিজে যায়। প্যান্ট যাতে না

ভেজে সেজন্যে জুতোর ওপর ভর দিয়ে বসল রবিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোমাকে আজ এই পাগলামিতে ধরল কেন?'

'দারুণ দৃশ্য!' একই কথা বলল আবার কিশোর দূরের অন্ধকার গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে। 'কেমন অন্ধকার হয়ে আছে দেখো!'

'অন্ধকার যে সুন্দর হয়, আজ নতুন শুনলাম।...তুমি বললে জরুরী কথা বলতে ডেকে এনেছ আমাকে। সেটা মাটিতে বসেও বলা যেত।'

রবিনের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। 'কেন ওপরে উঠে ভয় লাগছে নাকি?'

'না, তা লাগছে না। তবে তোমাকে মনে হচ্ছে পাগলামি রোগে ধরেছে।'

কি রোগে ধরেছে সেটা এখনই টের পাবে!—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল কিশোর—এমন ভয় লাগবে, জীবনে যে ভয়ের কথা কল্পনাও করোনি।

হাতের তালুতে ভর রেখে ঝুঁকে নিচে তাকাল রবিন। অনেক নিচে সিমেন্টে বাঁধানো কয়েক ফুট চওড়া চত্বর। চাকার দুপাশেই আছে ওরকম। এত ওপর থেকে ওখানে পড়লে হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না।

'ভয় আমারও লাগছে না,' কিশোর বলল। 'বরং ওপরে ওঠায় কেমন একটা শান্তি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আমার কথাবার্তা কি অস্বাভাবিক লাগছে তোমার কাছে?'

'লাগছে। যাকগে, মুসার কথা বলো।'

'কি আর বলব। ও গেছে।'

একঝলক উষ্ণ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল কিশোরের ঘাড়ের লম্বা চুল। ধীরে ধীরে রবিনের কাছে সরে আসতে লাগল সে।

'গেছে মানে?' শুকনো গলায় বলল রবিন। 'ও কি মায়ানেকড়ে হয়ে যাবে নাকি? বাঁচানোর কোন উপায় নেই?'

'না, নেই,' আস্তে করে একটা হাত বাড়িয়ে রবিনের কাঁধ চেপে ধরল কিশোর। ফেলে দেয়ার জন্যে এখন একটা ঠেলাই যথেষ্ট।

চোদ্দ

ফিরে তাকাল রবিন। কিশোরের কুমতলব ধরতে পারেনি এখনও। তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে তাকে। 'আমার ভয় লাগছে, কিশোর! মুসা কি সত্যি মারা যাবে?'

তা হয়তো যাবে। কিন্তু তুমি সেটা দেখবে না, জানতেও পারবে না কোনদিন—মনে মনে বলল কিশোর। তার আগেই কবরের অন্ধকারে পড়ে থাকবে তুমি। শক্ত হয়ে এল ওর বাহুর পেশী। চাপ বাড়াতে আরম্ভ করল। ঠেলা দেবে ঠিক এই সময় নিচ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'অ্যাই, ওখানে উঠেছ কেন? নামো!'

চমকে গেল কিশোর। ঝট করে হাত সরিয়ে আনল রবিনের কাঁধ থেকে। 'কি বলছেন?'

'নামো নিচে!' আবার ধমক দিল লোকটা। টর্চের আলো এসে পড়ল কিশোর আর রবিনের মুখে। 'পড়ে মরবে তো!'

'আমরা তো কিছু করছি না,' জবাব দিল রবিন, 'চুপচাপ বসে কথা বলছি।'

'কথা বলার আর জায়গা পেলে না,' চিৎকার করে বলল লোকটা। 'চুরি করতে ঢুকেছ নাকি?'

রেগে গেল রবিন। 'কি আছে এখানে? কি চুরি করব?'

'না বলে অন্যের জায়গায় ঢুকেছ, সেটাও অপরাধ। নামো জলদি। নইলে পুলিস ডাকব।'

নামার সময় প্যান্টের পেছনটা ভেজাতেই হলো। নষ্ট করতে হলো পোশাকের আরও অনেক জায়গা। উপুড় হয়ে শুয়ে পেটের ওপর ভর রেখে চাকার বাঁক বেয়ে ধীরে ধীরে পিছলে নামতে শুরু করল রবিন।

চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। নিরাশ হয়েছে খুব। রাগে আগুন ধরে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। নিচের লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দেবে নাকি, ভাবল। পাথর দিয়ে পিটিয়ে খুলির ভেতরের মগজ বের করে দিতে পারলে আরও ভাল হত। শয়তান ব্যাটা! আসার আর সময় পেল না!

নেমে যাচ্ছে রবিন। ওর দিকে তাকিয়ে কমে আসতে লাগল রাগ। ভাবল, ওই হাঁদা লোকটার কথা ভেবে সময় নষ্ট করছি কেন আমি? আমার শিকার তো আসলে রবিন। ওকে খতম করা দরকার।

রবিনের মত ভয় পেল না কিশোর। যেদিক দিয়ে স্পোক বেয়ে বেয়ে উঠেছিল, সেদিক দিয়েই দ্রুত নেমে এল। খানিকটা ওপরে থাকতে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে। জ্বলন্ত চোখে তাকাল লোকটার দিকে। সোয়েটশার্ট আর ডেনিম ওভারঅল পরনে।

'কি যে ভাব তোমরা নিজেদের। মনে করো কোনদিন মরবে না,' বকা দিল লোকটা, 'সে কারণে কোন কিছুকে পরোয়া করো না। ভয়ডর বলে কিছু নেই। ওখান থেকে পড়লে কি ঘটত,

একটিবারও কি ভেবেছ?'

বাঁচব না মরব, তাতে তোর কি ব্যাটা!—মনে মনে গাল দিল কিশোর। তবে চেহারায় রাগ ফুটতে দিল না। 'দয়া করে আপনার লেকচার থামান না। নেমে তো এলাম, আর কি?' রবিনের দিকে এগোল সে।

কিছুক্ষণ পর মলের পেছনে রবিনের গাড়ির কাছে ওকে নামিয়ে দিল কিশোর। একেবারে নির্জন হয়ে গেছে এখন এলাকাটা।

'আসল কথা কিন্তু কিছুই বললে না,' গাড়ির দরজার তালা খুলতে খুলতে বলল রবিন, 'যে জন্যে নিয়ে গেলে।'

'কাল তোমাকে খুন করব,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'কি করবে?'

'না, বলছিলাম, কাল সব খুলে বলব।'

'ও,' চোখের পাতা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল রবিনের। কিন্তু অস্বস্তি গেল না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কিছু একটা হয়েছে কিশোরের। অদ্ভুত আচরণ করছে। অসুস্থতার জন্যে হতে পারে সেটা। 'আমার মনে হলো খুন করবে বললে।'

'ওরকম উদ্ভট কথা বলতে যাব কেন?'

'তাই তো! ভুল শুনেছি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে ড্রাইভিং সীটে বসে দরজা লাগাল রবিন। 'কাল দেখা হবে।'

তা তো হবেই—মনে মনে বলল কিশোর। কাল তোমাকে খুন করতে হবে না? ভুল শোনোনি। তারপর শেষ করব মুসাকে। তোমার খুনটাকে সবাই দুর্ঘটনা ভাবলেও ও সন্দেহ করে বসতে

পারে। গত কদিনে আমার আচরণ দেখেছে। অস্বাভাবিক ঠেকেছে ওর কাছেও। আমিই যে তোমাকে খুন করেছি একবার যদি মাথায় ঢুকে যায় ওর, আর বাঁচতে পারব না। অতএব ওকেও শেষ করতে হবে।

স্টার্ট দিল রবিন। গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে ঘোরাল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তখনও এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে। তারপর অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল।

দাঁড়িয়েই আছে কিশোর। ভাবছে। চুং-এর হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

ওই হাসি থাকবে না, মুছে যাবে,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'তোমাকেও ছাড়ব না আমি। একজন একজন করে শেষ করব। তারপর ভেবে দেখব আর কে কে শত্রু আছে আমার...' মনে পড়ল টেরিয়ার ডয়েলের কথা, তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু। ওর কথা ভাবতে গিয়ে হাসি ফুটল কিশোরের মুখে, 'না, ও আমার শত্রু নয়। শুঁটকিটা আসলে ভাল মানুষ। এতদিন বুঝতে পারিনি। বরং মেরিচাচী...রাশেদ পাশা...ডন...ওরা হলো একেকটা বদের গোড়া...'

পনেরো

জেগে গেল কিশোর। পুরো সজাগ। মাথার ওপরে সাদা গোল গ্লোবের মত শেড। পরিষ্কার আলো। জানালার পর্দাগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ঝুলছে। ড্রেসারের আয়নাটাও স্বাভাবিক। বেঁকেও যায়নি, আগুনও ধরেনি। চিরুনি আর ক্রীমের কৌটা জায়গামতই আছে।

সব পরিষ্কার। সব স্পষ্ট। গত কয়েক ঘণ্টায় যা যা ঘটে গেছে, সব যেন দুঃস্বপ্ন।

বিছানায় উঠে বসল সে। ঘড়িটার দিকে তাকাল। রাত তিনটার বেশি।

কেন জাগল? কিসে জাগাল ওকে? আলো?

উঁহুঁ। অন্য কিছু। কোন একটা পরিবর্তন ঘটেছে কোথাও।

শেডের কারণে বিচিত্র ছায়া তৈরি হয়েছে ছাতে। সেগুলোও খুব স্পষ্ট। দৃষ্টি স্বচ্ছ। মাথাটা হালকা।

পরিবর্তনটা কি বুঝে ফেলল সে। রোগের আক্রমণ নেই আর এখন। কেটে গেছে। শয়তান রোগটা বেরিয়ে গেছে মগজ থেকে।

কিন্তু তারপরেও পুরোপুরি স্বাভাবিক লাগছে না শরীরটা। ভার হয়ে আছে মাথা। নাহ্, আর দেরি করা যায় না। কালই ডাক্তার

দেখাতে হবে। এ ভাবে কষ্ট পাওয়ার কোন মানে নেই। কষ্টের চেয়েও বড় কথা, ঘোরের মধ্যে কি যে মারাত্মক অঘটন ঘটিয়ে বসবে, কোন ঠিকঠিকানা নেই।

কিন্তু এই রোগ কেন হলো তার?

ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে পড়ল—ডক্টর মুন! মনটানায় পর্বতের ভেতরে গোপন ল্যাবরেটরিতে মানুষ নিয়ে গবেষণা করছিল সে। প্রাণ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছিল। ল্যাবরেটরিতে হাত-পা বেঁধে এক্সপেরিমেন্ট-বেডে শোয়ানো হয়েছিল ওদের তিনজনকে। ওর ওপর গবেষণা চালানোর জন্যে একটা ইনজেকশন দিয়েছিল ডাক্তার। আরও অনেক কিছুই করত, সময় পায়নি। শেরিফ আর রিশের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ওর ল্যাবরেটরি। নিশ্চয় সেই ইনজেকশনের রিঅ্যাকশন। নইলে অমন হবে কেন? রোগের কেবল শুরু এখন। পাগলামিটা ধরছে, কিছুক্ষণ থেকে থেকে ছেড়ে দিচ্ছে। পরে এমন অবস্থা হবে, হয়তো সারাক্ষণ থাকবে, ছাড়বেই না আর। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে তখন সে।

এ রকম হওয়াটা অসম্ভব নয়। এমন অনেক ওষুধ আছে, যেগুলো রক্তে ঢুকিয়ে পাগল করে দেয়া যায় মানুষকে। আগাথা ক্রিস্টির একটা গল্পে পড়েছে, রক্তের সঙ্গে অ্যাট্রোপিন মিশিয়ে সাময়িক পাগল করে দেয়া হত এক যুবককে, জেগে জেগেও উল্টোপাল্টা দুঃস্বপ্ন দেখত সে। খুন অবশ্য করেনি, তবে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল সেরকম মানসিকতার দিকেই।

তেমন কোন ভয়ঙ্কর বিষ নিশ্চয় তার শরীরেও ঢুকিয়ে দিয়েছে

ডক্টর মুন। সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। ডাক্তারের কাছে গিয়ে সব খুলে বলতে হবে। তার সন্দেহের কথা জানাবে। নইলে রকহিল ক্যাম্পের ডাক্তারের মতই 'কিছু হয়নি' বলে বিদেয় করে দেবেন ডাক্তার।

দুশ্চিন্তায় বাকি রাতটা ভালমত ঘুমাতে পারল না কিশোর। সকালে যখন চোখ মেলল, মাথাটা ভার হয়ে আছে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। মৃদু বাতাসে দুলছে পর্দাগুলো।

উঠে বসল সে। হাত টান টান করল। আড়মোড়া ভাঙল। বিছানার পায়ের দিকে চোখ পড়তে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ভয়ঙ্কর এক জলদস্যুর কাটা মাথা পড়ে আছে।

চিৎকার দিয়ে ফেলেছিল প্রায়, এই সময় চিনে ফেলল জিনিসটা। ডনের কাণ্ড। রবার আর কাগজ দিয়ে বানিয়ে ফেলে রেখে গেছে ভয় দেখানোর জন্যে। তবে রাগ হলো না কিশোরের। মাথাটা শান্ত আছে এখন। মনে মনে হাসল। হাত মুচড়ে দেয়ায় তার সঙ্গে আড়ি তো এখন, তাই আবার ভয় দেখাতে চেয়েছে। ছেলেটা মহা পাজি। তবে বুদ্ধি আছে স্বীকার করতে হবে।

উঠে বাথরুমে গেল। হাতমুখ ধুয়ে এসে পরিষ্কার কাপড় পরল। ডাক্তারের কাছে যাবে।

নিচে নেমে দেখল মেরিচাচী রান্নাঘরে। জিজ্ঞেস করলেন, 'বেরোচ্ছিস নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবি?'

'রবিনদের বাড়িতে,' ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা চেপে গেল

কিশোর। বললেই চেপে ধরবেন। একশো-একটা প্রশ্ন করবেন। কৈফিয়ত দিতে দিতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। যদি শোনেন, পাগলামি রোগে ধরেছে ওকে, খুনের নেশা চাপে, তাহলে যে কি করবেন খোদাই জানে।

'টেবিলে বোসগে। নাস্তা রেডি।'

টেবিলে বসল কিশোর।

ডিম ভেঙে ফ্রাইং-প্যানে ছাড়ছেন চাচী। ওর দিকে পেছন করা। একধারে র‍্যাকে কতগুলো ছোটবড় ছুরি রাখা। একেকটা একেক কাজের জন্যে। মাংস কিমা করার ছুরিটার ওপর চোখ পড়তেই মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল। শুরু হয়ে গেছে গোলমাল। মনে হলো, ছুরিটা তুলে নিয়ে ধাঁ করে এক কোপ বসিয়ে দেয় চাচীর ঘাড়ে। বড় বেশি যন্ত্রণা দেয় ওকে মহিলা। কথায় কথায় শাসন, এটা করতে পারবিনে, ওটা করা চলবে না। খালি হুকুম আর হুকুম। বসে থাকতে দেখলেই হলো, আর সহ্য হয় না, ওমনি কাজে লাগানোর ফন্দি। খাটাতে খাটাতে জান কাবার। অতবড় একজন অত্যাচারী মহিলাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। ছুরিটা ধরার জন্যে হাতটা নিশপিশ করতে লাগল ওর।

চোখের সামনে একটা লাল তারা ফুটল। তারপর কালো। আবার লাল।

ছুরি নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াতে যাবে সে, এই সময় ঘুরে দাঁড়ালেন চাচী। পোচ করা ডিম প্লেটে করে এনে রাখলেন ওর সামনের টেবিলে। আরেকটা প্লেটে টোস্ট সাজিয়ে দিলেন।

ডিমটার দিকে তাকাল সে। সাদা অংশের মাঝে হলুদ আস্ত

কুসুমটা রূপ পরিবর্তন শুরু করল। মনে হলো বিশাল এক চোখ। অনেক বড় চোখের হলুদ মণি। ওর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে হাসছে। ডিমভাজা আর টোস্টের সুগন্ধ আর সুগন্ধ লাগছে না এখন, মনে হচ্ছে গা গুলিয়ে ওঠা তীব্র দুর্গন্ধ।

কানের মধ্যে ঝড়ের গর্জন শুরু হয়ে গেছে। মাথার ভেতর হা-হা করে অট্টহাসি হাসছে পাগলটা। দুলতে আরম্ভ করেছে ঘর, ঘরের সমস্ত জিনিস।

'কি হলো, খাচ্ছিস না?'

মেরিচাচীর কথায় যেন প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল সে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'অ্যাঁ!...হ্যাঁ, খাচ্ছি!' একটা টোস্ট তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল।

'শরীর খারাপ নাকি তোর?'

'না, খারাপ না। রাতে ঘুম হয়নি।'

'রাতে ঘুম না হওয়াটাই তো খারাপ। অসুখ না করলে ঘুম হবে না কেন?'

এই শুরু হলো! জবাব যাতে না দিতে হয় সেজন্যে তাড়াতাড়ি খাবার মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল। তাতেও হয়তো সহজে রেহাই পেত না, বাঁচিয়ে দিল টেলিফোন।

মেরিচাচী ধরলেন। ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'মুসা।'

উঠে গিয়ে ধরল কিশোর। 'বলো।'

'কাল রাতে নাকি এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ?'

অবাক হলো কিশোর, 'কি কাণ্ড?'

'রবিনকে নিয়ে নাকি ব্ল্যাক ফরেস্টের এক পুরানো মিলে গিয়েছিলে। রাতের বেলা চাকায় চড়ার শখ হয়েছিল। খানিক আগে ফোন করে জানিয়েছে আমাকে ও। তোমার চাচার নতুন গাড়িটারও নাকি বারোটা বাজিয়েছ লাইট পোস্টে ধাক্কা লাগিয়ে।'

তাই তো! আবছাভাবে দৃশ্যগুলো খেলে গেল মনের পর্দায়। ভুলেই গিয়েছিল গাড়িটার কথা। রাতে ফিরে এসে গাড়িটা ঢুকিয়ে রেখেছে গ্যারেজে। চাচা নিশ্চয় এখনও দেখেননি। তাহলে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যেত এতক্ষণে।

আচমকা অকারণেই একটা রাগ ফুঁসে উঠল মগজে। আমার চাচার গাড়ি আমি নষ্ট করেছি, মুসার কি? ও এ ভাবে কথা বলবে কেন?

'অ্যাই কিশোর, শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।'

'শরীর এখন কেমন তোমার?'

'অ্যাঁ? ভাল। কেন?'

'জিমনেশিয়ামে আসবে নাকি আজ? চুং আসবে। আমরা দুজনে মিলে রেডভিলের সঙ্গে ফাইট করব।'

চুং-এর নাম শুনে রাগটা আরও বেড়ে গেল কিশোরের। ও, মুসাও তাহলে খাতির করে ফেলেছে ওই ছেলেটার সঙ্গে! ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনে। তাকাল র‍্যাকে রাখা ছুরিগুলোর দিকে। না, ছুরি নয়, অন্য কোনভাবে। মুসাকেই আগে শেষ করতে হবে।

চোখের সামনে লাল তারকা। কানের মধ্যে ঝড়ের গর্জন।

'কিশোর, কি হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল মুসা। 'থেকে

থেকে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছ?'

'না, কোথাও না।...মুসা, কথা আছে তোমার সঙ্গে। আসতে পারবে?'

'পারব। ইয়ার্ডে?'

'না। অন্য কোনখানে। দেখা করা দরকার।'

'কোথায়?'

'কোথায়!' ভাবতে লাগল কিশোর। 'এই তোমাদের বাড়ির কাছেই কোথাও। ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না। কোন খোলা জায়গায় চলে যাই চলো। রেড রিভারের ধারে?'

'মন্দ হয় না। চলো। জিমনেশিয়ামে যাব বিকেলে। চুংকে বলেছি চারটের দিকে হাজির থাকতে। অনেক সময় আছে এখনও।'

আবার চুং! আগুন জ্বলে উঠল কিশোরের মাথার মধ্যে। দুলে উঠল ঘরটা। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, রেড রিভারের ধারেই আসছি। তোমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে যে পাহাড়টা আছে, ওটার গোড়ায়। নাস্তা খেয়েই চলে আসছি আমি। দেরি হবে না।'

'আচ্ছা। আমি থাকব।'

ষোলো

কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে সূর্য। মেঘের ফাঁক ফোকর দিয়ে সূর্যরশ্মি বেরিয়ে এসে ধূসর আলোর বর্শা সৃষ্টি করেছে কোথাও কোথাও। বাতাস স্তব্ধ। ঝড়ের সঙ্কেত।

মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে কিশোর। পাহাড়ের গোড়ায় পথের ধারে স্ট্যান্ডে তুলে রেখে হেঁটে ওপরে উঠতে শুরু করল। পাথরের ছড়াছড়ি। সাবধান না থাকলে পা হড়কে যেতে পারে। পেছনে নীরব বন আকাশের মেঘের মতই কালো।

আশেপাশে কেউ নেই।

চূড়ায় উঠে এল সে। একজায়গায় পাথরের একটা চাতাল ঠেলে বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে। ওটাতে দাঁড়িয়ে নিচে নদীর বাদামী পানির দিকে তাকাল। স্রোত খুব বেশি। পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে পানি। বাঁকগুলোতে বাড়ি খেয়ে বয়ে যাওয়ার সময় সৃষ্টি করছে অসংখ্য ঘূর্ণি। স্রোতের কুলকুল ধ্বনি এখান থেকেও কানে আসছে।

নদীটা ওর খুব পছন্দ। প্রায়ই আসে ওরা তিন বন্ধুতে এখানে বেড়াতে। পিকনিক করতে। রেড রিভারের ধারে পাহাড়টা

এখানেই সবচেয়ে উঁচু। নদীর ওপারে একটা শহর, ছড়িয়ে আছে অনেকটা ছবির মত। দূর থেকে এত খুদে দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে খেলনা বাড়িঘর। নদীর উৎসের দিকে তাকালে চোখে পড়ে বনে ছাওয়া বিশাল পর্বতমালা; দূর থেকে দেখায় মেঘের মত, যেন দিগন্তরেখায় মেঘ জমে আছে লম্বা হয়ে।

জায়গাটা বড়ই শান্ত। পেছন ফিরে তাকাল। রকি বীচ শহরটা দেখা যাচ্ছে। খুব কাছে, অথচ মনে হচ্ছে বহুদূরে ফেলে এসেছে। চোখের সামনে লাল তারকা। ঝিলিমিলি। পলকের জন্যে মনে হলো তার, পাহাড়ের চূড়ায় নয়, শূন্যে ভাসছে সে, ভেসে বেড়াচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে।

এক পা পিছিয়ে এল সে। ঘড়ি দেখল। মুসা আসছে না কেন?

অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে কিশোর। আকাশের দিকে তাকাল। মেঘগুলো যেন ঝুলে রয়েছে ঠিক তার মাথার ওপর। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি। ভাপসা গরম। ঘাম বেরোতে না বেরোতে শুকিয়ে আঠা হয়ে যাচ্ছে।

দরদর করে ঘামছে ও। পিঠের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে পাতলা কাপড়ের শার্ট। ঘাড়ের কাছে অদ্ভুত সুড়সুড়ি।

মুসা, এসো, চলে এসো জলদি—মনে মনে ডাকল সে। তোমার জন্যে কি চমক অপেক্ষা করছে দেখতে চাও না? তোমাকে একটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব আমি। কিভাবে উড়তে হয় শিখিয়ে দেব। কঠিন হাসিতে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল ওর। প্রথমে ওড়া শেখাব, তারপর ডোবা। নদীতে যা স্রোত, তোমার মত সাঁতারুও বাঁচতে পারবে না।

গাড়ির এঞ্জিনের ভটভট শব্দ কানে এল। মুসার রকি বীচ-বিখ্যাত জেলপি। প্রথম যখন কিনেছিল, ভয়াবহ শব্দ তুলে রাস্তায় ছুটে যেত গাড়িটা, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত পথচারীরা। এখন আর থাকে না। পরিচিত মানুষেরা জেনে গেছে, ওটা মুসার। কানে এলেই মুচকি হাসে। বুঝতে পারে, মুসা আমান যাচ্ছে।

মোটর সাইকেলের কাছে গাড়ি রাখল সে। টকটকে লাল একটা গেঞ্জি গায়ে। ওর কালো শরীরে ফুটেছে ভাল রঙটা। খুলি আঁকড়ে থাকা খাটো নিগ্রোসুলভ চুলে যেন আকাশের কালো মেঘের রঙ। ওপর দিকে চোখ তুলে তাকাল। কিশোরকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল। উঠে আসতে শুরু করল।

'ইস্, কি গরমরে বাবা!' কাছে এসে বলল সে। 'আমি ভেবেছিলাম ওপরে ঠাণ্ডা হবে। কই? আরও বেশি।'

চিন্তা কোরো না, কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—মনে মনে বলল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল, 'হুঁ, বাতাস একেবারেই নেই। গাছগুলো দেখো। একটা পাতাও নড়ছে না।'

বনের দিকে তাকাল মুসা। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। 'কি এমন কথা যে বলার জন্যে এখানে ডেকে আনতে হলো?'

হাসল কিশোর। 'ঘরে ভাল লাগছিল না, আসতে ইচ্ছে করল, চলে এলাম। কথা বলতে সুবিধে হবে ভেবে।'

আকাশের দিকে তাকাল মুসা। ভারী মেঘের দিকে চোখ রেখে বলল, 'ভিজে চুপচুপে হয়ে যাব।'

'ভালই লাগবে। পাহাড়ের ওপর বসে গরমের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে।' পাথরের চাতালটার দিকে এক পা এগোল কিশোর।

মুসা গেল তার পেছনে। 'আজকে তোমার শরীরটা অনেক ভাল মনে হচ্ছে। রকহিল ক্যাম্পে যা খেলটা দেখিয়েছ না!'

হ্যাঁ, ভালই লাগছে—মনে মনে বলল কিশোর—কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরও অনেক বেশি ভাল লাগবে।

'তোমাকে আর কি বলব,' মুসা বলল, 'ওই ক্যাম্পটা আমারও জঘন্য লেগেছে। একেবারে কুফা। একের পর এক এমন সব অ্যাক্সিডেন্ট...আর দুচারদিন থাকলে আমিও অসুস্থ হয়ে যেতাম।'

'ও'কনরের দাঁত ভাঙতে দেখতে তোমার ভাল লাগেনি, তাই না?'

'লাগার কি কোন কারণ আছে? তার ওপর চুং-এর যন্ত্রণা। ওটা একটা ভাঁড়।'

'ভাঁড়ের সঙ্গেই তো মিশলে গিয়ে আবার?'

'জুটি বানিয়ে দিলেন হু-ইয়ান। কি করব?...ওহ্হো, রোজই ভাবি একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে, ভুলে যাই...আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, ওর পানি এত গরম করে দিল কে? বেণিটাই বা কে কাটল? আমি তো কিছু করিনি, শিওর। তাহলে কে? বিরাট একটা রহস্য না? আমাদের ওপর দোষ চাপিয়ে হেনস্থা করার জন্যে ও নিজেই এ সব করেনি তো?'

'করতে পারে, অসম্ভব কি?' নিচু স্বরে বলল কিশোর। 'কিংবা আরও একটা ব্যাপার হতে পারে—পানির গরম হয়তো স্বাভাবিকই ছিল, ও ইচ্ছে করে চিৎকার করেছে। স্রেফ অভিনয়। আমাদের বোকা বানানোর জন্যে।'

'তাহলে বেণি কাটার ব্যাপারটা?'

'নিজেই কেটেছে। হু-ইয়ানের চোখে আমাদের খেলো করার জন্যে। যখন দেখেছে হু-ইয়ান আমাদের অন্য চোখে দেখেন, সহ্য হয়নি ওর।'

'তাতে লাভটা কি?'

'আমাদের যাতে লাথি মেরে দল থেকে বের করে দেন হু-ইয়ান। একচেটিয়া রাজত্ব করতে পারবে সে তখন।'

'কিসের রাজত্ব? একা একা তো কোন টীমের সঙ্গেই খেলতে পারবে না সে।'

'বুঝলে না? তুমি থাকলে ও নিজেকে হিরো বানাতে পারবে না। তুমিই হলে ওর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, যাকে সে তোয়াক্কা করে। তোমাকে সরাতে পারলে ওর আর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ রইল না...'

'কি জানি বাপু! যুক্তিগুলো মোটেও জোরাল মনে হচ্ছে না আমার। এ সব কারণে যদি নিজের বেণি কেটে থাকে ওকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না আমি।'

'আর কি হলে জোরাল মনে হত তোমার!' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের কণ্ঠ। 'আমি কেটেছি ভাবছ? আমাকে সন্দেহ করো তুমি?'

'না না,' তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল মুসা, 'তোমাকে সন্দেহ করব কেন? আমিও করে থাকতে পারি।' হাতের দিকে তাকাল। আঁচড় লেগেছিল যেখানে, কোন দাগই নেই আর। 'হয়তো মায়ানেকড়ের শয়তান ভর করে আমার ওপর। অকাজ করি, তারপর ভুলে যাই...'

'হতেও পারে।' বৃষ্টির বড় একটা ফোঁটা পড়ল কিশোরের কপালে। অনেক বকবক করা হয়েছে—ভাবল সে। আসল কাজটা

সেরে ফেলা দরকার। আরেক দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'শয়তান একটা ঘোরাঘুরি করছে আমাদের মধ্যে।' আরেকটা ফোঁটা পড়ল চাঁদিতে। আরও একটা, কাঁধে।

'হুঁ!' গম্ভীর হয়ে গেল মুসা। 'তোমার কি বিশ্বাস, ম্যানিটোর জীবাণু সত্যি সত্যি এখনও রয়ে গেছে আমার রক্তে? অনেক দিন তো হয়ে গেল। এখনও কোন মানুষকে খুন করলাম না কেন তাহলে?'

'আট বছরের চক্রে বাঁধা পড়েছ হয়তো। খুন অবশ্যই করবে। আট বছর পর। যেহেতু জীবাণুগুলো বাসা বেঁধে আছে রক্তে, মাঝে মাঝে রোগের আক্রমণের শিকার হও, কিছুটা হলেও হিংস্র হয়ে ওঠো তখন, নিজের অজান্তেই...'

'যাহ্, শুরু হয়ে গেল,' হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। বড় বড় ফোঁটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। 'এখানে দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে চলো গাড়িতে গিয়ে বসি।'

'চলো,' রাজি হয়ে গেল কিশোর। 'রাখো, আরেকটু দাঁড়াও। বৃষ্টির সময় নদীটাকে কেমন লাগে দেখি।' চাতালের আরও কিনারে গিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল সে। 'আরি, ওটা কি? কুমির নাকি? এ নদীতে তো কখনও কুমির আছে বলে শুনিনি!'

'খাইছে! বলো কি?' মুসাও এসে দাঁড়াল ওর পাশে। ঝুঁকে নিচে তাকাল। 'কই? কোথায়?'

'ওই যে ওখানে,' বলে মুসার পিঠে হাত রেখে জোরে এক ঠেলা মারল কিশোর।

তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে। পাগলের মত

শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেমে যাচ্ছে নিচে। ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে। অনেক ওপরে থাকায় আর বৃষ্টির আওয়াজে পড়ার শব্দটা ভালমত শুনতে পেল না কিশোর। হাসতে শুরু করল। ভয়ঙ্কর পাগলের অট্টহাসি। খুনে পাগল।

সতেরো

'যাহ্, একটা শয়তান গেল!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

বৃষ্টি পড়ছে। তবে খুব বেশি নয়। মোটামুটি। চাতালে দাঁড়িয়ে নিচে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে সে। আগের মতই পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে বাদামী পানির স্রোত।

'মুসা খতম!' আবার বলল সে। হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'না, দাঁড়াও!'

দ্বিধা করল সে।

'আমার যাওয়া দরকার। মুসা তো মারা গেছে। এবার রবিনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

আবার কে যেন বলে উঠল মাথার ভেতর থেকে, 'না!'

হাসি মুছে গেল কিশোরের। সরু হয়ে এল চোখের পাতা।

'না!' আবার বাধা দিল মগজের ভালমানুষটা।

বৃষ্টি বাড়ছে। মাটিতে ফোঁটা পড়ার টুপটাপ এখন ঝরঝর শব্দে পরিণত হয়েছে। বৃষ্টিকে যেন শোনাল কিশোর, 'রবিনকে খতম করতে হবে।'

'না!' আবার বলল প্রতিবাদী মগজটা। ওই অংশটা রোগাক্রান্ত হয়নি। কিংবা বলা যেতে পারে, বিবেক বলে যে জিনিসটা আছে, সেটাকে এখনও পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি ডক্টর মুনের ভয়াবহ ড্রাগ। সেটাই প্রতিবাদ জানাচ্ছে। শয়তানকে ধ্বংস করে নিজের ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

'না! আর আমি এ সব ঘটতে দেব না!' বিবেকের কণ্ঠ জোরাল হলো।

'কিন্তু কন্ট্রোল এখন আমার হাতে!' চিৎকার করে উঠল মানব-মনের আদিম শয়তান। মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই বংশ পরম্পরায় যেটা বাস করে আসছে মগজে। যেটার কারণে খারাপ কাজ করে মানুষ। কিশোরের ক্ষেত্রে সেটাকে খুঁচিয়ে আরও জাগিয়ে তুলেছে ডক্টর মুনের মারাত্মক ওষুধ। 'সরো! জলদি সরো এখান থেকে!'

'না!' সমান তালে চিৎকার করে উঠল বিবেক। 'আমি তোমার কথা শুনব না।'

'সরো বলছি!' মনের গভীর থেকে লড়াই শুরু করল শয়তান। চাবুক হেনে বিদেয় করতে চাইল বিবেককে।

মুসার মৃত্যুটা বেদনা জাগাতে আরম্ভ করল কিশোরের মনে। যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটাল এইমাত্র তার জন্যে অনুশোচনা শুরু হলো। বুঝতে পারছে, যা করার এক্ষুণি করতে হবে, বিবেকের দংশন বহাল থাকতে থাকতে। নইলে আরও কত প্রিয়জনের যে সর্বনাশ করবে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই।

'সরো!' চিৎকার করে উঠল ভেতরের শয়তান। 'জানো, আমি কত পুরানো? হাজার বছর, লক্ষ লক্ষ বছর বয়েস আমার। মানুষের

জন্মের শুরু থেকেই আমি বাসা বেঁধে আছি তার মগজে।'

'আমিও তোমার মতই পুরানো!' বিবেকও চিৎকার করে উঠল। 'তোমাকে দমানোর জন্যে, তোমাকে ঠেকিয়ে মানুষকে রক্ষা করার জন্যেই আমিও আছি। তুমি শয়তান। তুমি অন্ধকার। আমি আলো। আলোর সঙ্গে লড়াই করে কখনও টিকতে পারে না অন্ধকার। তুমি এখন যাও।'

'না!'

মাথা ঘুরছে কিশোরের। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু। আকাশ, পাহাড়, বন, সব ঘোলাটে।

চোখ মুদল সে। মনে হচ্ছে বাস্তবে নেই। হালকা হয়ে গেছে শরীরটা। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যেই নিজেকে বলতে শুনল, 'আমাকে মরতে হবে! মানুষকে বাঁচাতে হলে আমাকে মরতে হবে! এক্ষুণি!'

তার মগজের অন্য একটা অংশ বলল, 'না না, মরো না! মরার সময় এখনও তোমার হয়নি! তোমার বয়েস এখনও অনেক কম!'

'মরো!' বলল বিবেক। 'তোমার সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলো ভেতরের শয়তানটাকে!'

'না! আমি মরতে পারব না! আমার ভয় করছে! আমি বাঁচতে চাই!'

'তুমি আগেই মরে বসে আছ! ডক্টর মুন যখন ইনজেকশন দিয়েছিল, তখন থেকেই তুমি শেষ। তোমার ভেতরের ওই শয়তান তোমাকে শান্তিতে বাঁচতে দেবে না। এখনও সময় আছে। প্রিয়জনকে বাঁচাতে হলে, নিরপরাধ অসংখ্য মানুষের বিপদের কারণ

হতে না চাইলে, চিরকালের জন্যে শান্তি পেতে চাইলে আত্মহত্যা করো। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই তোমার জন্যে।'

'সরো!' চিৎকার করে উঠল ভেতরের শয়তান। 'চাতালের কাছ থেকে সরে যাও!'

'না!' তীব্র চিৎকার করে উঠল কিশোর। এতক্ষণ মগজের ভেতর তর্কাতর্কি চলছিল। এখন মুখ দিয়ে চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এল তার বিবেক। পানির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুসা, ভাই আমার, আমাকে মাপ করে দাও! আমি তোমাকে মারতে চাইনি!'

'কিন্তু আমি চেয়েছি,' বলল ভেতরের শয়তানটা। 'তুমি মরতে চাইলেও আমি চাই না। আমি বাঁচব। সরো! জলদি সরে যাও এখান থেকে! তোমাকে বিশ্বাস নেই, কখন ঝাঁপ দিয়ে বসো পানিতে!'

'ঠিক, পানিতেই ঝাঁপ দেব আমি,' বলে উঠল বিবেক। চাতালের কিনারে এগিয়ে গেল কিশোর। নিচে তাকাল।

স্রোতের দিকে তাকিয়ে দুরুদুরু করে উঠল বুক। রক্তচাপ বেড়ে গেল। মনে হলো মাথার চাঁদি ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে রক্ত।

'না না, আমি পারব না!' চিৎকার করে উঠল সে। 'বয়েস আমার খুবই অল্প। মরতে আমি পারব না!'

এক পা পিছিয়ে গেল সে।

শয়তানের বিজয় হচ্ছে।

'না, আমি মরতে পারব না!' বিড়বিড় করে আবার বলল সে।

'এতক্ষণ ধরে সেকথাই বোঝাচ্ছি তোমাকে,' বলল ভেতরের শয়তান। 'কোনমতেই মরা উচিত হবে না তোমার। আর তোমার কি দোষ? মানুষের ভেতর আমি বেঁচে আছি সেই অনাদিকাল

থেকে। অতীতে ছিলাম। বর্তমানে আছি। ভবিষ্যতেও থাকব আমরা। মিলেমিশে।'

হেরে যাচ্ছে বিবেক।

'চলো, চলে যাই,' শয়তান বলল, 'অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের।'

নিতান্ত বাধ্য ছেলের মত আরও এক পা পিছিয়ে গেল কিশোর। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। শয়তানের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করছে বিবেক।

আচমকা মনের সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে একত্রিত করে, কালো আকাশের দিকে দুহাত তুলে, চোখ মুদে, কারাতে যোদ্ধাদের মত ইয়া-শিঁ চিৎকার দিয়ে, শয়তানটা আবার বাধা দেবার আগেই সামনে ছুটে গেল।

ঝাঁপ দিল চাতাল থেকে।

পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন মনে হলো। তীব্র গতিতে নেমে যেতে লাগল নিচের দিকে। এ সময়টায় একটানা চিৎকার বেরোতে থাকল মুখ থেকে। চিৎকার করছে মগজের শয়তান। চিৎকার করছে মানুষের চিরন্তন বেঁচে থাকার বোধ।

ঝপাৎ করে শব্দ হলো। ডুবে গেল বাদামী জলস্রোতে।

না, স্বপ্ন নয়। ভয়ঙ্কর বাস্তব। মরতে চলেছে সে।

'বাঁচব! আমি বাঁচতে চাই!' চিৎকার করে উঠল ভেতরের শয়তান।

কিন্তু ভাসতে পারছে না কিশোর। তলিয়ে যাচ্ছে আরও গভীরে। মাথা তোলার চেষ্টা করেও পারল না। একটানে স্রোত

নিয়ে গিয়ে ফেলেছে ওকে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে। হাত-পা ছুঁড়ে ওপরে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। পারল না।

নিচের দিকে টানছে ওকে পানির ভয়ানক ঘূর্ণি। টেনে নামিয়ে নিচ্ছে...নিচে...নিচে...আরও নিচে...

দম নেয়ার জন্যে হাঁ করল সে। কাদামাখা ঘোলাটে পানি ঢুকে গেল মুখের ভেতর। পানির স্বাদ যে এতটা বিশ্রী হতে পারে, জানা ছিল না।

মগজে খেলে যাচ্ছে নানা কথা: দম আটকে আসছে! মারা যাচ্ছি আমি!...কিন্তু মরতে চাই না!...আমি বাঁচতে চাই!...ডুবে মরা খুব কষ্টের!...আমি মরতে চাই না!...আমি বাঁচব!...আমি বাঁচব!... আমি বাঁচব!

কিন্তু কোন উপায় নেই বাঁচার, বুঝতে পারছে।

আবার হাঁ করে দম নিতে গেল। মুখে ঢুকে গেল কাদামাখা পানি। জঘন্য স্বাদ। কিছুটা ভেতরে ঢুকল, কিছু গেল গলায় আটকে। দুচোখ মেলে রেখেছে। ঘোলাটে গভীর পানিতে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

বুকে প্রচণ্ড চাপ। গরম লাগছে। ঠাণ্ডা পানিতেও প্রচণ্ড গরম। মনে হচ্ছে ফুটতে শুরু করেছে নদীর পানি। বুকে আর মাথায় যেন আগুন জ্বলছে।

মৃত্যু আসছে! মৃত্যু!

অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। নড়ানোর সামর্থ্য হারাচ্ছে। চোখের সামনে অন্ধকার বাড়ছে। চিন্তাশক্তি হারাচ্ছে মগজ।

ভেসে ওঠার শেষ চেষ্টা করল আরেকবার।

তারপর অন্ধকার...অন্ধকার...শুধুই অন্ধকার...

বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। ঝমঝম, ঝমঝম। ভুস করে ভেসে উঠল একটা দেহ। কিশোরের দেহ। ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে এসেছে। পাক থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পানিই ধাক্কা দিয়ে ওপরে তুলে দিয়েছে ওকে।

নড়ছে না ও। নিথর একটা কাটা কলাগাছের মত ভেসে চলেছে স্রোতের টানে। ঢেউ আর বৃষ্টিতে শরীরটা ডুবছে-ভাসছে, ডুবছে-ভাসছে। একেবারে ডুবে যাচ্ছে না। তারমানে ফুসফুসে বাতাস ঢুকে গেছে।

আঠারো

আচমকা ধাক্কায় ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে পানিতে পড়েছে মুসা। বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আঘাতের প্রথম ধাক্কায় ক্ষণিকের জন্যে অসাড় হয়ে গেল দেহ। ডুবে গেল। ওই অবস্থায়ই স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। স্রোতের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না।

ঠাণ্ডা পানিতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সামলে নিল সে। হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠতে লাগল ওপরে। মুখ তুলে তাকাল। চাতালের ওপর দেখতে পেল কিশোরকে। একবার এগোচ্ছে, একবার পিছাচ্ছে।

বিস্ময়ের ঘোরটা এখনও কাটেনি মুসার। ওকে এ ভাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কেন কিশোর?

ঘোর কাটতে সময় লাগল না। দেখতে পেল চাতালের কিনার থেকে কিশোরও ডাইভ দিয়ে পড়ল। তবে যে ভাবে পড়ল, সেটাকে ঠিক ডাইভ দেয়া বলে না। সোজা দৌড়ে এসে হাত-পা ছেড়ে দিল।

চোখে বৃষ্টি পড়ছে। ওপর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে

অসুবিধে হচ্ছে। তবু কিশোর কোনখানে পড়েছে খেয়াল রেখেছে সে। পড়েই ডুবে গেল দেহটা। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেদিকে সাঁতরে চলল মুসা।

ভয়ানক স্রোত। ওর মত দক্ষ আর শক্তিশালী সাঁতারুরও প্রতিটি ইঞ্চি এগোতে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

নাহ্, এ ভাবে হবে না। ওপর দিয়ে এগোতে পারবে না। কিশোর যেখানে পড়েছে আন্দাজে সেই জায়গাটা লক্ষ করে ডুব দিল। ডুব-সাঁতার দিয়ে এগোল।

সাঁতার কাটছে আর একই সঙ্গে অস্পষ্টভাবে ভাবনা চলেছে মগজে, এ রকম একটা কাণ্ড কেন করল কিশোর? মজা করার জন্যে করেনি এ কাজ। অন্য কোন ব্যাপার আছে। মারাত্মক কিছু।

কিছুদূর এগিয়ে দম ফুরিয়ে আসতেই পানিতে মাথা তুলল মুসা। কোথাও দেখতে পেল না কিশোরকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। পড়ার সময় বুকে কিংবা পিঠে যদি পানির আঘাত লাগে, বেহুঁশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তাহলে আর বাঁচতে পারবে না। পানিতে ঘুরপাক খেতে থাকা কোন একটা ঘূর্ণি টান দিয়ে নিচে নিয়ে গেলে ভেসে ওঠার আর শক্তি থাকবে না।

পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা। ঠিক এই সময় মনে হলো পানির নিচ থেকে কি যেন একটা ভেসে উঠল। বৃষ্টির চাদরের জন্যে ভালমত দেখতে পেল না। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর! কিশোর!'

জবাব এল না।

ডাক দিতে গিয়ে মুখ খুলতে হয়েছে ওকে। হাঁ করা মুখে ঢুকে

গেছে ভয়ানক বিস্বাদ কাদামাখা ঘোলা পানি। ফুচুৎ করে মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলল সেটা। বিকৃত করে ফেলল চেহারা।

আবার তাকাল যেদিকে দেহটা দেখা গিয়েছিল। কিছু নেই আর।

তবে কি দেখেনি? মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মত কোন ব্যাপার? ভুল দেখেছে বৃষ্টির মধ্যে?

আকাশের দিকে মুখ তুলে আবার চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, কোথায় তুমি? জবাব দাও! প্লীজ!'

আবার পানি ঢুকে গেল মুখে। চিৎকারটা জোরাল হলো না। তার ওপর রয়েছে পানিতে বৃষ্টি পড়ার একটানা শব্দ। দশ হাতের মধ্যে থাকলেও এই ডাক শুনতে পেত না কিশোর।

চোখের কোণ দিয়ে আবার দেখতে পেল কালো একটা কি যেন। স্রোতে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। ঝট করে ফিরে তাকাল সেদিকে।

দেহই! মানুষ! কিশোরের শার্টটা চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল মুসা।

আবার পানি ঢুকে গেল মুখে। কেয়ারই করল না। ফুচ করে পানিটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে সাঁতরে চলল সেদিকে। মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর কোনমতেই চোখের আড়াল করতে চায় না কিশোরকে।

অবশেষে পৌঁছে গেল দেহটার কাছে। হাত বাড়িয়ে কাপড় খামচে ধরল। মৃত কি জীবিত, দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। পানিতে ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করে কিভাবে তীরে টেনে নিয়ে

যেতে হয় জানা আছে ওর। চিত হয়ে নিজেকে ভাসিয়ে রেখে নিথর দেহটাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। পা দুটোকে ব্যবহার করছে অনেকটা প্রপেলারের মত।

ইতোমধ্যে একটিবারের জন্যে নড়ল না কিশোর। মরে গেছে! ও আর বেঁচে নেই! মনের মধ্যে তীব্র ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠল মুসার। অনেক কষ্টে তীরের বালিতে কিশোরকে টেনে তুলল সে। টলমল করছে পা। দাঁড়ানোর শক্তি নেই, এতটাই ক্লান্ত। হাঁ করে দম নিচ্ছে। গায়ের ওপর সমানে আঘাত হানছে শীতল বৃষ্টির ফোঁটা।

জোরে জোরে বার কয়েক দম নিয়েই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মুসা। কিশোরের চোখ আধবোজা। প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। নিজের অজান্তেই ফুঁপিয়ে উঠল মুসা। উপুড় করে শোয়াল চিত হয়ে থাকা কিশোরকে। পিঠের ওপর হাঁটু তুলে দিয়ে চাপ দিতে লাগল জোরে জোরে। কান্না ঠেকাতে পারছে না। কারণ জানে, এ সব করে লাভ নেই। মরে গেছে ওর প্রিয় বন্ধু।

কাঁদছে আর চাপ দিয়ে চলেছে মুসা।

চাপ দিচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছে।

কিছুই ঘটল না। প্রাণের কোন লক্ষণ ফুটল না কিশোরের দেহে।

আবার চাপ। আবার ছেড়ে দেয়া। চাপ...ছাড়া...চাপ...ছাড়া!

আচমকা গলগল করে একগাদা বাদামী পানি বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ দিয়ে।

আরও জোরে চাপ দিতে লাগল মুসা। ফোঁপানো বন্ধ করতে

পারছে না। চোখ দিয়ে বেরোনো নোনা পানি মিশে যাচ্ছে বৃষ্টির পানির সঙ্গে।

আবার ঘুড়ুৎ করে বাদামী পানি বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ দিয়ে।

নড়ল না কিশোর। মরে গেছে। নড়বে কি?

কিন্তু চাপ বন্ধ করল না মুসা। পানি বেরোল না আর।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

নাহ্, আর লাভ নেই। বসে পড়ল বালিতে। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে একেবারে শুয়েই পড়ল। আকাশের দিকে চোখ। বৃষ্টির ফোঁটা আঘাত হানছে খোলা চোখে। ব্যথা লাগছে। লাগুক। যা হয় হোক। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক। পরোয়া করে না আর সে।

কিন্তু এ রকম একটা কাণ্ড কেন করল কিশোর? কেন এ ভাবে আত্মাহুতি দিল? দেয়ার আগে তাকেই বা এভাবে ঠেলে ফেলে দিল কেন?

অদ্ভুত রহস্যময় একটা ব্যাপার। কোন জবাব খুঁজে পেল না মুসা।

কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কিশোরের মৃত্যুটা। কেবলই মনে হচ্ছে, বেঁচে আছে সে। এ ভাবে, এত সহজে মরে যেতে পারে না।

শুয়ে থাকতে পারল না সে। কয়েক সেকেন্ড পর আবার উঠে বসল। আবার হাঁটু তুলে দিল কিশোরের পিঠে। চাপ দিতে লাগল।

তৃতীয়বারের মত পানি বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ দিয়ে। তার

সঙ্গে মিশে আছে হলদে তরল, পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক জুস।

নড়ে উঠল কিশোর। কাশি দিল। চোখ মেলল।

চোখের সামনে দেখতে পেল বালি। ঘাস। পাথর। কাদা। সব অস্পষ্ট। চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে। পাপড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে মণির ওপর পর্দা সৃষ্টি করছে পানি।

চোখ মিটমিট করল সে। গলগল করে বমি করল গ্যাস্ট্রিক জুস মেশানো বাদামী পানি। তীব্র দুর্গন্ধ তাতে।

'কিশোর! কিশোর!'

কোন্খান থেকে আসছে চিৎকারটা?

মাথা তুলল কিশোর। ফিরে তাকাল। হাঁটু গেড়ে পাশে বসে আছে মুসা।

'মুসা!'

হাসল মুসা। 'বেঁচে গেছ!'

'মুসা, তুমিও বেঁচে আছ!'

জবাব দেয়ার চেষ্টা করল মুসা। কিন্তু আবেগে ধরে এল গলা। কথা বের করতে পারল না।

ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরল কিশোর। 'আমাকে মাপ করে দাও! তুমি বেঁচে আছ! আর আমার কোন দুঃখ নেই!'

'মরে গেলে কোনদিন আমি তোমাকে মাপ করতে পারতাম না। বেঁচে গেছ বলেই করলাম!'

উঠে বসার চেষ্টা করল কিশোর।

বাধা দিল মুসা, 'না না, শুয়ে থাকো। জিরিয়ে নাও। তারপর আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, তাই যেয়ো। ডাক্তারের কাছে আমার অবশ্যই যাওয়া দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সকালে উঠেই রওনা হচ্ছিলাম। কিন্তু মাথার ভেতরের শয়তানটা আক্রমণ করে বসল। যাওয়া আর হলো না। শোনো, মাথা এখন ঠিক আছে আমার। ঠিক থাকতে থাকতে বলে ফেলি। ডক্টর মুনের ইনজেকশন আমার রক্তে পাগলের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। সব সময় জাগে না, মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। তখন আর মানুষ থাকি না। এখনই যদি আবার জাগে, আমি যত পাগলামিই করি না কেন, ছাড়বে না; সোজা ধরে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। আমার চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

'বুঝেছি। আর বলতে হবে না। কালরাতে তুমি রবিনকেও খুন করতে নিয়ে গিয়েছিলে, এতক্ষণে পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে। তুমি নও, তোমার মগজের পাগলটা। আমাকেও সেই পাগলটাই ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল। তুমি নও।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম। শুধু তোমার কারণে, মুসা। ভাগ্যিস পানিতে ফেলার জন্যে তোমাকেই ডেকে এনেছিলাম। রবিনকে আনলে সে-ও মরত, আমিও মরতাম। এই স্রোত থেকে ও আমাকে বাঁচাতে পারত না। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, মুসা।'

'আমিও কৃতজ্ঞ।'

অবাক হলো কিশোর, 'কেন?'

'তুমি যে মরোনি, বেঁচে গেলে।' আবার হাসল মুসা। ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত।

মুসার হাতে আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল কিশোরের

আঙুলগুলো। চোখের কোণে পানি। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। মুখে বৃষ্টির পানি লেগে থাকায় বোঝা গেল না সেটা।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। 'মেঘ কেটে যাচ্ছে। উঠতে পারবে? চলো, আগে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

উনিশ

এক মাস পর। রকি বীচ স্কুলের জিমনেশিয়াম। প্র্যাকটিস করছে ছেলেরা। করাচ্ছেন ইন্‌স্ট্রাক্টর মিস্টার হু-ইয়ান। তিন গোয়েন্দা আছে। চুংও আছে।

রকহিল ক্যাম্পে চুং-এর ওপর যে সব অত্যাচার করা হয়েছে, মাপ করে দিয়েছেন হু-ইয়ান। বরং কিশোরের রোগটা সেরে যাওয়ায় আন্তরিক খুশি হয়েছেন।

পনেরো দিন হাসপাতালে আটকে রাখার পর কিশোরকে ছেড়েছেন ডাক্তার। রক্ত পরীক্ষা করে রীতিমত চমকে গিয়েছিলেন তিনি। অদ্ভুত এক রাসায়নিক পদার্থ দেখতে পেয়েছেন। অ্যাট্রোপিনের সঙ্গে মিল আছে ওষুধটার। তবে অ্যাট্রোপিনের মত সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া করে না, ধীরে ধীরে রক্ত দূষিত হয়। সেটাই ঘটেছিল কিশোরের বেলায়। রক্ত পরিশোধন করে বিষ পুরোপুরি বের করে দিয়েছেন ডাক্তার। সাবধান করে দিয়েছেন, আগের মত কখনও সামান্যতম অসুবিধেও যদি বোধ করে আবার কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে যেন ছুটে যায় তাঁর কাছে।

পনেরো দিন হয়ে গেছে। আর কোন অসুবিধে হয়নি ওর।

মাথার মধ্যে কেমন করা, লাল-কালো তারা দেখা, কানের মধ্যে, ঝড়ের গর্জন—কোন কিছুই আর ঘটেনি।

রিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে এ সব কথা ভাবছে সে।

ইন্‌স্ট্রাক্টরের নির্দেশ মত কিছুক্ষণ লাফালাফি করে রিঙে ঢুকল চুং।

তাকিয়ে আছে কিশোর। দুপাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে কড়া নজর রেখেছে মুসা আর রবিন। চুংকে লাফাতে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় কিশোরের দেখতে চায়।

স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল চুং। ওপরে থাকতেই এক ডিগবাজি খেয়ে নিঃশব্দে নেমে এল মাটিতে। পরের বার লাফ দিয়ে আরও ওপরে উঠে গেল। নেমে আসতে আসতে দুবার ডিগবাজি খেল এবার।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'পারে কি করে!'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মুসা আর রবিনের। কিশোর পাশা আবার তার আসল রূপে ফিরে এসেছে। চুং-এর প্রতি অকারণ শত্রুতা নেই আর। প্রশংসা করছে আন্তরিক কণ্ঠে।

প্র্যাকটিস শেষ করে রিঙ থেকে বেরিয়ে এল চুং।

এগিয়ে গেল কিশোর। চুংকে বলল, 'দেখালে বটে! চলো।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল চুং। ঘামে ভেজা খাটো চুল। লম্বা করে না আর।

'খাওয়াব তোমাকে।'

চুং আরও অবাক। সন্দিহান চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। আবার কোনও নতুন ফন্দি করছে না তো?

'হঠাৎ করে আমাকে খাওয়ানোর জন্যে ব্যস্ত হলে কেন?'

'তোমার বেণি কেটেছি, তার একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?'

হাসি ফুটল চুং-এর মুখে। 'একটা সত্যি কথা বলব? খাওয়ানো আসলে তোমাকে উচিত আমার। বেণিটা কেটে দিয়ে ভাল করেছ। শান্তিতে আছি। ও এক যন্ত্রণা ছিল। লাফ দিলে খালি ঘাড়ে বাড়ি লাগত। এখনই ভাল। খেলাধুলার জন্যে খাটো চুল সবচেয়ে আরাম। দেখছ না, আর চুল বড় করি না আমি।'

স্কুলের কফিশপে এসে বসল ওরা। আঙুলের ইশারায় ওয়েইটারকে ডাকল কিশোর। চুং-কে জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবে?'

'ব্যাঙ।'

'মানে?'

'অবাক হচ্ছ কেন? আমরা কি ব্যাঙ খাই না? মুরগীর মাংসের চেয়ে টেস্টি।'

নির্বিকার মুখে মুসা বলল, 'আমি চিংড়ি খাব।'

রবিন বলল, 'আমিও।'

সবার অর্ডার নেয়া হয়ে গেলে কিশোরের দিকে তাকাল ওয়েইটার, 'তুমি?'

'মটরশুঁটির স্যুপ।'

চমকে গেল মুসা আর রবিন। ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে।

হাসল কিশোর। 'ভয় নেই। টেস্ট করে দেখতে চাইছি সেদিনের মত আজও মটরশুঁটির ঝোল আমাকে আক্রমণ করে কিনা।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওয়েইটার। কিছু বুঝতে পারল না। হাত নেড়ে ওকে যেতে বলল কিশোর, 'যাও, নিয়ে এসো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ওয়েইটার। কিছুক্ষণ পর খাবারের ট্রে হাতে ফিরে এল। টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল আবার।

স্যুপের বাটিটা টেনে নিল কিশোর। খাওয়া বাদ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন। চেহারার উদ্বেগ চাপা দিতে পারছে না। ওদের উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারল না চুং। কিছু জিজ্ঞেসও করল না। খাবারের প্লেট টেনে নিল নিজের দিকে।

স্যুপের বাটির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সবুজ বুদ্বুদ ওঠার অপেক্ষা করছে। সেরকম কিছু ঘটল না। বাটি থেকে গড়িয়ে নামতে দেখল না ঘন আঠাল তরল পদার্থ। ওর পা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল না। আস্তে এক চামচ স্যুপ তুলে মুখে দিল। মুখ বিকৃত করে ঠেলে সরিয়ে রাখল বাটিটা।

'কি হলো?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।

'এই কুখাদ্য মানুষে খায়!' হাত নেড়ে ওয়েইটারকে আসতে ইশারা করল আবার। 'চিংড়ি নেব।'

হাসি ফুটল মুসা আর রবিনের মুখে। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা। আর কোন ভয় নেই।

* * *